নাট্যদেউলের বিনোদিনী

শুধু 'বিনোদিনী' নয়, এ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে বিনোদিনীদের কথা। লেবেডেফের কাল আর পরে নবীনচন্দ্র বসুর কালকে ছুঁয়ে যাঁরা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা-কালের অব্যবহিত পরেই পাদ-প্রদীপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, মোটামুটি সেই বিনোদিনীদের অনেকেরই অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে মূলত তাঁদের জীবন-চর্যা ও নাট্য-চর্যাকে ভিত্তি ক'রে। পাশাপাশি পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে রাখা হয়েছে নাট্য-ইতিহাসের মোটামুটি ধারাবাহিক প্রাপ্ত তথ্যাবলী।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক
সাহিত্য বিহার
১বি. মহেন্দ্র শ্রীমাণী স্ট্রীট, কলি-৯

পরিবেশক
ওরিয়েণ্টাল বুক কোম্পানী
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলি-৯

NATYĀDEULER BINODINI
(Female Artistes of the Public Stage)
Sachindranath Bandyopadhyay (Banerjee)

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন ১৩৬৭

সাহিত্য বিহার-এর পক্ষে শ্রীমতী শ্যামলী ভট্টাচার্য এম. এ. কর্তৃক
১বি, মহেন্দ্র শ্রীমাণী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং
শ্রীভূমি মুদ্রণিকা-র পক্ষে শ্রীসুব্রত ভট্টাচার্য কর্তৃক
৭৭ লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত

বিশিষ্ট জননেতা ও কলকাতা পৌর নিগমের বর্তমান ডেপুটিমেয়র

শ্রীমণি সান্যাল

পরম সুহৃদবরেষু—

ভূমিকা

১৯৫৫-৫৬ সালে অধুনালুপ্ত 'রঙ্গমঞ্চ' পত্রিকায় ধারাবাহিক নাট্য-ইতিহাস লিখছিলাম। শুরু করেছিলাম সেই পৌরাণিক যুগ থেকে। সেই সময়ই নাট্য-ইতিহাসের বহু উপকরণ আমি সংগ্রহ করেছিলাম। পরে, যখন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' (প্রথম খণ্ড) লিখতে লাগলাম ওঁর বকলমে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক,—তখন আরও উপকরণ হাতে পড়লো। কিন্তু নানান কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ তা নিয়ে আর বসা হয় নি। বসলাম এখন, জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে। নাট্য-ইতিহাস রচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। নাট্য-ইতিহাসকে ব্যবহার করেছি পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলবার চেষ্টা করেছি 'বিনোদিনী'দের কথা। তথ্যের অংশ অবিকৃত রেখে, রসের অংশে ঘটেছে বিস্তার। এই অংশটুকুকে উপন্যাসোপম বলা যেতে পারে। নাট্যমঞ্চের সঙ্গে নানা সময়ে আমার সংশ্লেষ ঘটেছে, নাট্যশিল্প ও সাহিত্যে আমার আগ্রহ ছিল। অনেক কিম্বদন্তীসদৃশ নাট্যশিল্পীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। তাঁদের স্মৃতিকথা আমি ইতস্তত প্রবন্ধে অনেক লিখেছি, কিন্তু বক্ষ্যমান গ্রন্থটি সে-সব প্রবন্ধের সংকলন নয়। এর বিষয়বস্তুও ভিন্ন, দৃষ্টিকোণও ভিন্ন। সেই গোড়ার সময় থেকে 'নবান্ন'-এর আবির্ভাবের প্রাক্‌মুহূর্ত পর্যন্ত যে বঙ্গ-ললনারা পাদপ্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হয়েছিলেন, বিবর্তনের দিক থেকে দেখতে গেলে, তাঁদেরও গুরুত্বপূর্ণ এক অবদান আছে সমাজের ক্ষেত্রে। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন-চর্যা এবং নাট্যচর্যা,—দুই মিলিয়ে যা পাই, তা এক অপ্রত্যক্ষ সামাজিক সংগ্রাম বলে আজকের দিনে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। এই বক্তব্যে পৌঁছনোর জন্য এঁদের অনেকেরই প্রসঙ্গের অবতারণা, গিরিশ-যুগের 'বিনোদিনী'কে মধ্যমণি রেখে।

এই গ্রন্থে যা তথ্যের দিক, তার সূত্রের কথা এই রচনার মধ্যেই যথাস্থানে উল্লেখিত আছে। বাহুল্যবোধে ভূমিকায় তার অবতারণা করলাম না। বিশেষ করে যাঁদের সাহায্য নিতে হয়েছে, তাঁরা হলেন উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুবোধকুমার সেনগুপ্ত, ডঃ অঞ্জলি বসু, অহীন্দ্র চৌধুরী, কালীশ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ ভট্টাচার্য, তারাকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ অজিত ঘোষ, শঙ্কর ভট্টাচার্য, দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রভৃতি। সঙ্গে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, বিনোদিনী ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখের রচনা তো আছেই।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী)

বিনোদিনী

তিনকড়ি

তারাসুন্দরী

কিরণবালা

কুসুমকুমারী

সুশীলাবালা

নরীসুন্দরী

নীরদাসুন্দরী

॥ ১ ॥

জানতে ইচ্ছে করে, রাশিয়ার লেবেডেফ সাহেব কলকাতায় এসে ১৭৯৫ সালে একটি ইংরেজী নাটককে 'কাল্পনিক সংবদল' নামে বাংলায় অনুবাদ করে গোলকনাথ দাসের সহায়তায় তাঁর ডুমতলার 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এ মঞ্চস্থ করতে যে অভিনেত্রীদের পাদপ্রদীপের সামনে এনেছিলেন, তারা কারা এবং কোন্ স্তর থেকেই বা এসেছিল ? তখনকার প্রচণ্ড রক্ষণশীল সমাজে ভদ্রমহিলারা ছিলেন অসূর্যম্পশ্যা। সুতরাং ঐ মেয়েরা যে কোন্ স্তর থেকে উঠে এসেছিল, তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না! সেজন্যই মনে হয় সেই যুগে লেবেডেফ-গোলকনাথ দাসের পক্ষে এ-এক বৈপ্লবিক সংঘটন! মেয়েগুলির নামধাম আজ জানা যায় না। কিন্তু নাট্য দেউলে বাঙালী মেয়েদের আবির্ভাবের দিক থেকে তারাই পথিকৃৎ নয় কী? পরবর্তীকালের বিনোদিনীদের তারাই পূর্বসূরী।

এরপরে শ্যামবাজারের নবীনকৃষ্ণ বসু ১৮৩৩ সালে নিজের বাড়িতে বহু অর্থব্যয়ে 'নাট্যশালা' প্রতিষ্ঠা ক'রে, তাতে স্ত্রীচরিত্রে মেয়েদেরই নামিয়ে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় করান। সামাজিক দিক থেকে এ-ও এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। যে চারটি মেয়েকে তিনি নামিয়েছিলেন, তারা রূপোপজীবিনী ছাড়া আর কিছু নয়। 'সুন্দর'রূপী শ্যামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে যে তরুণীটি 'বিদ্যা' রূপে এসে দাঁড়িয়েছিল, তার নাম 'রাধামণি (মণি)'। 'সুমধুর কণ্ঠস্বরে, অপূর্ব অভিব্যক্তিতে, সুন্দরের প্রতি প্রেমমুগ্ধ অন্তরের প্রকাশভঙ্গিতে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয়' দিয়েছিল সে। তার বাবা বাঙালী, মা হিন্দুস্থানী বাঈজী। গান-বাজনায় তার মায়ের কাছেই তালিম নিয়েছিল, এটা অনুমান করা যায়, কিন্তু অভিনয়? তার সাফল্যের পিছনে যে অসামান্য নিষ্ঠা ছিল, তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

এ-সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস-এ ১৮৩৫ সালের ২২শে অক্টোবরের 'হিন্দু পাইয়োনিয়ার' নামক ইংরেজী পাক্ষিক পত্রে প্রকাশিত যে অংশটুকুর বাংলা অনুবাদ করে দিয়েছেন, তা

উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "রাজা বীরসিংহের কন্যা ও সুন্দরের প্রণয়িণী বিদ্যার ভূমিকা রাধামণি বা মণি নামে একটি বৎসর ষোলো বয়সের বালিকা অভিনয় করিয়াছিল। সে আগাগোড়া খুব নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল। তাহার সুললিত অঙ্গভঙ্গি, মধুর কণ্ঠস্বর, সুন্দরের প্রতি প্রণয়সূচক হাবভাব দর্শকমণ্ডলীকে অতিশয় মুগ্ধ করিয়াছিল। অভিনয়-কালে সে একবারও নৈপুণ্যের অভাব দেখায় নাই। আনন্দে ও দুঃখে মুখের ভাবের পরিবর্তন, প্রণয়ীকে বাঁধিয়া পিতার সম্মুখে লইয়া যাওয়া হইয়াছে শুনিয়া তাহার করুণ উক্তি ও ভাবব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গি, তাহার নিজের এবং নাট্যশালার উভয়ের পক্ষেই অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়। সুন্দরের বধের আদেশ হইয়াছে, এই সংবাদ শুনিবার পর তাহার সখীরা তাহাকে প্রবোধ দিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সে ভূমিতে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। সখীদের যত্নে একবার জ্ঞানলাভ করিয়া আবার সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল এবং কিছুক্ষণের জন্য দর্শকমণ্ডলী সভয়ে নীরব হইয়া রহিল। রাধামণির মতো অশিক্ষিত এবং মাতৃভাষার সূক্ষ্ম অর্থসম্বন্ধে অজ্ঞ একটি বালিকা যে এরূপ কঠিন একটি অংশ এরূপ কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিতে পারিবে এবং সকলকে তৃপ্ত করিয়া ঘন ঘন করতালি লাভ করিতে পারিবে, তাহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল।"

এর সঙ্গে ছিল আরও তিনটি মেয়ে, তার মধ্যে একজন প্রৌঢ়া। 'জয়দুর্গা' নামের এই স্ত্রীলোকটি দুটি ভিন্ন ভূমিকায় সেদিন অবতীর্ণ হয়েছিল, 'রাণী' ও 'মালিনী'। দুটি চরিত্রেই সে তার সার্থকতার স্বাক্ষর রেখেছিল। আর, অন্য যে দুটি মেয়ে সেদিন অভিনয় করেছিল, তাদের একজনের নাম রাজকুমারী (রাজু), অন্যজনের নাম 'বৌ-হর মেথরাণী'। দুজনেই নেমেছিল যথাক্রমে 'বিদ্যা'র সহচরী ও দাসীর ভূমিকায়। এই শেষোক্ত জনের নামটি লক্ষ্যনীয়। এই 'মেথরাণী'টি ধনকুবের নবীনকৃষ্ণ বসুর আসরে আবির্ভূত হলো কী করে? তখনকার যে ছুৎমার্গী সমাজ ছিল, তাতে 'মেথরাণী'কে নাট্যশালার মাধ্যমে নিজেদের সংসর্গে অবলীলায় তুলে নিয়ে আসা সহজ ব্যাপার নয়। তাহলে রহস্যটা কী? ইতিহাস এখানে নীরব। 'মেথরাণী' নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি, বা ঘামালেও কেউ কিছু জানতে পারে নি। আমার অনুমান, মেয়েটির নাম 'হর', রূপোপজীবিনী হবার আগে হয়ত কারুর 'বউ' ছিল। সেজন্য আশেপাশের মেয়েরা তাকে 'বউ-হর' বলে ডাকতো। বিশেষ করে 'বউ' বলার অর্থ এই হতে পারে যে, তার আশেপাশের ঘরের

মেয়েদের মধ্যে হয়ত বেশির ভাগ মেয়েই তাদের কুমারী-জীবন থেকে সরাসরি রূপোপজীবিকায় এসে ভিড়েছে, এই মেয়েটি বিবাহিত ছিল বলে তাকে 'বউ' বলে ডেকে ওরা একটু আমোদ পেতো। আর মেথরাণী? অনুমানের সাহায্যে এ-সম্বন্ধেও একটা সিদ্ধান্তে এসে পেঁছনো যায়। তখনকার দিনে এইসব মেয়েদের অদ্ভুত-অদ্ভুত নাম দেওয়া হতো। হয়ত এক বাড়িতে তিনটি 'হরি' বলে মেয়ে আছে, তাদেরকে চিহ্নিত করবার জন্য যে মেয়েটি 'বেড়াল' পোষে, তার নাম দেওয়া হলো 'বেড়াল-হরি।' যে ময়না পোষে, তার নাম হলো 'ময়না-হরি।' আমার ধারণা, 'মেথরাণী'ও বেচারীর 'বউ' নামের পাশে এমনি করে এসে জুটেছিল। হয়ত ও-বাড়িতে 'হর' বলে ছিল আরও কয়েকটি মেয়ে, চিহ্নিত করবার জন্য কী সূত্রে এর নামের সঙ্গে 'মেথরাণী' জুড়ে গিয়েছিল, তা-ও অনুমান সাপেক্ষ। তবে এ-প্রসঙ্গে এর সমান্তরাল একটি কাহিনী আমি বলতে পারি, যা আমার খুব ছোটবেলায় দেখা ও শোনা। আমার স্মৃতি তথ্যপ্রধান নয়, চিত্রপ্রধান, তাই অবিশ্বাস্য শিশু-বয়সের ঘটনাবলীও আমার কাছে অক্ষয় হয়ে আছে।

কালীঘাটের আদিগঙ্গার একটি বাঁধানো ঘাটের কাছেই আমাদের বাড়ি থাকায় ঐ ঘাটে যখন-তখন আমাদের যাতায়াত ছিল, কখনো স্নান করতে, কখনো কুচো চিংড়ির ঝাঁক এসেছে শুনে অপেক্ষাকৃত বড়ো বয়সের ছেলে-মেয়েরা জলে নেমে গামছা মেলে সেই মাছ ধরতে হুড়োহুড়ি করছে, তাই দেখতে যেতে, অথবা গঙ্গায় বান এসেছে খবর পেয়ে দুদ্দাড় করে ছুটে তাই প্রত্যক্ষ করতে। সেই শিশু বয়সে অতর্কিতে সেই বানের মুখে পড়ে নাজেহাল হচ্ছিলাম। অবশ্যই আছাড়-পিছাড় খেয়ে ডুবে যেতাম, কিন্তু আমাদের থেকে অনেক বড়ো বয়সের একটি মেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কী করে যে আমাকে বাঁচিয়েছিল, তা আমি জানি না। মেয়েটিকে ঘাটের কাছে আসতে যেতে আমি অনেকবার দেখেছিলাম। ঘাটের পাশেই তার মাটির বাড়ি, কিন্তু সবসময়ই লেপা-পোঁছা, ছিমছাম। আমাদের বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগে থাকতো, এই মেয়েটিকে দেখতাম, সেই সব পুজো-অর্চনার দিনে কোনো এক সময়ে আমাদের সদর দরজার কাছে এসে নিশ্চুপে দাঁড়াতো। সবসময় তার কানে দুল দুলতো, কখনো ছোট দুল, কখনো মাকড়ি, কখনো কানে আঁটা কানের ফুল। গলায় কী পরতো না পরতো আমার মনে নেই, কিন্তু দুলগুলোর কথা মনে আছে। শ্যামলা চেহারার গোলগাল মুখ, শাড়ির সঙ্গে সবসময় জামা পরা, মাথার চুল টান করে বাঁধা,

দরজার পাশে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, এ ছবি আমি এখনো মনে করলে দেখতে পাই। কারুর না কারুর অবশ্যই নজরে পড়তো ওর দাঁড়িয়ে থাকা, সঙ্গে সঙ্গেই সে খবর দিতো ভিতরে, অমনি চলে আসতো থালায় করে এক থালা চাল আর আস্ত আলু-পটল-বেগুন, কুমড়োর ফালি-সাজানো সিধে, তাতে একটা সিকিও দেওয়া হতো, সে সব সে তার হাতে করে আনা থলিতে উঠিয়ে নিয়ে থালা ফিরিয়ে দিয়ে যেমন এসেছিল, তেমনি নীরবে চলে যেতো।

আমাকে সে দুর্দম-বেগে-ধেয়ে-আসা সাপের উদ্যত ফণার মতো উঁচু জলোচ্ছ্বাসরূপী 'বান' থেকে বাঁচিয়ে দু-হাতে তার নিজের ঘরে এনে গা-হাত-পা মুছিয়ে-টুছিয়ে নিজের টান-টান করে পরিপাটিরূপে সাজানো বিছানার ওপর শুইয়ে দিয়েছিল। সেই সময় আমার চোখ পড়েছিল তার কাঁচের পাল্লা-দেওয়া ঝকঝকে চেহারার আলমারীটার দিকে। কেমন সুন্দর করেই না তার ভিতরে পুতুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে! বাচ্চাদের পুতুলের দিকে স্বাভাবিক একটা ঝোঁক থাকেই। আমি পরে এই পুতুল দেখার লোভেই তার ঘরে গিয়ে একদিন ঢুকেছিলাম, অবশ্য তারই অহ্বানে, অযাচিত নয়। পুতুলগুলির মধ্যে 'বেনে বউ'-ই বেশি। ছোট ছোট বউ-পুতুল, নানান ভঙ্গিমার। কেউ মাছ কুটছে, কেউ তরকারী কাটছে, কেউ বাটনা বাটছে, কেউ আলপনা দিচ্ছে, কেউ রান্না করছে। সবগুলিরই গায়ের রঙ ফর্সা, সবগুলিরই গায়ে লাল পাড় সাদা শাড়ি, হাতে চুড়ি, বাহুতে অনন্ত, গলায় হার, মাথায় ঘোমটা, কিন্তু গায়ে জামা নেই। এগুলিকেই বেনে-বউ পুতুল বলা হতো সেকালে।

আমি তার ঘরে ঢুকেছিলাম বিকেলে, ঠিক তখন, যখন আমাদের খেলতে বেরোবার সময়। সে-ই ঘাটের কাছে আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকলো। কাছে গিয়ে একটু অবাকই হয়ে গেলাম। চুলগুলো টান-টান করে খোঁপা করে বাঁধা, তাতে আবার আমার মামীমার মতো 'সুখে থাকো'-লেখা চিরুণী গুঁজে দিয়েছে। কপালে পরেছে কাঁচপোকার টিপ। পরণে কালো পাড়ের হালকা বেগুনী রঙের শাড়ি, বাহুর কাছে ঝালর দেওয়া কালো রঙের জামা। কানে তো তার দুল দুলছেই সবসময়। হাতে পরেছে চুড়ি আর রুলি, গলায় মটর-দানার হার। আমি আগে তাকে দেখবো না আলমারীর ভিতরের বেনে-বউদের দেখবো?

কী দেখছো, খোকাবাবু?

বললাম—কোথাও যাবে বুঝি?

সে ফিক করে হেসে ফেললো, বললে—না গো, বাড়িতেই থাকবো। আমার সাজ-গোজ দেখে কথাটা বললে বুঝি? সাজতে হয় আমাকে রোজ! বিকেলে গা ধুয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে সাজি। সাজতে আমার খুব ভালো লাগে। তুমি বোসো না? বিছানায় বসতে হবে না। ঐ চেয়ারটাতে বোসো।

আমি বসবো, কি বসবো না, বুঝতে পারছিলাম না। মেয়েটি বললে—সেদিন ডুবে যাওয়ার কথা বাড়িতে বলেছিলে?

—আমি বলিনি, কিন্তু—

—বন্ধুরা বলে দিয়েছিল, এই তো?

—হ্যাঁ।

—তারপর? মা-দিদিমা কিছু বলে নি?

—বকেছিল খুব।

—বকুনি খেয়ে কেঁদে ছিলে তো?

—না।

—তবে?

—কষ্ট হয়েছিল।

—কষ্ট?

—হ্যাঁ। আমাকে আমাদের ঝি মানদা দু-হাতে সাপটে ধরে কলতলায় নিয়ে গিয়ে আবার চান করিয়ে দিলো কিনা?

মেয়েটির মুখখানা কালো হয়ে গেল, বললে—আমার কথা বলেছিলে বুঝি?

—আমি না। আমার বন্ধুরা—

বললে—তাহলে তো চান করাবেই।

—কেন?

—আমি যে মেথরাণী।

অবাক হয়ে গেলাম। এমন ছিমছাম ঘর—সুন্দর করে সাজানো—তার ওপর নিজেও কেমন সেজেছে, গয়না প'রেছে। ও মেথরাণী হবে কেন?

বললাম—যাঃ!

—যাঃ নয়-সত্যি!

—তাহলে ঝাঁটা কই, তোমার হাতে?

হেসে ফেললো, বললে—ছিল গো ছিল, আমার মায়ের হাতে।

—কই, তোমার মা ?

—পালিয়েছে।

—কোথায় ?

হাতটা শূন্যে উঠিয়ে দেখালো, বললে—স্বর্গে।

আমার বয়স তখন পাঁচ-ছয়ের বেশি নয়। স্বর্গ কোথায় আমি তখন তার খোঁজ রাখতাম। আমাদের বাড়ির পিছনে জঙ্গল,—তারপরে স্বর্গ—যেখানে মরবার পর সবাই পুড়তে যায়। তাই বললাম—কেওড়াতলায় ?

—ঠিক বলেছো। মা কেওড়াতলায় গেছে, কিন্তু তার ঝাঁটা-গাছাটা ফেলেনি, আমার হাতে দিয়ে গেছে! এই দ্যাখো ?

বলে দু-হাত মেলে দেখালো। অবাক হয়ে বললাম—হাত তো খালি। ঝাঁটা কই ?

—দেখতে পাচ্ছো না ? অনেকে কিন্তু দেখতে পায়!—মেয়েটি বললে—এই দ্যাখো না, পুজো-পার্ব্বনে তোমাদের দোরে গিয়ে সিধে নেই কেন জানো ? কী সব গেরো নক্‌খত্‌রের দোষ আছে তোমাদের বাড়ির কারও, তাই চণ্ডালকে সিধে দিতে হয়। তাই যাই। না-নেওয়া নাকি আবার খারাপ!

বলেই শিউরে উঠলো, ওঃ! বাবা! বামুনের ঘর বলে কথা! মা বলতো, বামুন, না, গোখরো সাপ! সবসময় গড় করবি, না হলেই ফোঁস! তুমি বোসো না খোকাবাবু—ঐ চেয়ারটাতে ? আঁধার হলেই চলে যেয়ো, আর বাড়ি গিয়ে খবরদার যেন বোলো না এখানে এসেছিলে! বললেই তোমাকে নাইতে হবে।

আমি ওর কথামতো চেয়ারে বসলাম। একটা ধবধবে চাদর-ঢাকা টেবিলও রয়েছে, তাতে বই-খাতাপত্তর, কলম, দোয়াত, পেনসিল, সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা। অন্য দেওয়ালে একটি রাধাকৃষ্ণের ছবি, তার নিচে এক তাক তৈরি করে তাতে ফুটো করা শাঁখ রেখে সেই ছিদ্রে দুটি ধূপ জ্বেলে দিয়েছে।

কিন্তু আমার সেদিকে কোনো ঔৎসুক্য ছিল না, আমার মনোযোগ কাড়ছিল ওর আলমারী আর বেনে-বউ পুতুলগুলো।

হঠাৎ এই সময় মেয়েটি আমার সামনে মেঝের ওপর হাঁটুমুড়ে বসে পড়লো, বললো—খোকাবাবু, গল্প শুনবে ?

বলেই, আমার উত্তরের অপেক্ষা না রেখে নিজেই শুরু করে দিলো,—

এক ছিল রাজার বাড়ি, দেউড়িতে দরওয়ান !—হ্যাঁ রাজার বাড়ি বললেও চলে, গরিবদের চোখে বড়োলোক মানেই রাজা। তাদের পাঁচিল-ঘেরা চৌহদ্দির বাইরে ছিল এক ছোট্ট গরিব-পাড়া, খোলার ঘর-দরমার বেড়া—তাতে থাকতো কারা জানো ? যাদের বলে মেথর-মেথরাণী, সেই তারা। ওরা গরিব, খুবই গরিব, রাস্তাঘাটের নোংরা, বাড়িঘরের নোংরা সব ঝেঁটিয়ে সাফ করাই ওদের কাজ ছিল। কিন্তু গরিব হলে হবে কী, তাদেরই ঘরে ভগবানের খেয়ালে আবার মাঝেমাঝে দুটো-একটা ফুটফুটে ছেলেমেয়ে জন্মায়। এইরকম করে একটা খুকি জন্মালো সেই বস্তিতে, আঁধার-ঘর আলো করতে। কী গায়ের রঙ ! কী চোখ, কী মুখ, আর কী চুল ! সেই মেয়ে আস্তে আস্তে বড়ো হয়ে উঠতে লাগলো। কাছেপিঠে সে উঠোন-ফুটোন ঝাঁট দিতে যায়, কেন না পেট চলা চাই তো ? তাকে বাইরেদূরে কোথাও যেতে দেওয়া হতো না। একদিন ভোরবেলায় পাশের বড়োলোকের বাড়িতে সে উঠোন ঝাঁট দিতে গেছে, এমন সময় হয়েছে কী, সে বাড়ির এক বাবু, ছোটবাবু, সারা রাত কোথায় পুইয়ে এসে ভোর ভোর বাড়ি ফিরছিলেন—হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ে গেল সেই মেথরাণীর দিকে। কিসের ঘোরে তিনি ছিলেন কে জানে, তার ঝোঁক পড়লো ঐ মেথরাণীকে তিনি বিয়ে করবেন !

—বিয়ে !

—হ্যাঁ গো, বিয়ে করবেন। তুমি ছেলেমানুষ, বুঝবে না, সে একরকম বিয়ে। যার মানে হলো, ঐ ঝাঁটা হাতে মেয়েটাকে তিনি বেনে-বউ পুতুল বানাবেন। একটা আলাদা বাসা করে দেবেন, গলায়, হাতে, কানে গয়না দেবেন, দেবেন রঙ বেরঙের শাড়ি, আর সে সেজেগুজে ঐ রকম বাটনা বাটবে, কুটনো কুটবে, আর সারাক্ষণ ঐ বাবুর মন জুগিয়ে চলবে।

—তারপর ?

—তারপর আর কী ? মেথরাণী হলো রাজরাণী।

—তারপর ?

—রাজরাণীর কোলে একটি মেয়ে এলো।

—তারপর ?

মেয়েটি বললো—তারপরে ঘটলো বড়ো দুঃখের ঘটনা। সরিকে সরিকে বাড়ি-ঘর-দোর ভাগ করলে—ছোটবাবু একটা ভাগ পেলেন, কিন্তু রাখতে পারলেন না, সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত লিভার ফেটে নিজেই মারা পড়লেন !

—রাজরাণীর কী হলো ?

—দুরবস্থার শেষ রইলো না। মেয়েটিকে রেখে ঐ যে তুমি বললে কেওড়াতলায় যাওয়া—তেমনি চলে গেল। সেটা অবশ্যি কেওড়াতলা ছিল না, ছিল নিমতলা।

—সে আবার কী ?

—ঐ কেওড়াতলার মতোই একটা জায়গা। কিন্তু সেই বাচ্চা মেয়েটার কী হলো জানতে চাইলে না ?

—বলো ?

—সে বড়ো হয়েছে তো ? তাকে লোকেরা বললে, এই তুই থিয়েটার কর, তোর কপাল খুলবে। তা, তোমাকে বলবো কী, মেয়েটা শিখে-পড়ে নিয়ে সখের থিয়েটারে থিয়েটার করতে গেল। কিন্তু দু-তিন দিনের বেশি থিয়েটার করা তার ভাগ্যে সইলো না !

—কেন ?

—যারা নিয়ে গিয়েছিল, শিখিয়ে-পড়িয়েছিল, তারা ভালো—কিন্তু দুনিয়ায় ভালো লোক কম, জানো তো ? তাই বাজে লোকেরা 'গেল-গেল রব' তোলায় তাকে আবার তার ঘরে ফিরে আসতে হলো।

হাঁ করে তার গল্প শুনছিলাম, সব-কথা যে ঠিক-ঠিক বুঝতে পারছিলাম এমন নয়, তবু তার বলার ভঙ্গিতে আকৃষ্ট হয়ে বাধ্য শ্রোতার মতো তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। বললাম—লোকেরা 'গেল গেল' করলো কেন ?

সে বললে—করবে না ! সে যে মেথরাণীর মেয়ে !

বলেই সুর পাল্টে সে বলে উঠলো, খোকাবাবু, আঁধার হয়ে এলো, তোমাকে এবার উঠতে হবে, সেজন্য আসল কথাটা বলে নিই। সেই মেথ্‌রাণীর মেয়েটা এখন কোথায় বলতে পারো ?

—না !

—আরও একটু বড়ো হলে বুঝতে পারতে, আমাকে বলতে হতো না। আমার নাম বীণা, বীণাপাণি—কিন্তু লোকে এখনো বলে—বীণা মেথ্‌রাণী।

এই হলো আমার শৈশবে-শোনা কাহিনী। 'হর-মেথরাণী'র জীবন কেমন ছিল জানি না, কিন্তু বীণা মেথ্‌রাণীর কাহিনী শুনে 'হর-মেথ্‌রাণী'র কথাই মনে পড়ে যায়। তার হয়ত 'নাম-কা-ওয়াস্তে' একটা বিয়ে হয়েছিল, অথচ বীণার হয়নি। বড়ো হয়ে জেনেছি, বীণা এ-পাড়া

ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। কিন্তু শুনেছি, বিকেলে গা-ধুয়ে পরিপাটি সাজগোজ করে আঁধারের প্রতীক্ষায় থাকা, এ-তার ঘুচে যায় নি।

এরপরে নায়িকার সন্ধানে আসতে গেলে আমাদের নাট্য-ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে আসতে হয়। আমরা জানি, চিৎপুরের ঘড়িওয়ালা বাড়ি (অতীতের সান্যাল-বাড়ি)-তে প্রথম টিকিট বিক্রি করে ১৮৭২ সালে ন্যাশানাল থিয়েটার কর্তৃক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' দিয়ে যে নাট্যমঞ্চের উদ্বোধন করা হয়, তাতে কোনো স্ত্রীলোক নেওয়া হয় নি। কিন্তু এর পরের বছরই ৯।৩ বিডন স্ট্রিটে 'বেঙ্গল থিয়েটার' নাম দিয়ে, যে সাধারণ রঙ্গালয় খোলা হলো শরৎচন্দ্র ঘোষের অধিনায়কত্বে ও বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়, তাতে অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয়েছিল। নেবার আগে যে প্রারম্ভিক আলোচনাসভা হয়েছিল, তাতে দুই বিখ্যাত বাঙালী দুই রকম মত দিয়েছিলেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বললেন—অবশ্যই মেয়ে নেওয়া হোক।

আর, বিধবা-বিবাহের প্রবক্তা, সমাজ-সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বললেন—আমি ওতে নেই।

শেষপর্যন্ত অবশ্য ক্রান্তিদর্শী কবিবরের পরামর্শই অনুসরণ করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি এই যুগান্তকারী ঘটনা নিজে দেখে যেতে পারেন নি। ১৮৭৩-এর ২৯শে জুন তিনি মারা গেলেন, আর তাঁরই 'শর্মিষ্ঠা' দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হলো ১৬ই আগষ্ট। চারজন মেয়ে নেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে এ-রাত্রে নামানো হলো মাত্র দুজনকে,—এলোকেশী আর জগত্তারিণী। অন্য দুজন হলেন শ্যামাসুন্দরী ও গোলাপসুন্দরী। এরপরে বেঙ্গল থিয়েটার মধুসূদনেরই 'মায়াকানন' মঞ্চস্থ করেছিল। কিন্তু সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, এঁরা 'সুবিধা করতে' পারেন নি। কিন্তু তারপরেই সমসাময়িক একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা নিয়ে লেখা প্রহসন 'উঃ! মোহন্তের এই কি কাজ' অভিনয় করে 'বেঙ্গল থিয়েটার নিদারুণ সাফল্য'-এর মুখ দেখেছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের এর পরের উল্লেখযোগ্য নাটক শ্রীমধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী', ও তারপরে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'। এতে 'বিমলা'র ভূমিকায় গোলাপসুন্দরীর নাম পাওয়া যায়। তিলোত্তমার ভূমিকায় জগত্তারিণী, আর আসমানীর চরিত্রে এলোকেশী। লক্ষ্যণীয়, শ্যামাসুন্দরী নামে এক অভিনেত্রী থাকতেও

এ'রা 'আয়েষা'র চরিত্রে নামিয়েছিলেন একজন পুরুষকে, বোধ হয় অভিনয়ের সৌকর্যের জন্যই।

শ্যামাসুন্দরী এবং অন্য তিনজন ছিলো সম্ভবত মূলত গায়িকা। খুবই স্বাভাবিক। সমাজের যে স্তর থেকে এরা এসেছিলো, সে-স্তরের মেয়েদের তাদের জীবিকার জন্যই মোটামুটি গান শিখতে হতো। সবাই যে ভালো গাইতো, তা নয়। তাদের মধ্য থেকে বেছে নিয়েই আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু)-এর দেওয়ান রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় একটি যাত্রাদল খুলেছিলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের মালিক শরৎচন্দ্র ঘোষ ছিলেন ছাতুবাবুর দৌহিত্র। সেই সূত্রে রামচাঁদবাবু তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। নাট্য-ইতিহাসকারেরা বলেন, এ'রই যোগাযোগে ঐ চারজন অভিনেত্রী সংগৃহীত হয়েছিল। তাঁর যাত্রাদলে যে মেয়েরা গান করতো, তাদের মধ্য থেকে বা তাদের সাহায্যে তাদের পরিচিত মহল থেকেই নাট্যদেউলে এদের আবির্ভাব বলে অনুমান করা যেতে পারে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময়ে ঝুমুর, কীর্তন, কৃষ্ণ-যাত্রা প্রভৃতির দল মেয়েদের নিয়েও গঠিত হচ্ছিল।

সাধারণ নাট্য-দেউলের প্রাথমিক পর্যায়ের এই যে চারজন অভিনেত্রী, এদের জীবন সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় এবং যেটুকু অনুমান করা যায়, সেদিক থেকে বলা যেতে পারে, এদের জীবন-কথা অল্পবিস্তর সবারই এক। এই চারজনের মধ্য থেকে যে নামটি সব থেকে প্রোজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছিল, সেটি হচ্ছে, গোলাপসুন্দরী। এ'র সম্বন্ধে যেটুকু ঘটনার কথা জানা যায়, তার থেকে রটনার অংশও কম নয়। সেকথা মনে রেখেই এ'র প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে।

১৮৭৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিল। এতে গোলাপসুন্দরী 'বিমলা' চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কিন্তু তাঁর কৃতিত্ব সবিশেষ প্রকাশ পেয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুরুবিক্রম নাটকের 'রাণী ঐলবিলা' চরিত্রে। গ্রন্হটির প্রকাশকাল ৯ই জুলাই ১৮৭৪, প্রথম অভিনয়ের তারিখ ঐ সালেরই ২২শে আগষ্ট। শৈশবে জনৈক প্রবৃদ্ধের কাছে এই 'ঐলবিলা' অভিনয়ের কথা শুনেছিলাম। তিনি নিজে দেখেছিলেন, না, তাঁরও শোনা কথা, আজ মনে নেই ; বলেছিলেন—নাটকের আরম্ভেই ঐলবিলা-রূপিণী গোলাপসুন্দরী যখন বলতেন—'সেদিন গিয়ে আমি পাঞ্জাব–

প্রদেশস্থ সমস্ত রাজকুমারগণকে যবনদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিয়ে এসেছি।...সখি, যতদিন না যবনেরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি হতে একেবারে দূরীভূত হচ্ছে, ততদিন আমার আর আরাম নেই, বিশ্রাম নেই।'—তখনই দৃশ্যটি জ'মে যেতো। বিশ্বভারতী যে 'জ্যোতিরিন্দ্র নাথের নাট্যসংগ্রহ' প্রকাশ করেছেন, তার 'প্রসঙ্গকথা'য় লেখা হয়েছে 'ঐলবিলার ভূমিকায় তখনকার খ্যাতনামা অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত স্বয়ং লেখকের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন'। এই 'সুকুমারী দত্ত'ই গোলাপ-সুন্দরী, পরে বেঙ্গল ছেড়ে যখন গ্রেট ন্যাশানাল-এ এসে উপেন্দ্রনাথ দাস রচিত শরৎ সরোজিনী নাটকে 'সুকুমারী' চরিত্রে অভিনয় করেন, তখন সে অভিনয় এতো চিত্তগ্রাহী হয় যে, তাঁর নামই হয়ে যায় সুকুমারী। এ-হচ্ছে ১৮৭৫ সালের কথা। এই নাটকে 'বৈজ্ঞানিক হরিদাস' নামক একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করতেন গোষ্ঠবিহারী দত্ত। এঁরই সঙ্গে বিবাহ হবার দরুণ গোলাপসুন্দরী হয়ে ওঠেন 'সুকুমারী দত্ত'।

এই গোলাপসুন্দরী বা সুকুমারী দত্ত বিনোদিনীর পূর্ববর্তিনী সব থেকে খ্যাতিসম্পন্না অভিনেত্রী। যদিও এঁর সময়ে 'রাজকুমারী' (ডাক নাম ছিল রাজা) নানান নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন এবং ক্ষেত্রমণি চরিত্রাভিনেত্রীরূপে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু সব মিলিয়ে দেখা যায়, কী সঙ্গীত কী অভিনয়ে গোলাপ প্রভূত যশ আহরণ করেছিলেন। এই গোলাপসুন্দরীর একটি বোনেরও নাম পাওয়া যায়, যিনি কিছুকালের জন্য পাদপ্রদীপের সামনে এসেছিলেন। এঁর কথা উল্লেখ করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁর সম্পাদিত 'গিরিশ গ্রন্থাবলী'র প্রথম খণ্ডে। ন্যাশানাল থিয়েটারে ৯ই মার্চ ১৯৭৮ সালে গিরিশচন্দ্র-নাট্যায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'-তে ইনি 'কমলমণি'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এঁর নামও 'কমলা'। এতে গোলাপসুন্দরী ছিলেন না। ছিলেন বিনোদিনী কুন্দনন্দিনীর ভূমিকায়। সূর্যমুখী ছিলেন—কাদম্বিনী। ইনিও তখনকার দিনে নানান গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করে গেছেন।

প্রসঙ্গত, গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের কথাও এসে পড়ে। এঁরাও পরে অভিনেত্রী নিয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাঁচজনকে এঁরা প্রথমে নিযুক্ত করেন: রাজকুমারী (রাজা), ক্ষেত্রমণি, যদুমণি, কাদম্বিনী ও হরিদাসী। এ হচ্ছে ১৮৭৪ সালের সেপ্টেম্বরের কথা। নাটকের নাম—'সতী কি কলঙ্কিনী'।

কিন্তু সে যাই হোক, এ সম্বন্ধে অমৃতলাল বসু তাঁর 'স্মৃতিকথায়' (ব্রজেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ থেকে সংকলিত) এক জায়গায় লিখে গেছেন—'নাটকের অভাবে গীতপ্রধান অপেরা না চালাতে আপাতত উপায় নেই মনে করে অভিনেত্রী নিতে আমরা বাধ্য হলাম। আমার নিজের একটা ভয়ানক ভুল ধারণা ছিল যে, যে-শ্রেণীর নারীর মধ্য হতে অভিনেত্রী নির্ধারণ করা হয় তারা নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং নাচতে গাইতে পারলেও উচ্চাঙ্গের স্ত্রীচরিত্র সকল অভিনয় করতে কখনই সমর্থ হবে না।...কিন্তু অভিনেত্রীরা রিহার্স্যালে আসতে আরম্ভ করার দু-সপ্তাহের মধ্যেই আমার সে সব ভ্রম দূর হয়ে গিছলো। এখনকার হিসাবে তখন বেতন অতি অল্প অথচ যে পাঁচটি অভিনেত্রী প্রথমে আমাদের কাছে এলো, তাদের সকল বিষয়েই নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষালাভের পিপাসা ও যত্ন এবং কর্মস্থলে শীলতা রক্ষা, সহজভাব দেখে আমাদের মধ্যে অনেক পুরুষকেও নিজ নিজ চরিত্র সম্বন্ধে সাবধান হতে হয়েছে। স্পষ্টই তারা আমাদের কাছে বলেছে যে, উৎপীড়িতাদের জন্য এই নতুন পথ খুলে আমাদের আশ্রয় দিয়ে যে কত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিলেন, তা বলতে পারি না।'

কিন্তু যেকথা বলছিলাম। বেঙ্গল থিয়েটারে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়-কৃত 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপে তিনি নিজে অভিরাম স্বামী এবং ওসমান চরিত্রে হরিদাস দাস, যিনি তখনকার কালে 'হরি বোষ্টম' নামে খ্যাত ছিলেন, অসামান্য অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়। অবশ্য জগৎসিংহরূপে স্বয়ং শরৎচন্দ্র ঘোষও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁদের এই দুর্গেশনন্দিনীর আগে 'উঃ! মোহন্তের এই কি কাজ' (নাট্যকার : যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়) নাটকটি নিদারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। তখনকার তারকেশ্বরের মোহন্ত মাধবগিরি জনৈক গৃহস্থ 'নবীন'-এর পরমাসুন্দরী স্ত্রী এলোকেশীকে নিজের অঙ্কশায়িনী করেছিলেন। নবীন ছিল দেশান্তরে, সে ফিরে এসে সব শুনে স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রবলপরাক্রান্ত মোহন্তের জন্য তা সম্ভব হয় নি। তখন মরিয়া হয়ে স্ত্রীকে হত্যা করে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পন করে নবীন। তার হয় দ্বীপান্তর, কিন্তু পরে খালাস পায়। মোহন্তের হয় কারাদণ্ড। সমস্ত দেশ এ-বিষয়ে তোলপাড়। এই ঘটনা নিয়েই বেঙ্গলের ঐ নাটক। অভিনয়ের তারিখ ৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৩। (তারিখটি বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস : কালীশ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত।) এই নাট্যকার যদুবাবুর

'কেরানী-দর্পণ'ও বেঙ্গলে অভিনীত হয়েছিল ১৮৭৪ সালে। বেঙ্গলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী'ও অভিনীত হয়েছিল। এ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ঘরোয়া'তে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তখন তাঁর বয়স পাঁচ কি ছয়। ড্রপসিনের কথায় লিখেছেন, 'তাতে আঁকা ইউলিসিসের যুদ্ধযাত্রা। রাজপুত্তুর নৌকাতে চলেছে, জলদেবীদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, পিছনে পাহাড়ের সার—গ্রীক যুদ্ধের একটা কপি। ......মলিনা সেজেছিল সুকুমারী দত্ত। স্টেজনাম ছিল গোলাপী, সে যা গাইতো! বুড়ো বয়সেও শুনেছি তার গান। চমৎকার গাইতে পারতো। মিষ্টি গলা ছিল তার, অমন বড়ো শোনা যায় না। আর কী অভিনয়! এক হাতে পিদিমটি ধরে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে আসছে, যেন ছবিটি! এখনো চোখে ভাসছে!'

১৮৭৪-এর শেষের দিকে 'বেঙ্গল থিয়েটার' কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কয়েকজন শিল্পী নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু প্রভৃতি একটি 'অপেরা' গড়ে নানান জায়গায় অভিনয় করবার পর বেঙ্গল থিয়েটারে আসেন। এখানে দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত গ্রেট ন্যাশানালের পুরোনো নাটক 'সতী কি কলঙ্কিনী' অপেরা নাটক অভিনয় করে ১৮৭৫-এর ৬ই ফেব্রুয়ারি। এঁরা এখানে প্যারিচরণ মিত্রের (ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর) আলালের ঘরের দুলাল-এর নাট্যরূপও মঞ্চস্থ করেন। এই সালের ৬ই মার্চ মাইকেলের মেঘনাদবধ নাটকে মেঘনাদ চরিত্রে কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লক্ষ্মণ চরিত্রে হরি বোষ্টম চমৎকার অভিনয় করেছিলেন।

এই সময়ে, অর্থাৎ ১৮৭৪-এর শেষের দিকে গোলাপসুন্দরী 'বেঙ্গল' ছেড়ে গ্রেট ন্যাশানালে যোগদান করেন। এ-তথ্য শঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর 'অর্ধেন্দুশেখর ও বাংলা থিয়েটার' গ্রন্থে দিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'বেঙ্গল থিয়েটারে গোলাপ শরৎচন্দ্র ঘোষের শিক্ষায় গঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রেট ন্যাশানালে অর্ধেন্দুশেখরের শিক্ষার স্পর্শে গোলাপের সৃজনীশক্তি পূর্ণতা লাভ করে। 'বিশেষজ্ঞ' (কিরণচন্দ্র দত্ত) লিখেছেন—'এখানে (গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে— শ. ভ.) শিক্ষক ছিলেন নটকুলশেখর অর্ধেন্দুশেখর। গোলাপ বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়রীতি ত্যাগ করিয়া নূতনরূপে ফুটিয়া উঠিল। তাহার প্রশংসার মাত্রা দশগুণ বাড়িয়া গেল। অর্ধেন্দুবাবুর হাতে সুকুমারীর অনেক সুপ্তশক্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং সুকুমারীও নাট্যকলার রহস্য কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া তাহা

উপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করিতে শিখিল। বিনোদিনীও প্রথম হইতেই অর্ধেন্দুবাবুর শিক্ষালাভে ভাগ্যবতী হওয়ায় তাহার অভিনয়ের ঔজ্জ্বল্য সর্বাপেক্ষা মনোহর হইয়াছিল। (অভিনেতৃ-কাহিনী ঃ দ্রঃ নাট্যমন্দির পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ শ্রাবণ ১৩২০—আষাঢ় ১৩২১)।

১৮৭৫ সালের ২রা জানুয়ারি ৬নং বিডন স্ট্রীটের গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে উপেন্দ্রনাথ দাস বিরচিত 'শরৎ সরোজিনী' অভিনীত হয়েছিল। নায়ক শরতের ভূমিকায় ছিলেন মহেন্দ্র বসু, সরোজিনীর ভূমিকায় রাজকুমারী। কিন্তু এ নাটকের 'সুকুমারী' চরিত্রে সার্থক রূপদান করে গোলাপসুন্দরী 'সুকুমারী' নামে পরিচিত হতে থাকেন। এই নাটকের বৈজ্ঞানিক হরিদাস-চরিত্রের অভিনেতা গোষ্ঠবিহারী দত্তের সঙ্গে গোলাপের বিবাহ দেন উপেন্দ্রনাথ দাস তখনকার প্রচলিত রেজেস্ট্রি-বিবাহ (যাকে চলতি কথায় বলা হতো, 'তিন আইন') রীতি অনুসারে।

এই বিবাহ প্রসঙ্গে কতগুলি কথা এসে পড়ে। উপেন্দ্রনাথ দাস তখনকার দিনের বিশিষ্ঠ উকিল ও প্রভাবশালী ব্যক্তি শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পুত্র। ইনি স্বল্পকালের জন্য রঙ্গমঞ্চের সংস্পর্শে এলেও বিশেষ স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ইনি নিজে আদর্শবাদী। পরে পিতার অমতে ও সমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে বিধবা-বিবাহ করেছিলেন। এবং এই আদর্শবাদের তাড়নাতেই সম্ভবতঃ বারাঙ্গনাকুল থেকে আগত গোলাপ-সুন্দরীর সঙ্গে সুবর্ণবণিক সমাজের প্রতিষ্ঠাপন্ন ঘরের ছেলে গোষ্ঠ-বিহারীর বিবাহ দিয়েছিলেন। এই বিবাহ সেকালে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল, দেশীয় পত্র-পত্রিকার অন্যতম উপজীব্য হয়ে উঠেছিল এই বিবাহ-সমাচার। গোষ্ঠবিহারী দত্তের সংসার প্রাঙ্গনেও যে কী প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল সেদিন, তা অনুমান করা যেতে পারে। সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি।

'শরৎ-সরোজিনী'র প্রথম অভিনয়ের দুমাস পরে (মার্চ মাসের মাঝামাঝি) গ্রেট ন্যাশানালের একটি দল ধর্মদাস সুরের ব্যবস্থাপনায় উত্তর-প্রদেশ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে অভিনয় করতে যান, সঙ্গে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর, আর আগামী যুগের নাট্যসম্রাজ্ঞী বিনোদিনী। তখন সে নিতান্ত বালিকা, মাত্র বারো বছর বয়স। কিন্তু তার কথা পরে।

আমাদের কাছে একটি প্রশ্ন অনিবার্যরূপে দেখা দেয়, হঠাৎ উপেন্দ্রনাথ দাস গোলাপসুন্দরীর বিবাহ-ব্যাপারে এতো উদযোগী হয়ে পড়েছিলেন কেন ? গোষ্ঠবিহারী উপেনবাবুর খুবই অনুগত ছিলেন। হয়ত কোনো

রোমান্সের উদ্ভব হয়েছিল দুজনের মধ্যে—অভিনয়চলাকালীন। কিন্তু অন্য কোনো দিক থেকে কোনো সামাজিক তাড়া ছিল না তো? আমরা আগেই একটি কথার উল্লেখ করেছি। বেঙ্গলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটকে গোলাপের 'ঐলবিলা'র অভিনয় স্বয়ং লেখকের প্রশংসা অর্জন করেছিলো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিক্ষেত্রের এক স্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করতে গেলে সতর্ক হয়েই করা উচিত। কোনো যথার্থ তথ্য নেই, ঘটনার কোনো উল্লেখেরও অভাব। কিন্তু রটনার অনুরণন রয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রথম খণ্ডের ১৯৭ পৃষ্ঠায় 'শোক ও সান্ত্বনা: ১' পরিচ্ছেদে জ্যোতিরিন্দ্র-পত্নী কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা-প্রসঙ্গে বলেছেন—'এই মৃত্যুর কারণ কী এবং কে ইহার জন্য দায়ী, তাহা লইয়া গবেষণা সেদিনও হইয়াছিল, আজও হইতেছে।' সমসাময়িক অনেকে বলেছেন 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঔদাসীন্য ইহার মূল কারণ'। প্রসঙ্গত প্রভাতকুমার কাজী আবদুল ওদুদের 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন: 'এ সম্বন্ধে আর একটু স্পষ্ট বিবরণ আমরা শ্রীযুক্ত অমল হোমের কাছ থেকে পেয়েছি। তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ছোট দিদি বর্ণকুমারী দেবীর কাছ থেকে, বোধহয় ১৯৪৬ সালে। বিবরণটি এই: জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধোপার বাড়িতে দেওয়া জোব্বার পকেটে সেই দিনের একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার পরিচায়ক কতকগুলো চিঠি পাওয়া যায়। সেই চিঠিগুলো পেয়ে কাদম্বরী দেবী ক'দিন বিমনা হয়ে কাটান। সেই চিঠিগুলোই তাঁর আত্মহত্যার কারণ এই কথা নাকি কাদম্বরী দেবী লিখে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই লেখাটি ও চিঠিগুলো সবই মহর্ষির আদেশে নষ্ট করে ফেলা হয়'।

প্রভাতবাবু এরই জের টেনে আরও লিখেছেন, পাদটিকায় ওদুদ লিখিতেছেন, 'ঠাকুরবাড়ির একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির মুখে শুনেছি, যে মহিলার সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গতা জন্মেছিল, তিনি অভিনেত্রী ছিলেন না এবং তাঁর সঙ্গে এই অন্তরঙ্গতার জন্য কাদম্বরী দেবী আরও একবার (রবীন্দ্রনাথের বিবাহের পূর্বে) আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর তারিখ ১৮৮৪ সালের ১৯শে এপ্রিল। এর আগে তিনি আত্মহননের চেষ্টা করেছিলেন ১৮৮০ সালের সেপ্টেম্বর

মাসে। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই রচনা করেছিলেন তাঁর কবিতা 'তারকার আত্মহত্যা'। প্রভাতকুমার ভারতীর মূল পাঠ থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তার প্রারম্ভিক পংক্তি: 'জ্যোতির্ময় তীর হতে আঁধার সাগরে ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা—একেবারে উন্মাদের পারা'। এই প্রসঙ্গটি তিনি আলোচনা করেছেন তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থের ১১৯ পৃষ্ঠায় 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের পর্ব: ১' পরিচ্ছেদে। তিনি লিখেছেন—'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌবনে নাট্যকার ও অভিনেতার খ্যাতি অর্জন করিয়া রঙ্গমঞ্চের নটনটীদের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া অপবাদ শোনা যায়। জানি না, এইরূপ কোনো সন্দেহের বশবর্তী হইয়া এই অভিমানিনী রমনী আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না!'

তথ্যের প্রসঙ্গ এইটুকুই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টিশীল মানসিকতা সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায়, তাতে তাঁকে উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের মানুষ বলে কখনোই ধারণা করা যায় না। যদি রটনার পথ ধরে অগ্রসর হতে হয়, তাহলে এই পর্যন্ত বলা চলে যে, ১৮৭৪ সালের আগস্টে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীতব্য তাঁর প্রথম নাটক 'পুরুবিক্রম'-এর অভিনয়-আয়োজন-প্রাক্কালে যদি তিনি মঞ্চে গিয়েই থাকেন তখন তাঁর চেহারা ছিল যথার্থ রাজপুত্রের মতো। অমৃতলাল বসু এক জায়গায় ওঁকে প্রথম দেখার স্মৃতি থেকে মন্তব্য করেছিলেন, যেন, 'গ্রীক সৌন্দর্যের মূর্তিময় প্রতিরূপ' দেখলাম। টকটক করছে গায়ের রঙ, সুঠাম, সুগঠিত দেহসৌষ্ঠব, মুখমণ্ডলে চাপা গাম্ভীর্য খড়্গ নাসিকা সমন্বিত হয়ে এক অভাবনীয় ব্যক্তিত্বের সূচনা করেছে।' এঁকে দেখে অভিনেত্রীকুল যদি সেদিন বিস্ময়ে ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। 'ঐলবিলা'র অভিনয় দেখে নাট্যকার খুশি হয়েছিলেন এবং এই খুশির জের টেনে কোনো 'ক্ষণকালের ছন্দ' গড়ে উঠেছিল কিনা, তা অনুমান করার উপায় নেই, কারণ তথ্যের অভাব। ওঁর 'অশ্রুমতী'ও অভিনীত হয় বেঙ্গলে। তখনো এরকম কিছু দেখা-সাক্ষাৎ ঘটে থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তা বিশেষ অন্তরঙ্গতায় পৌঁছেছিল বলে মনে করার কারণ নেই। হয়ত পরস্পরের গুণগ্রাহী হয়েছিলেন ওঁরা। এই গুণগ্রাহিতার জের ১৮৭৪-এর মাঝামাঝি সময় থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত গড়াতে পারে কী, যে-সালে কাদম্বরী দেবী আত্মহননের প্রয়াস করেছিলেন? যদি এ নাট্যের নায়িকা গোলাপসুন্দরীই হয়ে থাকেন, তাহলে অনুমান করা যায়, এই পারস্পরিক গুণগ্রাহিতা থেকে যদি কোনো কানাকানি উঠে

থাকে, তাহলে 'বড়োঘরের সম্মান'-এর যাতে হানি না হয়, সেজন্য ১৮৭৫ এর ১৬ই ফেব্রুয়ারি উপেনবাবু গোলাপের বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। রটনার যবনিকাপাত এখানেই ঘটেছিল, অন্তত সাময়িক ভাবে। এঁদের বিবাহিত জীবন সুখের হলেও সামাজিক ভ্রূকুটি ও অত্যাচার এঁদের নিরন্তর তাড়না করে বেড়াতে লাগলো। সুকুমারী দত্ত বা গোলাপ যখন অভিনয় জগতে আসেন, তখন প্রথমদিককার অভিনয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না। অনুমান করা যায়, শরৎচন্দ্র ঘোষ ও বিহারী লাল চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে তখন চলছিল তাঁর শিক্ষার কাল। বলাবাহুল্য, এঁরা সমাজের যে-স্তর থেকে উঠে এসেছিলেন, সেদিন সেখানে শিক্ষার আলোক ছিল না। কোনক্রমে অক্ষর পরিচয় হয়ত কারুর কারুর ছিল। এঁদের গানটানের শিক্ষা ছিল বহুলাংশে শ্রুতিনির্ভর। তাই অভিনয়ক্ষেত্রে এসে তাঁদের রীতিমত শিক্ষাগ্রহণ করতে হতো। প্রাথমিক শিক্ষাটুকু না হলে এঁরা নাটকে অভিনয় করবেন কী করে, আর তার অঙ্গস্বরূপ পাঠ মুখস্থ করবেন কী করে? সেই কথাটা মনে রেখে গোলাপসুন্দরী তথা সুকুমারী দত্তের মধ্যে এক বিশেষ ক্ষমতার স্ফুরণ দেখে বিস্মিত হতে হয়। ঐ ১৮৭৫ সালেই তিনি লিখে ফেলেন একটি নাটক 'অপূর্ব সতী', এবং সেটি কৃষ্ণধন বান্দ্যোপাধ্যায়-পরিচালিত 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল থিয়েটার' কর্তৃক গ্রেট ন্যাশানাল মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল।

ইতিমধ্যে গোলাপসুন্দরীর একটি মেয়ে হয়। ওদিকে থিয়েটার জগতে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটকের অভিনয় ও পুলিশী অভিযান ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিপর্যস্ত হয়ে উপেন্দ্রনাথ দাস চলে যান বিলেত। কিন্তু এঁর অবর্তমানে গোষ্ঠবিহারী-সুকুমারী পড়ে যান ঘোর বিপদে। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, বিবাহ করে স্ত্রীকে নিয়ে নিজের বাড়িতে অধিষ্ঠিত হতে পারেন নি গোষ্ঠবিহারী। তাঁকে আলাদা বাসা করে স্ত্রীকে নিয়ে থাকতে হতো। যতদূর শোনা যায়, এই বিবাহের অপরাধে তিনি তাঁর বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন এবং তাই ছিল সেযুগে স্বাভাবিক ঘটনা! উপেন্দ্রনাথ চলে যেতে গোষ্ঠবিহারী চোখে অন্ধকার দেখলেন বলা যেতে পারে। নেই আত্মীয় পরিজন, নেই বন্ধুবান্ধব, তাঁর পক্ষে দিশাহারা হয়ে পড়া স্বাভাবিক। তিনি উপেনবাবুকে ধরবার জন্য নিজেই যাত্রা করলেন বিলেত, কোনো এক জাহাজে সামান্য খালাসীর চাকরি নিয়ে। আর তাঁর কোনো খবর নেই। এক

বছর পরে দেশে ফিরলেন উপেন্দ্রনাথ। কিন্তু তিনি গোষ্ঠর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। না, তাঁর সঙ্গে বিলেতে দেখা হয় নি গোষ্ঠবিহারীর। তাহলে তিনি গেলেন কোথায়? তাঁর আর কোনো খোঁজ মেলেনি!

এই অবস্থায় শিশুকন্যা নিয়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় সুকুমারীর কেমন দিন কেটেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বারাঙ্গনার জীবনে প্রলোভনের শেষ নেই। কিন্তু সেসব জয় করে তিনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে লাগলেন। আজকের দিনে কথাটা শুনে অবাক হতে হবে, সে যুগে তিনি খুলেছিলেন অভিনয়-শিক্ষাদানের একটি স্কুল। তখনকার দিনে কোনো কোনো বারাঙ্গনা নিজেদের ঘৃণ্য পরিবেশ থেকে উঠে রঙ্গমঞ্চে আসবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন ওঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। বোধ হয় এই স্কুলটি গোলাপ খুলেছিলেন তাঁদেরই জন্য। কিন্তু তাতেও যখন আর্থিক অবস্থার সুরাহা হলো না, তখন মেয়েটিকে 'নব্য-ভারত'-সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে রেখে আবার ফিরে আসেন অভিনয় জগতে। পরে মেয়েটি বড়ো হলে তিনি ওর বিবাহ দিয়েছিলেন ঐ 'তিন আইন' অনুসারে এবং মেয়েটি স্বামী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখেই সংসার করেছিল বলে শোনা যায়।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায়, অর্থকৃচ্ছতা ও অসহায়তার দিনে, অর্থাৎ দুঃসময়ে, তিনি পরিচিত জনের কাছে হয়ত কোনো সাহায্য চেয়ে থাকবেন। যেমন 'নব্যভারত'-সম্পাদক কন্যাটিকে নিজের কাছে নিয়ে এসে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন, তেমনি অন্য সহৃদয় হিতৈষীরাও তাঁকে কোনো কোনো বিষয়ে সহায়তা করে থাকবেন। হয়ত বা তাঁরা নিজেরা এসে ওঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও করে যেতেন, খোঁজখবরও নিতেন। যদি রটনার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য থেকে থাকে, তাহলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁদের মধ্যে একজন হতে পারেন। যেহেতু গোলাপ মূলত বারাঙ্গনা ছিলেন, সেহেতু কোনো কোনো মহল থেকে কলঙ্ক-কাহিনী বানানো হতে পারে, কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত বলে অন্য কথা। 'অপূর্ব সতী'-র লেখিকা ঘৃণ্যজীবনে প্রত্যাবর্তন করতে চান নি বলে সংগ্রাম করেছিলেন, আর, সংবেদনশীল হৃদয়বান পুরুষরা তাঁর কাছে গিয়েছিলেন যথার্থ বন্ধুর মতো। এবং এটাই স্বাভাবিক। কাদম্বরী দেবীর প্রথম আত্মহনন-প্রচেষ্টার মূলে চিঠি ছিল না, ছিল চার বছর

পত্রের আত্মহত্যার সময়ে, যদি চিঠির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে হয়। এই চিঠির লেখিকা সুকুমারী কিনা তা নিশ্চয় করে বলা যায় না, তবু যদি ধরে নেওয়া যায়, চিঠি লিখেছিলেন তিনিই—তবে সে চিঠিতে দোষনীয় কিছু ছিল বলে মনে হয় না। হয়ত বন্ধুত্বপূর্ণ সে চিঠির ভাষা। কিন্তু স্বাক্ষর কার? স্ত্রীলোকের কলঙ্ক সহজে যায় না। যিনি লিখেছিলেন, তাঁর ইতিহাস যদি কলঙ্কময় হয়ে থাকে, তাহলে কাদম্বরী দেবীর পক্ষে 'কদিন বিমনা হয়ে' কাটানো তখনকার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে অবাক হবার মতো ঘটনা নয়। বিশেষ করে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'-র প্রথম খণ্ডে 'সন্ধ্যাসঙ্গীতের পর্ব: ১—পরিচ্ছেদে কাদম্বরী দেবীর বর্ণনায় যেখানে বলছেন, 'এই অসামান্য নারী ছিলেন যেমন অভিমানিনী, তেমনি সেন্টিমেন্টাল এবং আরও বলিব, ইনট্রোভার্ট, স্কিজোফ্রিনিক (সিজোফ্রেনিক?)'

সুকুমারী বা গোলাপসুন্দরীর 'অপূর্ব সতী' একমাত্র নাটক। এ নাটকের বিষয়বস্তু আমাদের জানা নেই, কিন্তু যাই তিনি লিখে থাকুন না কেন, তাঁর অন্তর্বেদনার খবর কোনো না কোনোভাবে ব্যক্ত হয়ে থাকবেই!

প্রসঙ্গত বিনোদিনীর কথা এসে পড়ে। ১৮৭৪ এর ২রা ডিসেম্বর ভট্টনারায়ণের 'বেণীসংহার' অবলম্বনে হরলাল রায়ের লেখা 'শত্রু সংহার' মঞ্চস্থ হয়েছিল গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে। এতে দ্রৌপদীর সখীর একটি ছোট্ট ভূমিকায় বিনোদিনী আত্মপ্রকাশ করে, তখন তার বয়স মাত্র এগারো বছর। ১৯৭৫-র মার্চ মাস নাগাদ ধর্মদাস সুরের ব্যবস্থাপনায় অর্ধেন্দুশেখর প্রভৃতিদের সঙ্গে বিনোদিনী উত্তর ভারতে অভিনয় করতে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু ওর প্রসঙ্গে পরে আসছি। এই সালেরই ২রা জানুয়ারি মঞ্চস্থ হলো উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' নাটক যাতে গোলাপসুন্দরী 'সুকুমারী' হয়ে যান।

উপেন্দ্রনাথ এরপরে আসেন বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চে। এখানে দি নিউ এরিয়ান থিয়েটার কোং-এর প্রযোজনায় তাঁর লেখা নাটক 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' মঞ্চস্থ করেন তিনি। এতে সুরেন্দ্র—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যাজিস্ট্রেট—হরিদাস দাস (হরি বোষ্টম), বিরাজমোহিনী সুকুমারী। এক অত্যাচারী ইংরেজ জেলাশাসকের ক্রুরতা ও পৈশাচিকতাকে কেন্দ্র করে নাটক মূলতঃ গড়ে ওঠে। অত্যাচারী

সে ইংরেজ শেষপর্যন্ত তার শাস্তি পেয়েছিল, কিন্তু তার আগে সুরেন্দ্রনাথের বোন বিরাজমোহিনীর ওপর পাশবিক অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছিল। বিরাজমোহিনী কোনোরকমে দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়ে আহত হয়। আবার তাকে ধরে আনে ঐ অত্যাচারী ইংরেজ শাসক। বলা বাহুল্য, তখনকার দিনে একজন ইংরেজ অত্যাচারীর চরিত্র অঙ্কন করা কম সাহসের পরিচয় নয়! বেঙ্গলে এটি যখন অভিনীত হয়, তখন কারও টনক নড়ে নি, কিন্তু ১৮৭৬ সালে গ্রেট ন্যাশানালে আবার যখন এর অভিনয় হয়, তখন দারুণ সোরগোল উঠেছিল। গ্রেট ন্যাশানালে সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর প্রথম অভিনয় হয় ১৮৭৫-এর ৩১শে ডিসেম্বর। এই নাটকে রক্তাক্ত শাড়ি-পরা আলুলায়িতকুন্তলা বিরাজমোহিনীকে দেখা যেতো অত্যাচারী ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের কবলে। তখন নাট্যনিয়ন্ত্রণ-আইন ছিল না, কিন্তু নাটকের ঐসব দৃশ্য ইংরেজ রাজশক্তি আদৌ ভালো চোখে দেখে নি।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে ইংলণ্ড থেকে আগত যুবরাজ (পরবর্তীকালের সপ্তম এডওয়ার্ড)-কে অভ্যর্থনা-জ্ঞাপন দেশবাসীর দ্বারা ধিকৃত হয়েছিল। উপেন্দ্রনাথ দাস এ-নিয়ে লিখলেন 'গজদানন্দ প্রহসন'। এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটকের সঙ্গে অভিনীত হলো ১৮৭৬-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারী। এর গানগুলি লিখে দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র। ক্ষেত্রমণি গাইতেন: 'আমি পিসী থাকতে ভাবনা কীরে বোকা ছেলে। অনেক সুকৃতির ফলে আমার মতন পিসী মেলে'। অমৃত মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু) গাইতেন—'ওরে জজ হতে চাও গজ গিরিধন!' যুবরাজ সাজতেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর গজদানন্দ—মহেন্দ্র বসু। এই সালেরই ২৩শে ফেব্রুয়ারি 'সতী-কি-কলঙ্কিনী'র সঙ্গে প্রহসনটি আবার দেওয়া হলো। পুলিশ থেকে এটি বন্ধ করে দিতে বলা হলো। ২৬শে ফেব্রুয়ারী তবু এটি অভিনীত হলো অন্য নামে (কর্ণাটকুমার ও হনুমান চরিত্র)। পুলিশ আবার এসে হুঁসিয়ার করে দিয়ে গেল। ওঁরা দমে না গিয়ে 'Police of Pig and Sheep' নাম দিয়ে ওটির আবার অভিনয় করলেন সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর সঙ্গে পয়লা মার্চ। এবার অর্ডিন্যান্স তৈরি হলো ও সেটি জারীও হলো। প্রথমে হচ্ছিল প্রহসনখানার অভিনয়। সেটি বন্ধ হয়ে যেতে ওঁরা 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী'তে এর প্রতিশোধ নেবেন.

ঠিক করলেন। এতে ম্যাজিস্ট্রেট সেজেছিলেন অমৃতলাল বসু। তিনি বিরাজমোহিনীকে বললেন,—'সুন্দরী! হামার কাছে আইস—ডরো মৎ। আমি টাইগার না আছে!'—এই নির্দিষ্ট সংলাপের সঙ্গে সেদিন তিনি যোগ করে দিলেন,—'হামি পিগ না আছে—সিপ না আছে! (পুলিশ-কর্তা দুজনের নাম ছিল স্টুয়ার্ট হগ আর ল্যাম্ব)। এই নাটকের এক জায়গায় ম্যাজিস্ট্রেট বিরাজমোহিনীকে আক্রমণ করলে সে বারান্দায় বেরিয়ে এসে নিচে লাফিয়ে পড়ে। ম্যাজিস্ট্রেট তখন বলে,—By Jove! Sweet lady—Ah! She has actually jumped down from the balcony! বলেই সে নিচে নেমে গিয়ে রক্তাক্ত, আহত বিরজমোহিনীকে পাঁজাকোলা করে মঞ্চে এনে হাজির করতো। বিরাজমোহিনীর কাপড়ে রক্তের দাগ। পুলিশ অভিযোগ আনলো, বিরাজমোহিনীর ওপর ম্যাজিস্ট্রেটের পাশবিক অত্যাচারের চিহ্ন দেখানোই এ-দৃশ্যের উদ্দেশ্য। আর যাবে কোথায়? পুলিশ গ্রেপ্তার করলো উপেন্দ্রনাথ দাস, অমৃতলাল বসু, স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী, মহেন্দ্র বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে। এই মামলা নিয়ে নিদারুণ আলোড়ন! বিচারপতি ফিয়ার 'এতে কোনো অশ্লীলতা নেই' বলে আসামীদের মুক্তি দেন। ফলে ওপর মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। শেষ পর্যন্ত ফিয়ারকে বিদায় নিতে হয়েছিল। কিন্তু বাঙালী সমাজ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেন নি।

যাই হোক, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর একখানি নাটক গ্রেট ন্যাশানালে অভিনীত হয়েছিল। নাটকখানির নাম 'সরোজিনী'। এতে নাম ভূমিকায় ছিল বিনোদিনী, তখন তার মাত্র তেরো বছর বয়স। অভিনয়ের তারিখ ১৫ই জানুয়ারি ১৮৭৬ সাল। এ-নাটকে প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদিসের একটি নাটকের ছায়া আছে বলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহের 'প্রসঙ্গ-কথা'য় উল্লেখিত রয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা কর্তব্য, এর পরে আসতে থাকে বিনোদিনীর যুগ। বিনোদিনী ও গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী) বহু নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করেছেন। সে বর্ণনায় আমরা পরে আসছি।

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, 'অনুমান ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী বিনোদিনী কলিকাতার কোনো এক নিন্দিত পল্লীতে জন্মগ্রহণ করে।······সেখানে অভাব পূর্ণমাত্রায় সর্বদা বিরাজিত ছিল···

কোনক্রমে তাহাদের দিন গুজরাণ হইত।' বিনোদিনী থাকতো তার মা আর দিদিমার সঙ্গে, দিদিমার বাড়িতে। ভাড়াটেদের ভাড়ায় অতি কষ্টে চলতো। বিনোদিনীর একটি ছোট ভাইও ছিল। অভাব মোচনের জন্য দিদিমা আড়াই বছর বয়সের একটি বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে পাঁচ বছরের সেই ভাইটির বিয়ে দিয়ে কিছু গয়না পেয়েছিলেন। সেই গয়না বিক্রি করে দিন চলতো। কিন্তু বিনোদিনীর সেই ভাইটি শিশু-বয়সেই মারা যায়। খুব বাচ্চা বয়সে দিদিমা বিনোদিনীরও বিয়ে দিয়েছিলেন ওর থেকে একটু বড়ো সুন্দর একটি ছেলের সঙ্গে। ঐ ধরণের পল্লীতে তখন এই ধরণের বিয়ের রীতি ছিল। মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর ওঠানো নিয়ে কথা। তারপরে ছেলেটিকে সরিয়ে দেওয়া হতো, আর মেয়েটিকেও যথারীতি 'ব্যবসা'তে নামানো হতো। তেরো-চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ের কথা লেখকের জানা আছে, যার সঙ্গে অন্যত্র থেকে একটি ছেলেকে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে তারপরে তাকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছিল। বিনোদিনী তার বিয়ে সম্পর্কে তার 'আমার কথা'য় লিখে গেছে,—'শুনিয়াছি আমারও বিবাহ হইয়াছিল এবং একথাও মনে পড়ে যে, আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়ো একটি সুন্দর বালক ও আমার ভ্রাতা, বালিকা ভ্রাতৃবধূ এবং অন্যান্য প্রতিবেশিনী বালিকা সকলে মিলিয়া আমরা একত্রে খেলা করিতাম। সকলে বলিত ঐ সুন্দর বালকটি আমার বর। কিছুদিন পরে আর তাহাকে দেখিতে পাই নাই।'

বিনোদিনীর যখন মাত্র ন'বছর বয়স তখন তাদের বাড়ির একটি ঘরে একটি ভাড়াটে বাস করতে আসে, তার নাম ছিল গঙ্গাবাঈজী। এই গঙ্গামণিই পরে স্টার থিয়েটারের প্রখ্যাত গায়িকা হয়েছিল। ওদের বাড়িতে ভাড়াটে হয়ে আসার পর বিনোদিনীর সঙ্গে তার বড়ো ভাব হয়েছিল, পরস্পরে তারা 'গোলাপ ফুল' পাতিয়েছিল। এর কাছে বিনোদিনী গান শিখতে থাকে। গঙ্গামণির ঘরে গান শুনতে দুজন ভদ্রলোক আসতেন। তাঁদেরই একজনের চেষ্টায় ভুবনমোহন নিয়োগীর 'গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার'-এ দশ টাকা মাইনেতে বিনোদিনী প্রবেশ করে। তখন তার বয়স মাত্র এগারো বছর। সে লিখেছে, 'আমি যখন প্রথম থিয়েটারে যাই, তখন রসিক নিয়োগীর গঙ্গার ঘাটের উপর যে বাড়ি ছিল, তাহাতে থিয়েটারের রিহার্সাল হইত।...বড়ই রমনীয় স্থান ছিল, একেবারে গঙ্গার উপরে বাড়ি ও বারান্দা, নিচে গঙ্গার

বড়ো বাঁধানো ঘাট।...আমি সেই টানা বারান্দায় ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়াইতাম।...আমরা যে তখন বিশেষ গরিব ছিলাম তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। ঐ নিজের একখানি বসত বাটী ছাড়া, ভালো কাপড়, জামা বা অন্য দ্রব্যাদি আমাদের কিছুই ছিল না। সেই সময় রাজা বলিয়া যে প্রধানা অভিনেত্রী ছিলেন, তিনি আমায় ছোট হাতকাটা দুটি ছিটের জামা তৈয়ারি করাইয়া দেন।...সেই জামা দুইটিই আমার শীতের সম্বল ছিল।'

আগেই বলেছি 'বিনোদিনীর প্রথম অভিনয় 'শত্রুসংহার' নাটকে দ্রৌপদীর সখীর একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায়। সেই এগারো-বারো বছরের মেয়েটি এই সখীর কথা কয়টি 'প্রাণপণ যত্নে তাঁহাদের শিক্ষানুযায়ী সুচারুরূপে ও সেইরূপ ভাবভঙ্গির সহিত বলিয়া চলিয়া আসিল। সে লিখে গেছে, আসিবার সময় সমস্ত দর্শক আনন্দধ্বনি করিয়া করতালি দিতে লাগিলেন। তার নটী-জীবনের প্রথম অভ্যর্থনা। এটি ১৮৭৪ সালের ১২ই ডিসেম্বরের ঘটনা। একটি তালিকায় দেখতে পাই ১৮৭৫-এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে বিনোদিনী দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', 'সরলতা' ও 'নবীন তপস্বিনী'তে 'কামিনী'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। (উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ-প্রদত্ত তালিকা: তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত)।

এরপরে হরলাল রায়ের 'হেমলতা'য় বিনোদিনীকে দেখা যায় একেবারে নাম-ভূমিকায়, নায়িকার অংশে ঐ ১৮৭৫-এরই ৬ই মার্চ তারিখে। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, 'বিনোদিনী হেমলতার ভূমিকাটি এত সুন্দর অভিনয় করিল যে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়গণকেও সে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। তাঁহারা একেবারেই আশা করিতে পারেন নাই যে এই ক্ষুদ্র বালিকার দ্বারা এত বড়ো উচ্চ অংগের অভিনয় কিছুতে সম্ভব।'

বিনোদিনী এ-বিষয়ে নিজে লিখেছে—'সে সময় হইতে আমি প্রায়ই প্রধান প্রধান পার্ট অভিনয় করিতে বাধ্য হইতাম। আমার অগ্রবর্তী অভিনেত্রীগণ যদিও আমার অপেক্ষা অধিকবয়স্কা ছিলেন, তথাপি অল্পদিনের কাজেই তাহাদের সমান হইয়াছিলাম।' উপেন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আরও লিখেছেন—'বিনোদিনী তখন নিতান্ত বালিকা, কাজেই তাঁহাদের তাহাকে ছোকরাদের বয়সী ভূমিকা সাজাইবার যাত্রাওয়ালাদের প্রথা অবলম্বনে করিতে হইত।'

গিরিশচন্দ্রও বিনোদিনীর গ্রন্থের ভূমিকায় মন্তব্য করে গেছেন,—'শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ চাঁদনীর উপর আমার সহিত প্রথম দেখা। তখন বিনোদিনী বালিকা।...সে সময় তাহাকে নায়িকা সাজাইতে সঙ্জাকরণে যাত্রার দলে ছোকরা সাজাইবার প্রথা অবলম্বন করিতে হইত। কিন্তু সে সময় তাহার শিক্ষা-গ্রহণের ঔৎসুক্য ও তীব্র মেধা দেখিয়া ভবিষ্যতে যে বিনোদ রঙ্গমঞ্চে একজন প্রধান অভিনেত্রী হইবে তাহা আমার উপলব্ধি হইয়াছিল।'

এরপরে গ্রেট ন্যাশানালের একটি দল ধর্মদাস সুরের তত্ত্বাবধানে পশ্চিমে অভিনয় করতে বেরিয়ে পড়ে। বিনোদিনীর বয়স তখন বারো বছর মাত্র। দলে বিনোদিনী ও তার মা ছাড়া ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর, অবিনাশ কর, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি। লক্ষ্মৌতে 'নীলদর্পণ' অভিনীত হয়েছিল, এতে বিনোদিনী সাজতেন 'সরলতা'। রোগ সাহেব যখন ক্ষেত্রমণির ওপর পাশবিক অত্যাচার করতে উদ্যত, তখন তোরাব দরজা ভেঙে ঢুকে রোগ সাহেবকে দারুণ প্রহার করে। মতিলাল সুর সাজতেন তোরাপ আর অবিনাশ কর 'রোগ সাহেব।' মঞ্চে 'সাহেব'কে মারতে দেখে দর্শকদলের 'লালমুখো' প্রকৃত সাহেবরা উত্তেজিত হয়ে স্টেজে উঠে তোরাপকে মারতে উদ্যত হন। বিনোদিনী লিখেছে, 'এইসব কারণে আমাদের কান্না, অধ্যক্ষদিগের ভয়, আর ম্যানেজার ধর্মদাস সুর মহাশয়ের কম্পন। তারপর অভিনয় বন্ধ করিয়া পোষাক আসবাব বাঁধিয়া ছাদিয়া বাসায় একরকম পলায়ন। পরদিন প্রভাতেই লক্ষ্মৌ নগর পরিত্যাগ করিয়া হাঁফ ছাড়ন।'

বিনোদিনী এই পশ্চিম পরিভ্রমণের সময় 'সতী কি কলঙ্কিনী'তে রাধিকা, 'নবীন তপস্বিনী'তে 'কামিনী', 'সধবার একাদশী'তে 'কাঞ্চন' 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে 'রতি' ইত্যাদি ভূমিকাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। তার লাহোর-বাসকালীন একটি ঘটনা বিনোদিনী লিখে গেছে—'লাহোরে যখন আমরা অভিনয় করি, তখন আমার সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। সেখানে গোলাপ সিংহ বলিয়া একজন বড়ো জমিদার মহাশয়ের খেয়াল উঠিল যে তিনি আমায় বিবাহ করিবেন এবং যত টাকা লইয়া আমার মাতা সন্তুষ্ট হন তাহা দিবেন। পূর্বোক্ত জমিদার মহাশয় অর্ধেন্দুবাবু ও ধর্মদাসবাবুকে বড়োই পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তখন উঁহারা বড়োই মুস্কিলে পড়িলেন। তিনি নাকি সেখানকার একটি বিশেষ বড়ো লোক। একে বিদেশ, উপরন্তু

এই সকল কথা শুনিয়া আমার মাতাও কাঁদিয়াই আকুল, আমিও ভয়ে একেবারে কাঁটা! এই উপলক্ষে আমাদের শীঘ্রই লাহোর ছাড়িতে হয়।'

এই লাহোর ভ্রমণ সম্বন্ধে কালীশবাবু তাঁর 'বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস-এ' লিখে গেছেন,—'অর্ধেন্দুশেখর গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সংগে আলাপ জমিয়ে নিতেন—ফলে প্রায়ই তাঁর নিমন্ত্রণ থাকতো এবং শিল্পীরা অনেক সুযোগ-সুবিধা পেতেন। আত্মজীবনীতে শ্রীমতী বিনোদিনী গোলাপ-বাগের সৌন্দর্য-বর্ণনায় কবি-মনের পরিচয় দিয়েছেন। রাভি-নদীতে স্নান করতে যেতেন শিল্পীরা—ওখানকার স্থানীয় মেয়েরা যখন স্নান করতেন, তখন নদীর পাড়ে পরিচ্ছদ রেখে নগ্নভাবে জলে নামতেন। নিজেদের মধ্যে কত রং-তামাশা করতেন—পাড় দিয়ে লোকজন যাতায়াত করতো, সেদিকে ভ্রক্ষেপও করতেন না। লাহোরে 'সতী-কি কলঙ্কিনী' নাটকে বিনোদিনী রাধিকা সাজতেন। অপূর্ব মানাতো তাঁকে। এই অভিনয় দেখে গোলাপ সিং নামে ওখানকার এক ধনী বিনোদিনীকে বিয়ে করতে চাইলেন এবং বিনোদিনীর মাকে নগদ ৫০০০ টাকা—তাছাড়া মাসে মাসে ৫০০ টাকা করে মাসোহারা দিতে স্বীকৃত হলেন। বিনোদিনীর মা যদি মেয়ের সংগে থাকতে চান তাতেও তিনি রাজী ছিলেন। ভদ্রলোককে সবাই খাতির করতো, মস্ত বড়ো লোক। রাজা বলে তাঁকে সকলে ডাকতো। দেখতেও সুপুরুষ ছিলেন, তবে দাড়ি ছিল। দাড়িকে বিনোদিনী ভয় করতেন। গোলাপ সিং-এর প্রস্তাবে বিনোদিনীর মা তো কেঁদেই আকুল, শেষে ধর্মদাসবাবু তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেন।'

ঐ ১৮৭৫ সালেরই মে-মাসের মাঝামাঝি ওঁরা কলকাতায় ফিরে আসেন। ফিরে আসবার পরে গ্রেট ন্যাশানালে বারো বছর বয়স্কা বিনোদিনী দুটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, একটি হচ্ছে ব্রজেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা নাটক 'প্রকৃত বন্ধু', এতে তার চরিত্রের নাম ছিল 'বনবালা'। আর অন্যটি হচ্ছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী'। এই নাটকের 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা। বিনোদিনী লিখছেন, 'আমি সরোজিনী সাজতাম। সরোজিনীকে বলি দেবার জন্য যূপকাষ্ঠের কাছে আনা হলো, রাজমহিষীর সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা করে রাজা স্বদেশের কল্যাণ-কামনায় কন্যার বলিদানের আদেশ দিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রোদন করছেন। উত্তেজিত রণজিৎ সিংহ শীঘ্র কাজ শেষ করবার

জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। কপট ব্রাহ্মণ-বেশধারী ভৈরবাচার্য তরবারি হস্তে সরোজিনীকে যেমন কাটতে এসেছে, এমন সময়ে বিজয় সিংহ সেখানে ছুটে এসে বললেন,—সব মিথ্যে, সব মিথ্যে! ভৈরবাচার্য ব্রাহ্মণ নয়, মুসলমান।...অমনই সমস্ত দর্শক একেবারে ক্ষেপে উঠে মারমার কাট কাট করে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।'

'সরোজিনী' নাটক মৌলিক নয়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ'-এর 'প্রসঙ্গ কথা'য় বলা হয়েছে, ঐ নাটকে 'প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার এউরিপিদেসের 'ইফিগেনেইয়া হে এন আউলিদি,—আউলিস বন্দরের কুমারী ইফিগেনেইয়া—'নাটকের ছায়া আছে।'

এর কিছু পরে বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন পঁচিশ টাকা মাসিক বেতনে। এখানে বিহারীবাবুর দেওয়া নাট্যরূপ 'মেঘনাদ বধ'-এ 'প্রমীলা' করতো বিনোদিনী। ১৮৭৭ সালের চব্বিশে মার্চের ঘটনা এটি। ১৬ই এপ্রিল করলো ঐ বঙ্কিমচন্দ্রেরই 'মৃণালিনী' (বিহারীবাবুর নাট্যরূপ)-তে 'মনোরমা। এই সময় গোলাপসুন্দরীও ফিরে এসেছিলেন বেঙ্গলে। তিনি এই নাটকে 'গিরিজায়া'র ভূমিকায় গান গেয়ে আসর মাত করে দিতে লাগলেন। এ-নাটকে বিহারীলাল করতেন মাধবাচার্য, হরি বোষ্টম—হেমচন্দ্র, আর পশুপতি—কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেঙ্গল থিয়েটারে থাকার সময়ই বিনোদিনীর খ্যাতির প্রকৃত বিস্তার। বেঙ্গলে থাকাকালীন কয়েকটি দুর্ঘটনারও সে সাক্ষী। বিনোদিনী লিখে গেছে—'একবার আমরা চুয়াডাঙায় সদলবলে যাই। আমাদের জন্য একখানি গাড়ি রিজার্ভ করা হইয়াছিল। সকলে একত্রে যাইতেছি। মনে স্মরণ নাই, মাঝখানে কোন স্টেশনে তাহাও মনে নাই, তবে সে যে একটি বড়ো স্টেশন সন্দেহ নাই। সেইস্থানে নামিয়া উমিচাঁদ বলিয়া ছোটবাবু মহাশয়ের একজন আত্মীয় (আমরা মাননীয় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে ছোটবাবু বলিয়া জানিতাম) ও আর দুই চারিজন অ্যাক্টর আমাদের জন্য খাবার আনিতে গেলেন। জলখাবার ইত্যাদি লইয়া সকলে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু উমিচাঁদবাবুর আসিতে দেরি হইতে লাগিল। এমন সময় গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে। ছোটবাবু মহাশয় গাড়ি হইতে মুখ বাড়াইয়া—ওহে উমিচাঁদ, শীঘ্র এসো, শীঘ্র এসো, গাড়ি যে ছাড়িল—বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। গাড়িও একটু একটু চলিতে লাগিল। ইত্যবসরে উমিচাঁদবাবু দৌড়িয়া আসিয়া

গাড়িতে উঠিলেন। গাড়িও জোরে চলিল। তখন উমিচাঁদবাবু অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়িলেন। ছোটবাবু মহাশয় ও অন্যান্য সকলে—সর্দি-গর্মি হইয়াছে, জল দাও, জল দাও—করিতে লাগিলেন। চারুচন্দ্র বাবু (শরৎবাবুর দাদা) ব্যস্ত হইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এমন দুর্দৈব যে সমস্ত গাড়িখানার ভিতর একটি লোকের কাছে এমন এক গণ্ডুষ জল ছিল না যে সেই আসন্ন-মৃত্যু লোকটির তৃষ্ণার জন্য তাহা দেয়। ভুনী (বনবিহারিণী) তখন সবেমাত্র বেঙ্গল থিয়েটারে কার্যে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার কোলে ছোট মেয়ে, সে আর অন্য কোনো উপায় নাই দেখিয়া আপনার স্তন-দুগ্ধ ঝিনুকে করিয়া উমিচাঁদবাবুর মুখে দিল। কিন্তু তাঁহার প্রাণ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল। বোধ হয় দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই এই দুর্ঘটনা ঘটিল। গাড়িশুদ্ধ লোক একেবারে ভয়ে ভাবনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িল। ছোটবাবু মহাশয় উমিচাঁদবাবুর মুখে মুখ রাখিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি একে বালিকা, তাহাতে ওরকম মৃত্যু কখনো দেখি নাই, ভয়ে মাতার কোলের উপর শুইয়া পড়িলাম।...উমিচাঁদবাবু মাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন।'

বেঙ্গল থিয়েটারে থাকাকালীন আর একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার কথা বিনোদিনী উল্লেখ করেছে,—'আর একবার বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত সাহেবগঞ্জ না কোথায় একটি জঙ্গলা দেশে যাইবার সময়ে ঘোর বিপদে পড়ি। নির্দিষ্ট স্থানে যাইতে কতটা জঙ্গলের মধ্য দিয়া হাতি ও গরুর গাড়িতে যাইতে হয়। চারিটি হাতি ও কয়েকখানি গরুর গাড়ি আমাদের জন্য প্রেরিত হইয়াছিল; যাহারা যাহারা গরুর গাড়িতে যাইবে তাহারা তিনটার সময় চলিয়া গেল। আমি ছেলেমানুষীর ঝোঁকে বলিলাম যে হাতির উপর যাইব। ছোটবাবু মহাশয় কত বারণ করলেন, কিন্তু আমি কখনো হাতি দেখি নাই, চড়া তো দূরের কথা। ভারি আমোদ হইল। আমি গোলাপকে বলিলাম,—দিদি, আমি তোমার সঙ্গে হাতিতে যাব। গোলাপ বলিল, আচ্ছা যাস। সে আমায় তার সঙ্গে রাখিল। মা কতো বকিতে বকিতে আগে চলিয়া গেলে আমরা সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় হাতিতে উঠিলাম। আমি গোলাপ ও আর দুইজন পুরুষ মানুষ একটিতে। আর চারিজন করিয়া আবার তিনটিতে। কিছুদূর গিয়া দেখি, এমন রাস্তা তো কখনো দেখি নাই! মোটে একহাত চওড়া রাস্তা আর দুইধারে বুক পর্যন্ত

বন। ধান গাছ কি অন্য গাছ বলিতে পারি না। আর বনে ক্রমেই যত রাত্রি হইতে লাগিল, ততই বৃষ্টি ব্যাপিয়া আসিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ও আরম্ভ হইল। হাতি তো যায় যায় করিতে লাগিল। শেষে সকলকে বেত বনের মধ্যে লইয়া ফেলিল, আবার তাহার উপর শিলাবৃষ্টি। হাতির উপর ছাউনি নাই। সেই বনে ঝড়, মেঘগর্জন, তাহার উপর শিলাবর্ষণ! আমি কেঁদেই অস্থির। গোলাপও কাঁদিতে লাগিল! শেষে হাতি আর এগোয় না। শুঁড় মাথার উপর তুলিয়া আগের পা বাড়াইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। আবার তখন মাহুত বলিল যে,—বাবু বাঘ বাহির হইয়াছে, তাই হাতি যাইতেছে না। মাহুত চারিজন হৈ হৈ করিয়া চেঁচাইতে লাগিল, আমি তো আড়ষ্ট। আমার হাতি চড়ার আনন্দ মাথায় উঠিল। ভয়ে কেঁদে কাঁপিতে লাগিলাম। পাছে হাতির উপর হইতে পড়িয়া যাই বলিয়া একজন পুরুষ মানুষ আমায় ধরিয়া রহিল। তাহার পর কতো কষ্টে প্রায় আধমরা হইয়া আমরা কোনরকমে বাসায় পৌঁছিলাম। জলে শীতে আমরা এমনি অসাড় হইয়া গিয়াছিলাম যে হাতি হইতে নামিবারও ক্ষমতা ছিল না। ছোটবাবু নিজে ধরিয়া নামাইয়া দিয়া আগুন করিয়া আমার সমস্ত গা সেঁকিতে লাগিলেন। মা তো বকিতে বকিতে কান্না জুড়িলেন। মায়ের বুলিই ছিল, হতচ্ছাড়া কোনো কথা শোনে না। সেদিন আমাদের অভিনয়ের কথা ছিল, কিন্তু দুর্যোগের জন্য ও আমাদের শারীরিক অবস্থার জন্য সেদিন অভিনয় বন্ধ রহিল।'

এই সময়কার আরও একটি দুর্ঘটনার কথা বিনোদিনী ব্যক্ত করেছে,—'একবার কৃষ্ণনগর রাজবাটিতে ঘোড়ায় চড়িয়া অভিনয় করিতে করিতে পড়িয়া যাওয়ায় বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। প্রমীলার পার্ট ঘোটকের উপরে বসিয়া করিতে হইত। সেখানে মাটির প্লাটফর্ম প্রস্তুত হইয়াছিল। যেমন আমি স্টেজ হইতে বাহিরে আসিব, অমনি মাটির ধাপ ভাঙিয়া ঘোড়া হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। আমিও ঘোড়ার উপর হইতে প্রায় দুই হাত দূরে পতিত হইয়া অতিশয় আঘাত পাইলাম। উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না। তখন আমায় অভিনয়ের অনেকখানি বাকি আছে। কী হইবে! চারুবাবু আমায় ঔষধ সেবন করাইয়া বেশ করিয়া আমার হাঁটু হইতে পেট পর্যন্ত ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। ছোটবাবু মাথায় কত স্নেহ করিয়া বলিলেন,—লক্ষ্মীটি, আজিকার কাজটি কষ্ট করিয়া উদ্ধার করিয়া দাও!

তাঁহার স্নেহময় সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্যে আমার বেদনা অর্ধেক দূর হইল। কোনরূপে কার্য সম্পন্ন করিয়া পরদিন কলিকাতা ফিরিলাম। ইহার পর আমি এক মাস শয্যাশায়িনী ছিলাম।'

যাই হোক, ১৮৭৭ সালে 'চতুর্দশবর্ষীয়া'-বিনোদিনী বেঙ্গলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'র 'মনোরমা' ছাড়া 'কপালকুণ্ডলা'র নামভূমিকায় অভিনয় করতো। আর করতো 'দুর্গেশনন্দিনী'তে 'আয়েষা।' কখনো কখনো 'আয়েষা'র সঙ্গে 'তিলোত্তমা', এমন কী 'আসমানী'ও তাকে করতে হয়েছে, কিন্তু মূল পার্ট ছিল 'আয়েষা'। শোনা যায়, বিনোদিনীর আয়েষা আর হরি বোষ্টমের ওসমান অভিনয়ে একেবারে সমান তালে, তখনকার ভাষায়, 'জ্বলে উঠতো'। মনে রাখতে হবে, এই তিনটি নাট্যরূপই বিহারীবাবুর। পরে অন্য থিয়েটারে গিরিশবাবুর দেওয়া এই সব কাহিনীর নাট্যরূপেও বিনোদিনী অভিনয় করেছিল।

'কপালকুণ্ডলা'র নাম ভূমিকায় ছিল বিনোদিনী, মতিবিবি—গোলাপসুন্দরী, বিহারীবাবু কাপালিক, আর নায়ক, অর্থাৎ 'নবকুমার'-এর অংশে ছিলেন হরিবোষ্টম। এইসময় ইংরেজী পত্র-পত্রিকাগুলি বিনোদিনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে তাকে 'সায়োনারা', ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ স্টেজ' প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করতো।

বেঙ্গলে 'মৃণালিনী'তে বিনোদিনীর 'মনোরমা' দেখে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। 'কপালকুণ্ডলা'র নামভূমিকাতেও তার অভিনয় বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করে। বিনোদিনী নিজে এই 'কপালকুণ্ডলা'-সম্পর্কে বলতে গিয়ে বিহারীবাবুর খুব প্রশংসা করেছে। বলেছে, কাপালিক সেজে বিহারী চাটুজ্যেমশাই যখন স্টেজে দাঁড়াতেন, তখন তাঁকে দেখতে কী ভয়ানক হতো! তখন কপালকুণ্ডলা সাজতাম আমি আর মতিবিবি সাজতেন গোলাপ। কাপালিকের সামনে এসে যখন দাঁড়াতাম, ভয়ে আমার বুকটা ধড়াস ধড়াস করে উঠতো!

॥ ২ ॥

বেঙ্গল থিয়েটারে 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয় হচ্ছিল সেদিন। বনবালা কপালকুণ্ডলা সপ্তগ্রামে নবকুমারের গৃহিনী হয়ে এসেছে। তার ননদ শ্যামাসুন্দরী তাকে গানের ছলে বলছে,—

বাঁধাবো চুলের রাশ, পরাবো চিকন বাস, খোঁপায় দোলাবো তোর ফুল।
কপালে সীঁথির ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার, কানে তোর দেবো জোড়া দুল।

কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভরে পান গুয়া, রাঙামুখ রাঙা হবে রাগে,
সোনার পুতুলি ছেলে, কোলে তোর দেবো ফেলে, দেখি ভালো লাগে—
কি না লাগে ॥

কপালকুণ্ডলার নাম এখন মৃন্ময়ী। সে বললে—বেশ। বুঝলাম। পরশপাথর যেন ছুঁয়েছি, সোনা হলাম। চুল বাঁধলাম, ভালো কাপড় পরলাম, খোঁপায় ফুল দিলাম, কাঁকালে চন্দ্রহার পরলাম, কানে দুল দুললো, চন্দন, কুঙ্কুম, চুয়া, গুয়া, সোনার পুতুলি পর্যন্ত হলো। মনে করো সকলই। তা হলেই বা কি সুখ?

শ্যামাসুন্দরী প্রশ্ন করলো—বলো দেখি ফুলটি ফুটলে কি সুখ?

মৃন্ময়ী বা কপালকুণ্ডলার উত্তর,—লোকের দেখে সুখ, ফুলের কী?

তোমার সুখ কী?

কপালকুণ্ডলা বললে,—বলতে পারি না। বোধ হয়, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াতে পারলে আমার সুখ হতো! শেষের দুটি সংলাপ বলার সময় বিনোদিনীর চোখ-মুখ-গলার স্বর অন্যরকম হয়ে যেতো! 'বনে বনে বেড়ানোর সুখ' সে যেন মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করে মুহূর্তে উদাস হয়ে যেতো।

সেদিন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অভিনয় দেখছিলেন। প্রথম সারির কেন্দ্রে বসেছিলেন এক ধনবান ও প্রতিষ্ঠাবান তরুণ ব্যক্তি, ধরা যাক, ওঁর নাম কুমার বাহাদুর। আর একটু কোনার দিকে বসেছিলেন আরও এক সৌখিন, ধনী ব্যক্তি, ইনিও বয়সে তরুণ, হাতে একটা লাল গোলাপ। দুজনে তন্ময় হয়ে বিনোদিনীর অভিনয় দেখছিলেন। তবে দুজনের দৃষ্টি দুইরকম। কুমার বাহাদুরের দৃষ্টিতে লালসা, আর অপর ব্যক্তির চোখে স্নিগ্ধতা, সাধারণের মধ্যে ইনি 'রাঙাবাবু' বলে আখ্যাত ছিলেন।

অন্যদিকে আরও দুজন পাশাপাশি বসে অভিনয় দেখছিলেন। তাঁরা গিরিশচন্দ্র ও জমিদার কেদার চৌধুরী। আর একটি দৃশ্য ছিল। তাতে বিনোদিনী ছিল, আর ছিলেন গোলাপসুন্দরী মতিবিবির ভূমিকায়। মতিবিবির পূর্ব নাম ছিল পদ্মাবতী। কৈশোরে নবকুমারের সঙ্গেই তার বিয়ে হয়েছিল। পদ্মাবতীর যখন তেরো বছর বয়স, তখন পিতার সঙ্গে উড়িষ্যায় পুরুষোত্তম বা জগন্নাথ দর্শনে গিয়েছিল। উড়িষ্যায় মোগল-পাঠানে যুদ্ধ হচ্ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে পাঠানদের কবলে পড়ে পদ্মাবতীর পিতা সপরিবারে মুসলমান ধর্মগ্রহণ করতে বাধ্য হন।

ক্রমে নিজের বুদ্ধি ও যোগ্যতার বলে মোগল দরবারে তিনি এক ওমরাহ হন। ওমরাহের কন্যা হিসাবে পদ্মাবতীর নাম হয় মতিবিবি। নবকুমার যখন নির্জন বনপ্রান্তে মা-কালীর পূজারী অধিকারী মহাশয়ের চেষ্টায় কপালকুণ্ডলার সংগে বিবাহিত হয়ে নিজের দেশে ফিরছিলেন, তখনই পথের প্রান্তে এক চটির কাছে মতিবিবির সংগে তার সাক্ষাৎ হয়। মতিবিবি স্বামীকে চিনতে পারেন, কিন্তু নবকুমার পারেন না। মতিবিবি আগ্রার বিরাট বৈভব ও সম্ভাবনা ত্যাগ করে স্বামীর সন্ধানে সপ্তগ্রামে এলেন, নবকুমার তার পরিচয় জানলেন, কিন্তু স্ত্রী বলে 'যবনী'কে স্বীকার করতে রাজী হলেন না। মতিবিবির জেদ তখন আরও বেড়ে গেল। সে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার মধ্যে বিচ্ছেদ আনবার জন্য পুরুষবেশে বনের মধ্যে রাত্রে দেখা করলো কপালকুণ্ডলার সংগে। ওদিকে কাপালিকও এসে হাজির দুখানি ভাঙা হাত নিয়ে। সে নবকুমারকে ঐ দৃশ্য দেখায় ও উত্তেজিত করে। তাকে 'কারণ' বা মদ্য পান করিয়ে তার মধ্যেকার পশুকে জাগিয়ে তোলে। বলে, আমার বাহু ভগ্ন, বাহুতে জোর নেই, তাই তোমাকেই বলি দিতে হবে ঐ অবিশ্বাসিনী কপালকুণ্ডলাকে।

ওদিকে কপালকুণ্ডলাকে আত্মপরিচয় দান করেছিল মতিবিবি। তারপর বললে—তোমাকে বধ করতে চায় কাপালিক। কিন্তু আমি তোমার প্রাণদান করছি। তুমিও আমার জন্য কিছু করো।

— কী করবো ?

মতিবিবি বললো,—আমারও প্রাণদান করো --স্বামী ত্যাগ করো।

—কোথায় যাবো ?

—বিদেশে, বহুদূরে ! তোমাকে অট্টালিকা দেবো—সম্পত্তি দেবো—দাসদাসী দেবো—রাণীর মতো থাকবে।

কপালকুণ্ডলা ম্লান হেসে বললে—কোনো প্রয়োজন নেই। তবে আমি তোমার সুখের পথও রোধ করবো না—আমি বনচারী ছিলাম—বনচারীই থাকবো—আমার মুক্তি সেইখানে !

তারপরে এলো অন্তিম দৃশ্য, যেখানে সুরামত্ত নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে বলি দেবার পূর্বমুহূর্তে কাপালিকের নির্দেশে নদীতে স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছে। কপালকুণ্ডলা মৃত্যুভয়ে কম্পিত নয়, বরং সে দেখলো, নবকুমারের হাত কাঁপছে ! জিজ্ঞাসা করলো,—ভয় পাচ্ছো ?

—ভয়ে মৃণ্ময়ী ? না ! তা নয়।

—তবে কাঁপছো কেন ?

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'এই প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা যে স্বরে করিলেন, তাহা কেবল রমণীকণ্ঠেই সম্ভবে। যখন রমণী পর দুঃখে গলিয়া যায়, কেবল তখনই রমণীকণ্ঠে সে স্বর সম্ভবে।'

নবকুমার বললো—ভয়ে নয়। কাঁদতে পারছি না, এই রাগে কাঁপছি।

—কাঁদবে কেন ? ['আবার সেই কণ্ঠ !']

—কাঁদবো কেন ? তুমি কি জানবে মৃন্ময়ী ! তুমি ত কখনো রূপ দেখে উন্মত্ত হও নি, তুমি ত কখনো আপনার হৃদ্‌পিণ্ড আপনি উপড়ে শ্মশানে ফেলতে আসো নি !

বলতে বলতে নবকুমার ওঁর পায়ের ওপর পড়লো, মৃন্ময়ী—কপালকুণ্ডলা—আমাকে রক্ষা করো। এই তোমার পায়ে লুটোচ্ছি,—একবার বলো যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বলো,—আমি তোমাকে বুকে তুলে ঘরে ফিরে যাই !

—তুমি তো জিজ্ঞাসা করো নি ! আজ যাকে দেখেছো, সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নই ! কিন্তু আর আমি ঘরে ফিরবো না—ভবানীর পায়ে দেহ বিসর্জন দিতে এসেছি—নিশ্চয়ই তা করবো। তুমি ঘরে যাও। আমি মরবো—আমার জন্য কেঁদো না !

—না—মৃন্ময়ী—না !—বলে নবকুমার ওকে দু-হাতে প্রসারিত করে বুকে টেনে নিতে চাইলো, কিন্তু পারলো না। কপালকুণ্ডলা চলে গেল। এক বিরাট ঢেউ এসে যেখানে কপালকুণ্ডলা দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানকার মাটির নিচে এসে প্রবল ধাক্কা দিলো, সেই 'মৃত্তিকাখণ্ড' নিয়ে কপালকুণ্ডলা অতল জলে মুহূর্তে তলিয়ে গেল।

গিরিশচন্দ্র লিখে গেছেন, 'কপালকুণ্ডলার চরিত্র এই যে, বাল্যাবধি স্নেহপালিত না হওয়ায় নবকুমারের বহু যত্নেও হৃদয়ে প্রেম প্রস্ফুটিত হয় নাই। অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় সে গৃহকার্য করিত, কিন্তু যখন সে তাহার ননদিনীর স্বামী বশ করিবার ঔষধের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিল, তখন পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী হইয়া যায়। কিন্তু গৃহবদ্ধা কপালকুণ্ডলার অংশ অভিনয়কারিণী বিনোদিনী বনপ্রবেশ মাত্রেই পূর্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া বন্য-কপালকুণ্ডলা হইয়া যাইত। এই পরিবর্তন বিনোদিনীর অভিনয়ে অতি সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইত।

|| ২ ||

কিন্তু আমরা সেদিনকার অভিনয়-রজনীতে ফিরে যাই। বিনোদিনীর সাজঘরের সামনেকার চলাচলের যে পথ বা ফাঁকা জায়গা রয়েছে, সেই পথে থিয়েটারের এক দাসী সুদৃশ্য একটি টুকরিতে করে বিরাট এক ফুলের তোড়া নিয়ে ঢুকলো। বিনোদিনী তখনো কপালকুণ্ডলার রূপসজ্জায়। সেই আলুলায়িত কুন্তলা বনবালিকা। বিনোদিনীর বয়স তখন চৌদ্দ বছর মাত্র। সে অতো বড়ো ফুলের টুকরি দেখে অবাক হলো, বললে,—কে পাঠালো রে ?

তখনকার দিনে ঐ ধরনের তোড়া-টোড়ার সঙ্গে কার্ড বাঁধা থাকতো উপহার যিনি দিচ্ছেন, তাঁর নাম শুধু। দাসী সেই কার্ডটি দেখালো, বললো,—কে আবার ! সেই কুমার বাহাদুর !

—কুমার বাহাদুর ! আজও পাঠিয়েছেন !

—রোজই তো পাঠাচ্ছেন দিদি !

এই সময়ে আরও একজন দাসী ঢুকলো। তার হাতে টুকরি নয়, এক বিরাট রক্তলাল গোলাপ ফুলের তোড়া, তার সঙ্গে যথারীতি কার্ড বাঁধা। সে বললে,—ও দিদি, তোমার ঘর এবার ফুলে ফুলে ভরে যাবে !

—এটা আবার কে পাঠালো ?

বিনোদিনী কার্ডটা পড়ে দেখলো,— রাঙাবাবু ! রাঙাবাবু আবার কে !

ঐ দাসীটি বললো,—ক'দিন ধরে দেখছি। বসে বসে একমনে তোমার থিয়েটার দেখছেন !

বিনোদিনী কার্ডটা ভালো করে পড়ে দেখতে লাগলো।

এই সময় বেঙ্গলের মালিক শরৎচন্দ্র ঘোষ বা ছোটবাবুর ঘরে তাঁর সামনে এসে বসে আছেন গিরিশবাবু আর কেদার চৌধুরী। তাঁদের মধ্যে কিছু কথাবার্তা ইতিমধ্যেই হয়ে থাকবে, তারই জের টেনে শরৎবাবু চেঁচিয়ে বললেন ওরে, কে আছিস ? বিনোদকে একবার ডেকে দে তো ?

ভিতরকার দরজার পর্দা সরিয়ে একটি চাকরের মুখ দেখা গেল, সে বললে দিচ্ছি আজ্ঞে।

সে চলে গেল। বিনোদিনীর সাজঘরের সামনে তখন আনমনে পায়চারী করছিল হরিদাস বা হরিবোষ্টম। তখনো সে নবকুমারের রূপসজ্জায়, মেক আপ তোলে নি। সে তাকিয়ে দেখলো চাকরটা মালিকের ঘর থেকে বেরিয়ে

বিনোদিনীর ঘরে ঢুকলো, আর পর মুহূর্তেই বেরিয়ে এলো। বিনোদিনী তখনো আলুলায়িতকুন্তলা। সে চলে গেল মালিকের ঘরে, চাকরটা চলে গেল অন্যদিকে।

বিনোদিনীকে পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করতে দেখেই শরৎবাবু বললেন,—আয় বিন্দে, আয়। এই দেখ, কে এসেছেন তোর সঙ্গে দেখা করতে।

তারপরে গিরিশবাবুকে দেখিয়ে বললেন,—বিখ্যাত গিরিশবাবু- গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। গিরিশবাবু সস্নেহে বললেন, সেই ছোট্ট মেয়েটি !! যে ভুবন নিয়োগীর গঙ্গাধারের বাড়িতে রিহাস্যাল দিতে যেতো !!

বিনোদিনী বললে, আপনার মনে আছে !

—থাকবে না ! তখুনি সবাইকে বলেছিলাম, দেখো ও অনেকদূর উঠবে !

শরৎবাবু এবার কেদার বাবুকে দেখান, বলেন, আর, উনি হচ্ছেন কেদার চৌধুরী মশাই, জমিদার।

বিনোদিনী সরে এসে কেদারবাবুকে প্রণাম করে। কেদারবাবু বলেন, বেঁচে থাকো। আগে দেখে গেছি তোমার 'মনোরমা', আজ দেখলাম 'কপালকুণ্ডলা' ! খুব ভালো লাগলো।

শরৎবাবু বললেন, কেদারবাবু ওর হাতেখড়ি অবশ্য আমাদের বেঙ্গল থিয়েটারে নয়।

কেদারবাবু বললেন, বোধহয় গ্রেট ন্যাশানালে। তাই না ?

বিনোদিনী তখন শরৎবাবুকে প্রণাম করছিল। তাকে আশীর্বাদ করার পর তিনি বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। ওর বয়স তখন মাত্র এগারো বছর। 'শত্রু সংহার'-এ ছোট্ট ভূমিকা, দ্রৌপদীর সখী।

—মনে আছে ?

মুখ টিপে একটু হাসলো বিনোদিনী, বললো কথা তো একটুখানি। মধ্যম পাণ্ডব ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করে সেই রক্তমাখা হাতে অভিমানিনী দ্রৌপদীর বেণী বাঁধতে আসছেন, এই খবরটি আমাকে দিতে হবে দ্রৌপদীকে। স্টেজে বেরুবার আগে বুকের ভিতর সে কী কাঁপুনি ! ধর্মদাসবাবু আমাকে ঠেলে স্টেজে ঢুকিয়ে দিলেন। আমি অমনি দ্রৌপদীকে প্রণাম করে, হাত জোড় করে, যেমনটি ওঁরা শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই আমার কথাগুলো বলে, কোনো রকমে কাজ সেরে পিছনে হেঁটে ভিতরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম !

বলার মধ্যে অদ্ভুত একটা সারল্য ছিল। সে সারল্যে মুগ্ধ হয়ে গিরিশবাবু বললেন, তারপর !

—ধর্মদাসবাবু পিঠ চাপড়ে বললেন, খুব ভালো হয়েছে !

কেদারবাবু বললেন,—একবার তো গ্রেট ন্যাশানালের সঙ্গে সারা উত্তর ভারতও ঘুরে এসেছো, তাই না ?

—হঁ্যা।

—নীলদর্পণও তো তখন করেছিলে, না ?

—হঁ্যা।

—কী করতে নীলদর্পণে ?

—সরলতা।

ওর সাজঘরের সামনে হরিদাস তখনো পায়চারী করছিল অসহিষ্ণু ভাবে। একটু পরে সে দেখলো মালিকের ঘর থেকে বেরিয়ে বিনোদিনী তার সাজঘরের দিকে আসছে। কাছে আসতেই সে বলে উঠলো,—বিনোদ, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

বিনোদিনী একটু অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকালো, বললো,—সেজন্যই বুঝি দাঁড়িয়ে আছেন হরিদা ?

—হঁ্যা।

—কী কথা ?

—কাছে এসো। বলছি।

বিনোদিনী ওর কাছে গেল। ঠিক সেই সময় তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন মালিক শরৎচন্দ্র ঘোষ। তিনি অদূর থেকে ওদের দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। হরিদাস, আচমকা, কী যেন বলতে বলতে হঠাৎ জড়িয়ে ধরলো বিনোদিনীকে। বিনোদিনী 'ছিঃ' বলে এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করে তার ঘরে ঢুকে গেল। হরিদাস খানিকটা হতভম্ব। তার ওপর হঠাৎই শরৎবাবুকে দেখতে পেয়ে লজ্জায় যেন মরে গেল। শরৎবাবু ওর কাছে এসে নিচুগলায় বলতে লাগলেন,—হরিদাস! ছিঃ! মনে রেখো ওরা বারনারী হতে পারে, কিন্তু নাট্যশালা ওদের কাছে দেবতার মন্দির! এখানে ওরা কোনো বেলেল্লাপনা সহ্য করতে পারে না!

বিনোদিনী তার সাজঘরে ঢুকে টেবিলে মাথা রেখে নীরবে চোখের জল ফেলছিল। এতোদিন ধরে হরিদার সঙ্গে সে অভিনয় করছে, কখনো তার এরকম মনোভাব দেখে নি! মানুষটি সত্যিই ভালো! আজ 'নবকুমার'-এর ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে হঠাৎ কী হলো অমন ভালো মানুষটার! ছিঃ! তার বারাঙ্গনাকুলে জন্মই কি এর কারণ ?

ওর ঘরে ঢুকলেন ছোটবাবু অর্থাৎ শরৎচন্দ্র ঘোষ। অমন করে টেবিলে মাথা রেখে সে বসে আছে লক্ষ্য করে সস্নেহে ডাকলেন, বিনোদ!

বিনোদিনী মুখ তুললো। অশ্রুসিক্ত সেই মুখখানার দিকে তাকাতে

পারলেন না শরৎবাবু। মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, গিরিশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে কেদারবাবু এসেছেন কেন জানো? নতুন থিয়েটার খুলছেন ওঁরা। সেই থিয়েটারে তোমাকে নিতে।

বিনোদিনী কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো, বললো,—আমি যাবো নিশ্চয় যাবো! আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন!

শরৎবাবু ওর মুখের দিকে তাকালেন। এই ছোট্ট মেয়েটিকে বরাবর স্নেহ করে এসেছেন তিনি। তাই বলতে লাগলেন, কতো নাটকই তো এখানে করলি! মৃণালিনীতে তোর সেই কথা, 'পুকুরে হাঁস দেখে আসি গে' কখনো ভুলবো!

বিনোদিনী ডুকরে উঠে শরৎবাবুর বুকে আছড়ে পড়ে। শরৎবাবুরও গলা ধরে আসে, তিনি বলেন—ছাড়তে কি ইচ্ছে করে রে? তবু বলবো, তুই যা! গিরিশবাবু বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে নাট্যমঞ্চে আসছেন নিজেই এবার 'লেসি' হয়ে। কেদার চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে খুলছেন 'ন্যাশানাল থিয়েটার'। সেখানে তুই অনেক সুযোগ পাবি!

বিনোদিনী তখনো কাঁদছিল। শরৎবাবু বলতে লাগলেন, আমি জানি রে! আমাদের এই বেঙ্গল থিয়েটার অনেক যত্নে গড়া,—একে ছেড়ে যেতে তোর খুব কষ্ট হবে,—কিন্তু তবু বলছি, যা! বড়ো নোংরা হয়ে যাচ্ছে সব! মন্দির আর মন্দির থাকছে না!

বিনোদিনী মুখ তুললো, ওঁর চোখের দিকে তাকালো, তারপরে নিচু হয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিতে লাগলো। উনি ওর মাথায় হাত রাখলেন। ওঁরও চোখ সজল হয়ে উঠতে লাগলো। শরৎবাবু ওকে নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসতেন। বিনোদিনী লিখেছে,—'বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়কালে আমি একরূপ সন্তোষে কাটাইয়াছিলাম। কেন না তখন বেশি উচ্চ আশা হয় নাই। যাহা পাইতাম, তাহাতেই সুখী হইতাম। যেটুকু উন্নতি করিতে পারিতাম, সেইটুকুই যথেষ্ট মনে করিতাম। বেশি আশাও ছিল না, অতৃপ্তিও ছিল না। সকলে বড়ো ভালবাসিত। হেসে খেলে নেচে কুঁদে দিন কাটাইতাম।'

বেঙ্গলে বিনোদিনীর 'আয়েষা', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মনোরমা'-র অভিনয় দেখবার মতো ছিল। মনে রাখতে হবে তার বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বছর ছিল। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখে গেছেন, 'বিনোদিনী মনোরমা সাজিয়াছিল। এমন মনোরমা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আর হয় নাই, আর হইবে বলিয়া সম্ভাবনা নাই।'

প্রখ্যাত নাট্যকার, নট ও নাট্যপরিচালক অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'—বইতে বেঙ্গল থিয়েটারের 'মৃণালিনী' সম্পর্কে মন্তব্য করে গেছেন, -'সে অভিনয়ের মধ্যে দুইটি চিত্র আজও আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।

এক,-মাধবাচার্য', আর যিনি মনোরমা সাজিতেন, তাঁহার 'আমি পুকুরে হাঁস দেখি গে গো' বলিয়া হাততালি দিয়া চলিয়া যাওয়া। পরে জানিয়াছিলাম, যিনি মাধবাচার্য সাজিয়াছিলেন, তিনি বেঙ্গল থিয়েটারের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। এবং যিনি মনোরমা সাজিয়াছিলেন, তিনি বঙ্গের অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী।'

পরবর্তী কালে গিরিশচন্দ্র নাট্যায়িত 'মৃণালিনী'-র 'মনোরমা' সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, 'মৃণালিনীতে আমি 'পশুপতি' সাজিতাম, বিনোদ 'মনোরমা' সাজিত।...আমি বিনোদের প্রতি অভিনয়েই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমবাবু বর্ণিত সেই বালিকা ও গম্ভীরা মূর্তি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। এই স্থিরগম্ভীরা তেজস্বিনী সহধর্মিনী, আবার পরক্ষণেই 'পশুপতি', তুমি কাঁদছো কেন ? বলিয়াই প্রেমবিহ্বলা বালিকা! হেমচন্দ্রের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে এই স্নেহশীলা ভগিনী, ভ্রাতার মনোবেদনায় সহানুভূতি করিতেছে, আর পরক্ষণেই পুকুরে হাঁস দেখিতে যাওয়ার অসাধারণ অভিনয় চতুর্য প্রদর্শন।'

যাইহোক, প্রসঙ্গকথায় ফিরে যাই। গ্রেট ন্যাশানালের লীজ নিয়ে গিরিশচন্দ্র নাম দিয়েছিলেন, 'ন্যাশানাল থিয়েটার।' এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটার, তখন সেখানেই ছিল এই থিয়েটার। তবে এখনকার মতো 'বাড়ি' নয়, সে বাড়ি ছিল আগাগোড়া কাঠের তৈরি। থিয়েটারটি তৈরি করেছিলেন ধর্মদাস সুর 'লুইস থিয়েটার'-এর কাঠামোর ছাঁচে। চালাঘরের মাথার ওপরকার মতো দো-চালা। ছাদ নয়। রাস্তার ফুটপাথ থেকে উঠতে হতো পাঁচ ধাপ সিঁড়ি পার হয়ে। দুপাশে দুটো স্তম্ভের মতো, তার পাশ দিয়ে রেলিং এগিয়ে গিয়ে দুটি বাহুর মতো দুই দিকে বাড়ির দেওয়াল ছুঁয়েছে। আবার তারই মাঝখান দিয়ে খাঁড়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলা পর্যন্ত। এর একটি ছবি কালীশবাবুর গ্রন্থে দেখা যায় (বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস)।

স্টেজের লবিতে এসে দাঁড়ালেন গিরিশবাবু। সঙ্গে তাঁর শ্যালক দ্বারকানাথ দেব আর কেদার চৌধুরী। গিরিশবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে যেন নতুন করে বাড়িটা দেখছিলেন, বললেন, হ্যাঁ—এই আমাদের ন্যাশানাল থিয়েটার। আমার নামে ভুবন নিয়োগী মশায়ের কাছ থেকে লীজ নিলুম বটে, কিন্তু আমার শ্যালক এই দ্বারকানাথ পিছনে না থাকলে সাহস করতুম না।

দ্বারকনাথের হাতে একটা খেরোবাঁধানো খাতা ছিল। সেটা আন্দোলিত করে তিনি বললেন—কী যে বলছেন জামাইবাবু !

গিরিশ বললেন,—ঠিকই বলছি ! কিন্তু সঙ্গে যে আপনাকে থাকতে হচ্ছে কেদার চৌধুরী মশায়—একজন ডিরেক্টর হিসেবে।

কেদারবাবু বলে উঠলেন,—আবার সেই আপনি-আজ্ঞে? চললুম তাহলে—আমার দ্বারা কিচ্ছু হবে না।

গিরিশবাবু হেসে বললেন,—আরে দাঁড়াও—দাঁড়াও—রাগ করো কেন? শুধু থিয়েটার চালানো নয়, তোমাকে যে অভিনয়ও করতে হবে। তুমি সাজবে মহাদেব।

—মহাদেব!

—হ্যাঁ।

বলে গিরিশচন্দ্র দ্বারকানাথের হাত থেকে খাতাখানা নিলেন, বললেন,—এই দ্যাখো, লিখেছি একখানা গীতিনাট্য: আগমনী। সামনে পুজো। মায়ের আগমনী দিয়েই আমাদের 'ন্যাশানাল'-এর যাত্রা শুরু হোক।

কেদারবাবু বললেন,—তাহলে চলুন স্টেজে। সবাই এসে বসে আছেন—আপনার প্রতীক্ষায়।

গিরিশবাবু চলতে চলতে বললেন,—হ্যাঁ হে—সেই ছেলেটি এসেছে তো? আমার বন্ধু গোপাল মিত্তিরের ছেলে—অমৃত মিত্তির! যেমন চেহারা—তেমনি মিষ্টি আর দরাজ গলা! সখের যাত্রার দলে 'অ্যাক্টো' করতো। শিখিয়ে—পড়িয়ে নিতে পারলে—!

কেদারবাবু বললেন,—তার ওপর আমরা পেয়েছি বিনোদিনীকে।

—ঠিক!

স্টেজে তখন বসে ছিলেন দলের ছোট বড়ো সবাই, স্ত্রী-পুরুষ আলাদা-আলাদা ভাবে। সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্ন্যাল, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), এবং নবাগত অমৃত মিত্র। মেয়েদের মধ্যে বিনোদিনী তো ছিলই, তাছাড়া ছিলেন কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি ও আরও অনেকে।

গিরিশবাবু বসলেন। আগমনী ক্ষুদ্র একটি গীতি-নাটিকা মাত্র। কিন্তু এটিই তার প্রথম নাট্য রচনায় প্রয়াস। রচয়িতা হিসাবে নিজের নাম দেননি। ছদ্মনাম দিয়েছিলেন, মুকুটাচরণ মিত্র। গিরিশবাবু এর আগে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন অভিনেতা, নাট্যশিক্ষক, কবি ও গীতিকার হিসাবে। তাঁর প্রথম নাট্য-রচনা বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র নাট্যরূপ। এই নাট্যরূপ সম্পর্কে দেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁর 'গিরিশচন্দ্র রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন: '১৮৭৩ সালের ১০ই মে তারিখে, শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের নাট্য মন্দিরে 'কপালকুণ্ডলা' ন্যাশানাল থিয়েটার কর্তৃক অভিনীত হয়। কিন্তু অভিনয়ের পূর্বে 'সাট' অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যায় না। অভিনয়-শিল্পীরা মঞ্চে অবতরণ করার জন্য সাজপোষাক পরে ও মেক-আপ নিয়ে প্রস্তুত; অথচ নাটকের পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলেই বিব্রত। গিরিশচন্দ্র

চিন্তিত। তাঁর প্রথম প্রয়াস বুঝি ব্যর্থ হয়ে যায়। শেষে, রাজবাড়ির পাঠাগার থেকে 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস আনিয়ে গিরিশচন্দ্র মুখে মুখে সংলাপ রচনা করে, শিল্পীদের প্রম্‌ট্‌ করতে লাগলেন। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন গিরিশচন্দ্র। তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য সেদিন কোনো রকমে 'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয় হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর নাট্য-রচনার প্রথম পাণ্ডুলিপিটি চিরতরে কালগর্ভে নিমজ্জিত হলো।'

পরে 'গ্রেট ন্যাশান্যাল'-এর জন্য তিনি মৃণালিনীর নাট্যরূপও দিয়েছিলেন, তার অভিনয় হয়েছিল ১৮৭৪ এর ১৪ই ফ্রেব্রুয়ারি। পশুপতি—গিরিশবাবু, হৃষিকেশ-অর্ধেন্দুশেখর, হেমচন্দ্র-নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিগ্বিজয়-অমৃতলাল বসু, ব্যোমকেশ—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, মাধবাচার্য—মতিলাল সুর, বখ্‌তিয়ার খিলজি—মহেন্দ্রলাল বসু। আর স্ত্রীভূমিকায়—ক্ষেত্র গাঙ্গুলী প্রভৃতি পুরুষরাই অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এরপরে ঐ 'গ্রেট্‌ ন্যাশানাল' এরই জন্য তিনি দ্বিতীয় বার কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। এতেও স্ত্রী ভূমিকায় নেমেছিলেন পুরুষরা। গিরিশবাবু নিজে কোন ভূমিকা নেন নি। বলা প্রয়োজন, এই পাণ্ডুলিপিও হারিয়ে যায়। অনেক পরে, অমর দত্ত-র ক্লাসিক থিয়েটারের জন্য তিনি তৃতীয়বার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন কপালকুণ্ডলার।

উক্ত 'গ্রেট ন্যাশানাল-এর 'কপালকুণ্ডলা'র পর গিরিশবাবুর রঙ্গালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না দেড় বছরের ওপর। স্ত্রীর প্রলম্বিত অসুস্থতা, বিবিধ পারিবারিক বিপর্যয়, মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদিই এর কারণ। ১৮৭৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর তাঁর স্ত্রী প্রমোদিনী মারা যান। তিনি ফ্রাইবারজার কোম্পানীর বুক কিপারের চাকরি করতেন তখন। আর সেই সূত্রে তাঁকে প্রায়ই ঘুরতে যেতে হতো। তাঁর ছেলেমেয়েরা মানুষ হচ্ছিল তাঁর দিদি কৃষ্ণকিশোরীর কাছে। এই সময় অবসর মতো তিনি নিবিড়ভাবে ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেছেন। তারপরে আমরা তাঁকে দেখছি মঞ্চজগতে ফিরে আসতে ঐ ভুবনবাবুর 'গ্রেট ন্যাশানাল'-এর লীজ নিয়ে ওর নতুন নামকরণ করে, প্রথম মৌলিক রচনা 'আগমনী' নিয়ে।

'সেদিন নিজের 'ন্যাশানাল থিয়েটার'-এর জন্য 'আগমনী'র ভূমিকা-বণ্টন করলেন এই রকম : গৌরী—বিনোদিনী, মেনকা—কাদম্বিনী, মহাদেব—কেদার চৌধুরী, গিরিরাজ—রামতারণ সান্যাল। এই নাটকের গানগুলির সুরও দিয়েছিলেন রামতারণবাবু। অভিনয়ের তারিখ : ১৮৭৭ এর ৬ই অক্টোবর। [কালীশবাবুর গ্রন্থ-অনুসারে।]

সাবেকী দুর্গামূর্তি যেমন দেখা যায়, পরণে লাল বেনারসী—সোনার ফুল

বসানো, সেই শাড়ি পরলো বিনোদিনী, চোখের টান করলো মূর্তির মতো, আর মাথায় দিলো প্রতিমার মতো চওড়া জরির কাজ-করা মুকুট। কৈলাস থেকে এসে দাঁড়ালো মা মেনকার কাছে। মা মেনকা দুহাতে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে গেয়ে উঠলেন, (খৎ তালে গাওয়া হতো, সুর দিয়েছিলেন রামতারণবাবু : সাহানা) :

ওমা, কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই!
কতো লোকে কতো বলে, শুনে ভেবে মরে যাই!
মার প্রাণে কি ধৈর্য ধরে, জামাই নাকি ভিক্ষা করে?
এবার নিতে এলে বলবো হরে, উমা আমার ঘরে নাই!

গৌরী উত্তরে মাকে বলে :

তুমি তো মা ছিলে ভুলে, আমি পাগল নিয়ে সারা হই!
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা, জানে না মা আমা বই!
ভাং খেয়ে মা সদাই আছে, থাকতে হয় মা কাছে কাছে,
ভালমন্দ হয় গো পাছে, সদাই মনে ভাবি ওই!
দিতে হয় মা মুখে তুলে, নয়ত খেতে যায় গো ভুলে
ক্ষেপার দশা ভাবতে গেলে আমাতে আর আমি নই!
ভুলিয়ে যখন এলেম ছলে, ওমা ভেসে গেল নয়ন জলে,
একলা পাছে যায় গো চলে, আপন হারা এমন কই?

এর চারদিন পরে ওঁর দ্বিতীয় গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হলো,—অকাল বোধন। অকাল বোধনের আগমনীর কিছু গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। যেমন, মেনকার গান : কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্বশানবাসী। অসিত বরণা উমা, মুখে অট্ট অট্ট হাসি।

পরবর্তী প্রসঙ্গের অবতারণার আগে একটি কথা মনে হয়। 'আগমনী' বা 'অকালবোধন' দুটিই অতি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য। এগুলির অভিনয় করতে গেলে কতটুকু সময়ই বা লাগতে পারে? আমাদের মনে হয়, সঙ্গে বড়ো নাটক কিছু থাকতো। হয়ত একটি পুরো নাটকই হতো সঙ্গে। হয়ত সেটা 'মৃণালিনী।'

তা সে যাই হোক, 'অকাল বোধন' এর পরে একটি ঘটনা ঘটলো! গিরিশ বাবুর ভাই অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ছিলেন হাইকোর্টের উকিল। গিরিশবাবুর জীবনের শেষ দিককার নিত্য সহচর ও অনুলেখক (গিরিশবাবু মুখে মুখে বলে যেতেন, অন্য কেউ নাটক লিখে নিতেন। প্রথম দিকে অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় বা বেলবাবুর নাম পাওয়া যায়। আরও অনেকে এ কাজ করে গেছেন) অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গিরিশচন্দ্র বইতে লিখে গেছেন যে, তাঁর ভাই অতুলবাবু একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'মেজদাদা, তুমি দিনের বেলায় অফিসে

কাজ করো, রাত্রে থিয়েটারের বই লেখা, রিহার্সাল দেওয়া, অভিনয় করা—এই সব লইয়া ব্যস্ত থাকো। তুমি বিশ্বাসী ও সুযোগ্য-বোধে যাহাদের উপর টিকিট বিক্রয়, হিসাব রক্ষা, গার্ড দেওয়া এবং থিয়েটারের অন্যান্য বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার দিয়াছ, তাহারা যে বরাবর হুঁসিয়ার হইয়া কার্য করিবে, তাহারই বা প্রমাণ কী? ইহাদের দোষেই ভুবনমোহনবাবু নানাপ্রকারে ঋণগ্রস্ত হইয়া অবশেষে থিয়েটার ভাড়া দিতে বাধ্য হইলেন। ভুবনমোহনবাবুর পরিণাম দেখিয়া আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। হয় তুমি থিয়েটার ছাড়ো, নচেৎ এসো, আমরা পৃথক হই।

—তুমি কি মনে করো থিয়েটারের আয়-ব্যয় তত্ত্বাবধানের দিকে আমার দৃষ্টি নাই? আর যেরূপ বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে কি তোমার ধারণা, আমার লোকসান হইবে?

—থিয়েটারের আভ্যন্তর অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আমার বিশ্বাস, থিয়েটার করিয়া কেহই ঋণগ্রস্ত ভিন্ন লাভবান হইতে পারিবে না।

—তোমার যদি এইরূপ বিশ্বাসই হয়, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি তোমাকে বলিতেছি, থিয়েটারের সংস্রবে যতদিন থাকিব, আমি আর স্বত্বাধিকারী হইবার কখনই চেষ্টা করিব না।'

গিরিশচন্দ্র তাই করেছিলেন। থিয়েটারের লীজ দ্বারকানাথকে দিয়ে নিজে মালিকানা থেকে মুক্তি নিয়েছিলেন। সারাজীবন থিয়েটারের কর্মী হিসাবে থেকে গেছেন, মালিক হননি বা হবার চেষ্টা করেন নি!

গিরিশচন্দ্র এরপর মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' এর নাট্যরূপ দিয়ে ন্যাশানালে অভিনয় করান। এতে তাঁর ছিল দ্বৈত ভূমিকা 'রাম' ও 'মেঘনাদ।' প্রমীলা—বিনোদিনী, নৃমুণ্ডমালিনী ও প্রভাসা—ক্ষেত্রমণি, মন্দোদরী—কাদম্বিনী। লক্ষ্মণ—কেদার চৌধুরী, রাবণ—অমৃতলাল মিত্র, কার্তিক ও দূত—বেলবাবু (অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়)। মদন—রামতারণ সান্যাল, বিভীষণ ও মহাদেব—মতিলাল সুর প্রভৃতি।

প্রমীলারূপে বিনোদিনী গানে ও অভিনয়ে চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলতো। উদাহরণ হিসাবে প্রমোদ উদ্যানের দৃশ্যটির কথাই ধরা যাক, যেখানে প্রমীলা ও বাসন্তী কথা বলছে। মেঘনাদও ছিলেন উদ্যানে, কিন্তু অকস্মাৎ তিনি চলে গেছেন যুদ্ধের খবর শুনে, 'এখুনি ফিরে আসবো'—এই আশ্বাস দিয়ে। বহু সময় কেটে গেল। তিনি আসছেন না দেখে প্রমীলা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সখী বাসন্তীকে অবশেষে বললো—'চলো সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।'

বাসন্তী অবাক হয়ে বললে,—'কেমনে পশিবে লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগরসম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহারে!'

দৃপ্তভঙ্গিতে প্রমীলা বললেঃ কী কহিলি বাসন্তী? পর্বত-গৃহ ছাড়ি বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে, কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি? দানবনন্দিনী আমি, রক্ষ-কুলবধূ, রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী, আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে? পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজবলে! দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?

বলে, বাসন্তীকে সঙ্গে নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায় প্রমীলা।

• 'মেঘনাদ বধ' এর পরে গিরিশবাবু নাট্যরূপ দেন নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ'-এর। বিনোদিনী তার আত্মকথায় এই নাটকের সাফল্যের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছে। এর ভূমিকালিপিঃ ক্লাইভ-গিরিশচন্দ্র, সিরাজ-মহেন্দ্রলাল বসু, জগৎশেঠ ও ঘাতক—অমৃতলাল মিত্র, রাজবল্লভ—বেলবাবু, মোহনলাল-কেদার চৌধুরী, মীরণ রামতারণ সান্ন্যাল, রায়দুর্লভ ও উদাসীন-মতিলাল সুর। ইংল্যাণ্ডের রাজলক্ষ্মী—বিনোদিনী, রাণীভবাণী—কাদম্বিনী। এই নাটকের অভিনয়ের তারিখঃ ১৮৭৮ এর ৫ই জানুয়ারি। বিনোদিনীর বয়স তখন পনেরো মাত্র। এই সময় থিয়েটারের লীজ কেদার চৌধুরীকে দিয়ে দ্বারকানাথ দেব থিয়েটারের দায়িত্ব থেকে অবসৃত হন।

• আর একটি ক্ষুদ্র গীতিনাট্য লিখলেন গিরিশচন্দ্রঃ দোললীলা। তারপরে নাট্যরূপ দেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'-এর। অভিনয়ের তারিখঃ ১৮৭৮ এর ৯ই মার্চ। নগেন্দ্র—গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্র—রামতারণ সান্ন্যাল, শ্রীশ—মহেন্দ্রলাল বসু, সূর্যমুখী—কাদম্বিনী, কুন্দ নন্দিনী—বিনোদিনী, হীরা—নারায়ণী, কমলমণি—কমলা (সুকুমারী দত্ত বা গোলাপের বোন)।

এই সময় বেঙ্গল থিয়েটার আবার দুর্গেশনন্দিনী করতে থাকে। এমন কি, মাইকেল মধুসূদনের সন্তান-সন্ততির বেনিফিট নাইটউপলক্ষে 'দুর্গেশনন্দিনী'র জন্য বিনোদিনীকে ধার নিয়েছিলেন তাঁরা। একবার নয়, বেশ কয়েকবার। এ-কথা উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের বইতে উল্লেখিত আছে। এঁদের দেখাদেখি ন্যাশানালও 'দুর্গেশনন্দিনী'—ধরলেন ১৮৭৮ এর ২২শে জুন থেকে, এতে বিনোদিনী করতো দুটি ভূমিকা—আয়েষা ও তিলোত্তমা। যে দৃশ্যে আয়েষা ও তিলোত্তমার সাক্ষাৎ; সে দৃশ্যে তিলোত্তমার কথা থাকতো না, সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতো। সেজন্য ঐদৃশ্যে অন্য একজনকে নামানো হতো। অন্যান্য ভূমিকায়ঃ জগৎসিংহ—কেদার চৌধুরী (দ্বিতীয় রজনীর অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র), ওসমান—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (দ্বিতীয় রজনী থেকে, মহেন্দ্রলাল বসু)। কতলু খাঁ—মতিলাল সুর, রহিম শেখ—বেলবাবু, বিমলা-কাদম্বিনী, আশমানি—লক্ষ্মীমণি।

'দুর্গেশনন্দিনী'-তে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ তিলোত্তমার প্রতি আকৃষ্ট

হন, তিলোত্তমারও অবস্থা তাই। ঘটনাচক্রে কতলু খাঁ দুর্গ জয় করে গুরুতর আহত 'জগৎসিংহ'কে বন্দী করেন, তাঁর শুশ্রূষা করেন নবাবনন্দিনী আয়েষা। কতলু খাঁর সেনাপতি ওসমান যথার্থ বীর। তিনি আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীও বটেন। আয়েষা এক নিশুতি রাত্রে গোপনে কারাগারে গিয়ে দেখা করেন জগৎ সিংহের সঙ্গে। বলেন, জগৎসিংহ! আমার সঙ্গে বাহিরে এসো। অশ্ব প্রস্তুত। এখনি সেই অশ্ব নিয়ে তোমার শিবিরে ফিরে যাও।

জগৎসিংহ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, আয়েষা! তুমি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দেবে! না! আমি যাবো না!

—কেন!

—একথা প্রকাশ হয়ে পড়লে তোমার পিতা নবাবসাহেব তোমাকে শাস্তি দেবেন। তুমি আমার প্রাণ দিয়েছো, তুমি যাতে শাস্তি পাও, এমন কাজ আমি করতে পারি না!

একথা শুনে আয়েষার চোখে জল এসে পড়ে। তা দেখে আরও বিস্মিত হন জগৎ সিংহ, বলেন,—একী! তুমি কাঁদছো!

আয়েষা নিজেকে সামলাতে থাকেন। জগৎ সিংহ ওঁর কাছে এসে বলেন, আমাকে বলো আয়েষা, কেন তোমার চোখে জল! যদি আমার প্রাণ দিলে তার প্রতিকার হয়, তা আমি করবো!

—না রাজকুমার, আর আমি কাঁদবো না!

এই সময় কোনো প্রহরীর কাছ থেকে খবর পেয়ে ওসমান এসে কারাগারে ঢোকেন, তিনি বলে ওঠেন, উত্তম!

ওঁরা দুজনে চমকে তাকালেন। ওসমান বললেন, গভীর রাত্রে কারাগারে প্রবেশ করে বন্দীর সঙ্গে নিভৃত আলাপ! অতি উত্তম নবাবনন্দিনী আয়েষা!

আয়েষা বললেন,—উত্তম কি অধম, সে উত্তর তোমাকে দেবোনা, দেবো আমার পিতাকে, যখন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন।

ওসমান বললেন,—আর যদি আমি জিজ্ঞাসা করি?

আয়েষা ঘুরে দাঁড়ালেন, বললেন, ওসমান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো, তাহলে আমার উত্তর,—(জগৎসিংহকে দেখিয়ে)—এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!

এই দুর্গেশনন্দিনী অভিনয়ের সময়ে একবার গিরিশচন্দ্রের দুর্ঘটনা ঘটে। বিদ্যাদিগ্‌গজের খিচুড়ি খাওয়ার জন্য ফুটি গুলে খিচুড়ি করা হতো! সিন সিফ্‌টিংয়ের সময় অন্ধকারে এই ফুটিতে পা হড়কে গিয়ে গিরিশচন্দ্র পড়ে যান, বাঁ হাতের কবজি ভেঙে যায়। ফলে প্রায় তিন মাস তিনি শয্যাগত থাকেন, অভিনয় করতে পারেন না। ফলে বইয়েরও ক্ষতি হতে লাগলো। কেদার-

বাবুর পক্ষেও বেশিদিন থিয়েটার চালানো সম্ভবপর হলো না। ১৮৭৯ সালে তাঁর বদলে লেসী হলেন গোপীচাঁদ শেঠী বলে এক মাড়োয়ারী ধনী ব্যক্তি। নাট্যশালা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই প্রথম এলেন এক অবাঙালী ভদ্রলোক। ম্যানেজার হিসাবে তিনি নিয়ে এলেন 'নীলদর্পণ'-এর সেই রোগ-সাহেবের ভূমিকার অভিনেতা অবিনাশচন্দ্র করকে। এঁর সময়ে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত গীতিনাট্য কামিনীকুঞ্জ-এর মঞ্চস্থ হবার সংবাদ পাওয়া যায়। এতে 'রাধিকা' বেশে বিনোদিনী অবতীর্ণ হয়েছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু তারপর ?

এই ঘটনার আগে বেঙ্গল থিয়েটারে (১৮৭৮ এর ১৬ মার্চ) বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' মঞ্চস্থ হয়, তাতে শৈবলিনী ছিলেন সম্ভবত গোলাপসুন্দরী। চন্দ্রশেখর—বিহারীলাল, প্রতাপ—হরি বোষ্টম, ফষ্টার—শরৎচন্দ্র ঘোষ, দলনী. বনবিহারিনী (ভুনি)।

যাইহোক, ১৮৮০ সালের গোড়ার দিকে অবিনাশ কর দলবল নিয়ে নানান জায়গায় অভিনয় করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু কলকাতায় ন্যাশানাল-এর অবস্থা তখন কী ?

গিরিশবাবু তো হাত ভেঙে বিছানায় শুয়ে। বিনোদিনী এই সময়কার কথা বলতে গিয়ে গিরিশবাবু সম্পর্কে লিখে গেছেন,—'তাঁহার শিক্ষা দিবার প্রণালী বড়ো সুন্দর ছিল। তিনি প্রথমে পার্টগুলির ভাব বুঝাইয়া দিতেন। তাহার পর পার্ট মুখস্থ করিতে বলিতেন। তাহার পর অবসর মতো আমাদের বাটিতে বসিয়া অমৃত মিত্র· অমৃতবাবু (ভুনিবাবু) ও আরও অন্যান্য লোকে মিশিয়া বিবিধ বিলাতী অভিনেত্রীদের কথা ও বড়ো বড়ো বিলাতী কবি সেক্সপীয়র, মিলটন, বায়রন, পোপ প্রভৃতির কবিতার মর্ম গল্পচ্ছলে শুনাইয়া দিতেন। আবার কখনো তাঁহাদের পুস্তক লইয়া পড়িয়া বুঝাইতেন। নানাবিধ হাব-ভাবের কথা এক এক করিয়া শিখাইয়া দিতেন। তাঁহার এইরূপ যত্নে জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা অভিনয় শিখিতে লাগিলাম।…বিলাতী বড়ো বড়ো এক্টার ও এক্ট্রেস আসিলে তাহাদের অভিনয় দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইতাম।…অন্য কথা বা অন্য গল্প আমার ভালো লাগিত না। গিরিশবাবু মহাশয় যে-সকল বিলাতের বড়ো বড়ো অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের গল্প করিতেন, যে সকল বই পড়িয়া শুনাইতেন, আমার তাহাই ভালো লাগিত। মিসেস সিডনস্ থিয়েটারের কার্য পরিত্যাগ করিয়া দশ বৎসর বিবাহিত অবস্থায় অতিবাহিত করিবার পর পুনরায় যখম ষ্টেজে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁহার অভিনয়ে কোন সমালোচক কোন স্থানে কিরূপ দোষ ধরিয়াছিলেন, কোন অংশে তাঁহার উৎকর্ষ বা ত্রুটি হইয়াছিল ইত্যাদি তিনি পুস্তক হইতে পড়িয়া বুঝাইয়া দিতেন।'

॥ ৩ ॥

এইরকমই কোনো এক সময়কার কথা। বিনোদিনীদের বাড়ির প্রশস্ত বারান্দার প্রান্তে, কালো কাপড়-ঢাকা ময়না পাখীর খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে বিনোদিনীর মা পাখীকে পড়াচ্ছিলেন,—বলো বাবা, সীতা-রাম ! সী-তা-রা-ম ! বলো ?

এই সময় তাঁর পিছন দিক থেকে এলেন বিনোদিনীর দিদিমা, বললেন, —ওলো, তোর মেয়ের ঘরে তোর মেয়ের এক নাগর এসে বসে আছে !

মা অমনি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বললেন, কে মা ! গিরিশবাবু ?

দিদিমা বললেন, না লো, এ অন্য লোক। যা-না-দেখগে না ! একরাশ ফুল নিয়ে বসে আছে !

বিনোদিনীর মা তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে বিনোদিনীর ঘরের দিকে পা বাড়ান। দিদিমা খাঁচার কাছে এগিয়ে আসেন। তিনি আবার পাখীকে সীতারাম শেখান না, তিনি শেখান, রাধে কৃষ্ণ ! এই দুদিকের দুই শিক্ষায় পাখীর কিন্তু কিছু হয় না, সে যথারীতি নীরব। তবু শিক্ষয়িত্রীদের অধ্যবসায়ে ভাটা পড়ে না। দিদিমা শেখান,—বলো বাবা, রাধে-কৃষ্ণ-রাধে কৃষ্ণ !

বিনোদিনীর ঘরখানা ছিল তুলনায় বেশ বড়ো। বাড়িও এখন আর একতলা নেই, দোতলা হয়ে গেছে। তার ঘরে জাজিম পাতা, একটা সুন্দর আলমারী, টেবিল চেয়ার, টেবিলে কিছু বই আর খাতাপত্র। অন্য দিকে সুদৃশ্য একটি টেবিল-হারমনিয়াম, পালঙ্কের ওপর টান-টান করে বিছানা পাতা। তার কাছে ছোট একটা টেবিল, আয়না-বসানো, তার নিচে দেরাজ। সাজ-গোছ করবার সামগ্রী। দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণের একখানা পট শোভা পাচ্ছে। কাছাকাছি একটা ভালো চেয়ার, পাশে টিপয়।

এই চেয়ারে বসে আছেন আগন্তুক, সৌখীন মানুষ, হাতে হীরের আংটি আর সুদৃশ্য ছড়ি, পাশে তাঁরই আনা একটি বিরাট টকটকে লাল গোলাপগুচ্ছের তোড়া। আগন্তুক আর কেউ নয়, সেই রাঙাবাবু। বেঙ্গল থিয়েটারে একবার উনি নিজেই গিয়েছিলেন বিনোদিনীর সাজঘরে, এই রকম রক্তিম গোলাপগুচ্ছ নিয়ে। সেটি পেয়ে বিনোদিনী খুব খুশি হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সে-ই প্রথম সাক্ষাৎকার !

বিনোদিনীর মা ঘরে এসে ঢুকলেন, একটু চমকে গেলেন ওঁকে দেখে। বললেন —কে আপনি বাবা ! আপনাকে তো ঠিক—!

রাঙাবাবু বললেন, দেখেছেন—দেখেছেন। থিয়েটারে দেখেছেন। আমি বিনোদিনীর কোনো অভিনয়ই দেখতে বাকি রাখি না। কিন্তু কাল থিয়েটারে গিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না—তাই ভাবলাম বাড়িতে এসেই—

কথাটা শেষ না করে তিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, বললেন,—আপনি বরং বিনোদিনীকে ডেকে দিন। আমি এই ফুলগুলো—

মা ওঁর হাতের আংটির দিকে তাকিয়েছিলেন, মানুষটির যেমন রূপ, তেমনি বোধহয় বৈভব। বললেন, বুঝতে পারছি বাবা, আপনি খুব বড়োমানুষ। কিন্তু বিনোদ তো বাড়িতে নেই।

উনি বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—নেই !

—না। কাশী চলে গেছে।

—কাশী !

মা বললেন,—হ্যাঁ। থিয়েটার নেই তো, এখানে বসে কি করবে ? তাই গেছে একটু বেড়াতে !

—একা !

মা একটু হেসে বললেন,—এই দেখো ! 'একা' কখনো আমাদের মতো মেয়ে মানুষ যেতে পারে ?

—তাহলে কি থিয়েটারের দলের সঙ্গে—?

—না তাও নয়।

রাঙাবাবুর মুখখানা গম্ভীর হলো, বললে,—বুঝেছি। আচ্ছা, চলি।

তিনি চলে যাবার উদ্যোগ করতেই মা বলে উঠলেন,—সে কি বাবা, একটু বসবেন না ! একটু জল-টল !

রাঙাবাবু রওনা হয়েছিলেন, ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন,—না। আমাকে এখন ছুটতে হবে।

—কোথায় বাবা ?

—কাশী।

বলে তিনি হনহন করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেলেন। মা হতবাক। বাইরে থেকে দিদিমার গলা শোনা গেল—কী হলো লো ?

মা বললেন,—হলো ভালো ! এখন শুম্ভ-নিশুম্ভর যুদ্ধ না বেঁধে যায়।

কাশী। কাশীর গঙ্গা কাশীর আকর্ষণের অন্যতম বস্তু। চন্দ্রকলার মতো গঙ্গা বেষ্টন করে আছে কাশীকে। পাথর বাঁধানো ঘাটের সারি।

গঙ্গার বুকে একটা বজরাও ভাসছে দেখা যাচ্ছে। অহল্যাবাঈ-ঘাটের কিনারায় বসে এক সন্ন্যাসী তন্ময় হয়ে গাইছেন : দেবি সুরেশ্বরী ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবন-তারিণী তরল তরঙ্গে!
শঙ্করমৌলী-নিবাসিনি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে।

তাঁকে ঘিরে চার পাশে বসে ভক্তেরা, তারা শুনছে।

রানার নিচে, সিঁড়ির কাছে, স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন আমাদের রাঙাবাবু, হাতে ছড়ি, পরনে কোঁচানো ধুতি, গায়ে লক্ষ্ণৌর কাজ-করা পাঞ্জাবী। তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য—বজরা। তিনি জানেন, কারা ওখানে আছে।

প্রভাত কাল। ঘাটে স্নানার্থীদের বিরাম নেই, তবে খুব ভিড়ও এখন হয়ে ওঠে নি।

বজরার ভিতরে ছিলেন কুমার বাহাদুর, সঙ্গে বিনোদিনী। বজরার ভিতরটা সুসজ্জিত। পাটাতনের ওপর ফরাস পাতা, সিল্কের ওয়াড় পরানো তাকিয়া। পাশে মোরাদাবাদী মিনে-করা দুটি পানপাত্র ও একটি সুরাভাণ্ড শোভা পাচ্ছে। কুমারবাহাদুরও প্রচণ্ড শৌখিন ব্যক্তি, তিনি আজ পোষাক পরেছেন ছবিতে-দেখা ওমর খৈয়ামের। পারলে সাকীর পোষাক পরাতেন বিনোদিনীকে, কিন্তু সে রাজী হয় নি। তার পরনে বেনারসী হলেও ছিমছাম পোষাক, উগ্রতা নেই।

তখন ওদের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত। অন্যদিকে তাকাবার অবকাশ নেই। কুমার বাহাদুর ওকে ধীরে ধীরে বাহুবন্ধনে বেষ্টন করে ধরলেন, বিনোদিনীও আত্মবিস্মৃত! অধরে অল্প হাসি, নিজেকে একটু এলিয়ে দিলো। হঠাৎ সন্ন্যাসীর সেই গানের একটা অংশ কানে যেতেই আবেশ ভেঙে গেল :

পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবি গঙ্গে
খণ্ডিত গিরিবর মণ্ডিত ভঙ্গে!

বিনোদিনী নিজেকে মুক্ত করে জানালার দিকে সরে গেল। সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু রাঙাবাবু পড়েছে আড়ালে, নইলে তাকেও দেখতে পেতো সে। বজরা কিন্তু ঘাটের দিকেই চলছিল। কুমার বাহাদুর বিনোদিনীর কাছে সরে এসেছেন, একটা হাত ওর কাঁধে সপ্রেমে স্থাপিত করে, অন্য হাত জানালা দিয়ে নামিয়ে গঙ্গা স্পর্শ করে বললেন,—আজ তোমাকে ছুঁয়ে জাহ্নবী-গঙ্গাকে স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করছি, বিয়ে করবো একমাত্র তোমাকেই। আর কাউকে না!

বিনোদিনীর পক্ষে এ-সুখস্পর্শের আস্বাদ অভাবিত। সে মুখ ফিরিয়ে ওঁর চোখের দিকে তাকালো,—কী বললে।

—তুমিই হবে আমার ধর্মপত্নী! এ-কথার নড়চড় হবে না।

বিনোদিনীর চোখে এলো জল, তার গলার স্বরও কাঁপছে: এ পতিতকে উদ্ধার করবে!

বজরা তখন ঘাটের কিনারে এসে রাঙাবাবুকে ছাড়িয়ে ঘাটের একটা সুবিধামতো অংশ স্পর্শ করলো। ওরা কেউ দেখতে পেলো না রাঙাবাবুকে কিন্তু রাঙাবাবু শুনলেন কুমারবাহাদুরের কণ্ঠস্বর: উদ্ধার নয়—উদ্ধার নয়! মাথায় করে রাখবো! শিব যেমন করে রেখেছিলেন গঙ্গাকে!

ওরা ঘাটে নামবার উদ্যোগ করতে লাগলো, রাঙাবাবু তাড়াতাড়ি উঠে অন্য দিকে সরে গেলেন।

কলকাতায় বিনোদিনীদের বাড়িতে সেই বারান্দায় দিদিমা প্রাণপণে পাখী পড়াচ্ছেন: বলো বাবা, রাধে কৃষ্ণ—রাধে কৃষ্ণ!

একটা সেকেলে খাম আর খাম থেকে-বের-করা চিঠিখানা নিয়ে প্রায় ছুটতে এলেন বিনোদিনীর মা, বললেন,-ওমা—মা? এই দেখ! ভর দুপুর বেলায় পাখী পড়াচ্ছো! আর পড়াচ্ছোই যদি, তাহলে অন্য বুলি কেন? আমি পড়াবো এক বুলি, তুমি পড়াবে অন্য বুলি! এ-কেমনতর কথা?

দিদিমা বললেন, হয়েছে! এখন ভনিতে ছেড়ে আসল কথায় আয় দেখি! মা-মা করে এমন ছুটে এলি কেন?

—ছুটবো না! বিনির চিঠি এয়েছে যে! কাশী থেকে!

দিদিমা নিস্পৃহ গলায় বললেন,—অ!

তারপরেই আবার পাখী পড়াতে লাগলেন,—বলো বাবা—!

বিনোদিনীর মা ওঁকে দু-হাতে ধরে নিজের দিকে ফেরাতে ফেরাতে বললেন, আঃ! শোনোই না! বিরাট বাড়ি ভাড়া নিয়েছে—দাসদাসী—দেউড়িতে দারোয়ান—সে এক এলাহী কাণ্ড!

—ওলো, বড়লোকদের অমনিই কাণ্ড! যখন কাণ্ড ঘটায়, তখন এলাহী কাণ্ডই ঘটায়! কেন? বিনির ঐ ঘরখানা অমন দামী দামী আসবাব-পত্তরে মুড়ে দিয়েছে কে? কুমার বাহাদুরই তো! কিন্তু কী জানিস? ওদের ঐ দুদিনের নেশা! নেশা ফুরোলেই—

—ওগো, না গো—না! চিঠিতে মেয়ে কী লিখেছে জানো? কুমার বাহাদুর গঙ্গার জল ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে করেছে, ওকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না!

দিদিমা দারুণ অবাক হলেন, বললেন,—বলিস কী! হিঁদুর ছেলে হয়ে গঙ্গাজল ছুঁয়ে পিতিজ্ঞে করলো!

—তাইতো লিখেছে!

দুঃসহ আবেগে চোখে জল এলো দিদিমার, তিনি বললেন,—ওলো, এ আলো, না, আলেয়া! আমার যে বিশ্বাস হয় না।

কাশীর একটি সুরম্য গৃহ। তার দোতলার একটি ঘরে শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর একটা ফ্লাওয়ার-ভাসে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা এনে রাখতে দেখা যায় বিনোদিনীকে। বিনোদিনীর পোষাক-আশাকে বরাবরই একটা রুচি প্রকাশ পেতো, কখনো উগ্রতা দেখা যেতো না। এবারেও তাই। বুটিদার শাদা ঢাকাই শাড়ি পরেছে সে। সে ফুলটা রেখে আয়নায় তাকালো। আয়নায় ফুটে উঠলো সোফায় বসা কুমার বাহাদুরের মুখ। সেইদিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো বিনোদিনী, তারপরে গুণগুণ করে গেয়ে উঠলো,—

কাননে ধরে না হাসি / মধুর মিলনে মলয় পবনে / বসন্ত এসেছে আজি / পরাণ আকুলি দুলি দুলি দুলি / ফুলে ফুলে আজ করে কোলাকুলি / মত্ত ভ্রমর করে ঢলাঢলি / ফুলের সরম নাশি।

কুমার উঠে এসেছিলেন কাছে। ওকে দু-হাতের আলিঙ্গনে নিবিড় করে বেঁধে নিয়ে ওকে অবাক করে দিয়ে আবৃত্তি করে উঠলেন,—'এসো তবে প্রিয়ে / বিহরি এ-বনে তব সঙ্গে রসরঙ্গে / বিহরে আমোদে রসে যথা শুকসারী।'

বিনোদিনী অবাক হয়ে বললে,—একী! তুমি মেঘনাদের অ্যাকটিং করলে কী করে! একেবারে গিরিশবাবুর মতো!

কুমার বললেন,—রোজ রোজ তোমাদের অ্যাকটিং দেখতুম-শুনতুম, দুটো-একটা কথাও শিখবো না!

বিনোদিনী খুশি হয়ে ওর বুকে মাথা রেখে বলে,—তুমি চলো না কলকাতায়? থিয়েটার করবে?

হেসে উঠলেন কুমার। ওকে নিয়ে সোফার দিকে যেতে যেতে বললেন,—দারুণ বলেছো! একেবারে হৈ-হৈ-ব্যাপার—রৈ-রৈ কাণ্ড ঘটে যাবে!

—না গো, ঠাট্টা নয়, আমি সত্যি বলছি! তুমি ইচ্ছে করলে খুব ভালো—!

কুমার গম্ভীর হয়ে বললেন,—থাক আর বলতে হবে না! আচ্ছা, মেনী?

এই নাম ছিল ওঁর দেওয়া আদরের নাম। এই নামে সে যেন অবশ হয়ে যেতো। তাই ও-নাম শুনে সে অস্ফুট গলায় বলে উঠলো—আবার ঐ নাম!

কুমার ওর চিবুকে হাত ছুঁইয়ে বললো,—আমার যে এই নামেই ডাকতে ভালো লাগে!

—যাও!

বলে জানালার কাছে চলে গেল বিনোদিনী, বাগান-শিয়রী জানালাটা, যেখানে দাঁড়ালে নিচে, ফেরারী-করা বাগানটার অংশ দেখা যেতো। কুমার ওর খুব

কাছে এলেন, বললেন,—সত্যি বলো তো, থিয়েটার তোমাকে সব সময় হাতছানি দেয়, তাই না?

বিনোদিনী ঘুরে দাঁড়িয়ে ও'র চোখের দিকে তাকালো,—যদি দ্বন্দ্ব না থাকতো, খুব ভালো হতো!

—কীসের দ্বন্দ্ব!

—তুমি আর থিয়েটার। দুটিকেই যদি একসঙ্গে পেতুম!

কুমার বললেন,—কী করে পাবে? এতদিন ধরে রোজ কাগজ দেখছো তো? কোথায় গিরিশবাবুর নাম? শুধু একটা খবর—ভুবনমোহন নিয়োগী মশায়ের 'ন্যাশানাল থিয়েটার'-বাড়ি নীলাম হয়ে গেছে দেনার দায়ে। কিনে নিয়েছে এক মারোয়াড়ী ভদ্রলোক—প্রতাপ জহুরী।

—প্রতাপ জহুরী!

—হ্যাঁ।

খবরটা সত্যি। বাইশ হাজার টাকায় ও-থিয়েটার কিনে নিয়েছিলেন প্রতাপ জহুরী। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী। তিনি বুঝলেন, এ-ব্যবসা ঠিকভাবে চালিয়ে যেতে হলে এ-লাইনের কোনো দক্ষ মানুষের প্রয়োজন। ভেবে-চিন্তে যিনি গেলেন বাগবাজারে গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে। গিরিশবাবু এই সময় পার্কার কোম্পানীর অফিসে চাকরি করতেন দেড়শ' টাকা বেতনে।

অল্প কথার লোক প্রতাপ জহুরী। তিনি গিরিশবাবুর বৈঠকখানায় বসে তাঁকে সোজাসুজি বললেন,—আমি জহর চিনে। ন্যাশানাল থিয়েটার কিনে লিয়েছি, ওটা চালাবো,—যদি আপনে সোব ভার লেন।

গিরিশবাবু একা ছিলেন না বৈঠকখানায়। কাছে বসে ছিলেন তিন অমৃত। মুখোপাধ্যায়, বসু এবং মিত্র। তাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে গিরিশবাবু বললেন,—ভার নিতে তো আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি যে সর্ত আরোপ করেছেন!

জহুরী বললেন,—হ্যাঁ—সর্তো! সর্তো একটা থাকবেই। হামি বেওসা করতে এসেছি, টাকা তো জলে ফেলতে আসি নেই! আপনে সাহেবের কোঠির নোকরি ছেড়ে হামার থিয়েটার লিয়ে চালান—আপনাকে আমি এখনই একশো টাকা তনখা দিবো!

—একশ' টাকা? একটু ভেবে দেখি। কেমন?

প্রতাপ জহুরী উঠে দাঁড়ালেন,—কী আর ভেবে দেখবেন গিরিশবাবু? দরওয়াজা খোলা রাখলম, আপনে দলবল লিয়ে ঢুকে পড়েন, ব্যস! হামি জানে, আপনের হাতে পড়লে হামার থিয়েটার গড়গড় করে চলবে—হ্যাঁ।—চললম।

বলে, তিনি আর দাঁড়ালেন না, গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেলেন।

—অমৃত ?

অমৃত বসু বললেন, —এখানে তিন অমৃত আছে। কাকে ডাকছো শুনি ?

গিরিশবাবু বললেন,—ও দুটি এখনো ছোকরা। আমি ডাকছি 'নীলদর্পণ'-এর সেই সৈরিন্ধ্রিকে, তোমার সেই মড়াকান্না কখনো ভুলবো ?

অমৃত বসু বললেন,—তবু তো আমাদের সান্ন্যাল-বাড়ির সেই প্রথম পয়সা-নিয়ে থিয়েটার করা দেখো নি, গোঁসা করে দূরে সরে রইলে ! ওঃ ! সে এক শিবহীন যজ্ঞই হয়েছিলে বটে ১৮৭২ সালে !

গিরিশবাবু হেসে বললেন —তা এবার না হয় শিবশুদ্ধ যজ্ঞই হোক। কী বলো তোমরা ?

অমৃত মিত্র বললে,—আমরা তো হেদিয়ে বসে আছি। কতদিন মুখে রঙ মাখি না ?

অমৃত মুখুজ্যে (বেলবাবু) বললে,—ঠিক কথা।

গিরিশবাবু বললেন,—তাহলে পতঙ্গের মতো আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়বো বলছো ?

অমৃত মিত্র বললে—আলবৎ !

অমৃত বসু শুধু মন্তব্য করলেন,—খালি আগুনটা বাঁচিয়ে।

হাসলেন গিরিশবাবু, তারপরে চিন্তিত মুখে বললেন,—দেড়শো টাকার চাকরি ছেড়ে একশো টাকায় ঢোকা ! আমার ভায়া অতুল উকিলসাহেব শুনলে তো রে-রে করে তেড়ে আসবে !

অমৃত বসু বললেন,—আমরা তাকে সামলাবো, তুমি ঝাঁপ দাও।

গিরিশবাবু উঠে দাঁড়ালেন,—ঝাঁপ তো দোবো ! নাটক কই ? হ্যাঁ আছে—হাতে একখানা তৈরি নাটকই আছে—সুরেন মজুমদারের লেখা 'হামির।'

অমৃত মিত্র বললে, হোক। হামিরই হোক।

অমৃত বসু বললেন,—কিন্তু তার আগে মেয়েদের জোটাতে হবে তো ? কাকে কাকে পাওয়া যাবে ?

অমৃত মিত্র বললে,—সবাই বসে আছে, একমাত্র বিনোদিনী ছাড়া।

অমৃত মুখুজ্যে বললে,—সে তো শুনছি কলকাতাতেই নেই।

গিরিশবাবু চিন্তিত মুখে বললেন,—হুঁ।

১৮৮০ তে প্রতাপ জহুরী উক্ত থিয়েটারটি কেনেন। এই সালেই বেঙ্গল থিয়েটারে (সেপ্টেম্বর মাসে) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অশ্রুমতী' অভিনীত হয়েছিল, যাতে 'মলিনা'র ভূমিকা করেছিলেন সুকুমারী বা গোলাপসুন্দরী। এই সময় বেঙ্গলে ঘটে ইন্দ্রপতন, এই ১৮৮০ তেই মারা গেলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ।

তাঁর স্মৃতিতে ঐ সালের ১১ ডিসেম্বর বিশেষ আয়োজনে অশ্রুমতীর অভিনয় হয়। মলিনা—গোলাপসুন্দরী, অশ্রুমতী—বনবিহারিণী (ভুনি) সেলিম হরি বোষ্টম, প্রতাপ সিংহ—বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।

বনবিহারিণীর এই 'অশ্রুমতী' অভিনয়ই শেষ, এর পর সে চলে আসে প্রতাপ জহুরীর 'ন্যাশানালে'। সে কথা একটু পরেই বলছি।

কাশীতে সেই সুরম্য গৃহে সাত সকালেই বোতল খুলে বসেছিলেন কুমার বাহাদুর। কিন্তু বোতল রেখে তিনি তখন খুব মনোযোগ দিয়ে একখানা খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বিনোদিনী বিশ্বনাথের মন্দির থেকে সবে ফিরেছে। পরনে ধবধবে সাদা লালপাড় গরদের শাড়ি, ভিজে চুল এলানো, হাতে প্রসাদ ও নির্মাল্য। সে এসে কুমারের ললাটে নির্মাল্য ছোঁয়াতেই তাঁর চমক ভাঙলো। কুমার মুখ তুলে তাকালেন, বললেন,—এই দ্যাখো কাগজে কী বেরিয়েছে! গিরিশবাবু থিয়েটারে পুরোপুরি জয়েন করেছেন—সেই ন্যাশানাল থিয়েটারে। কিন্তু মালিক গেছে বদলে! এই দেখ—

বলে, ওর হাতে কাগজখানা দিয়ে তিনি উঠে পড়লেন। বিনোদিনী টেবিলে প্রসাদ রেখে খবরের কাগজটা ভালো করে দেখতে থাকে। কুমার বলেন,—হ্যাঁ-দেখ, ভালো করে দেখ! দলে কারা কারা থাকবে তার লিস্টও বেরিয়েছে!

সাগ্রহে নামগুলো পড়তে লাগলো বিনোদিনী,—ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, রামতারণ সান্যাল, মতিলাল সুর, নীলমাধব চক্রবর্তী, আর মেয়েদের মধ্যে—ক্ষেত্রমণি, লক্ষ্মীমণি, কাদম্বিনী, বনবিহারিণী (ভুনি)—আর—বিনোদিনী!

নিজের নামটা দেখে চমকে উঠলো সে,—একী! এ যে দেখছি আমার নামও আছে!

তারপরে খুশি হয়ে বলে উঠলো,—তাহলে দেখছি আমাকে ওঁরা ভোলেন নি!

গম্ভীর গলায় কুমার বললেন,—কিন্তু তোমার অনুমতি না নিয়ে কী করে ওরা তোমার নাম দেয়?

—ওমা! তুমি রাগ করছো নাকি?

—আমি রাগ করছি, কি সোহাগ করছি, তা কলকাতা গেলেই দেখতে পাবে! এই কে আছিস? সরকার মশাইকে ডাক তো?

ডাকতে হলো না, সরকার মশাই তাঁরই কাছে আসছিলেন। পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন,—এই যে হুজুর! আপনার কাছেই আসছিলুম। আজ্ঞে, এই খরচের খাতাটা—

বলে, হাতের খাতাটা এগিয়ে দিলেন। সেটা হাত দিয়ে সরিয়ে কুমার বলে উঠলেন,—চুলোয় যাক খরচের খাতা! এখুনি সব ব্যবস্থা করে ফেলুন। আজ বিকেলের গাড়িতেই কলকাতা যাবো—হেস্ত নেস্ত একটা করতেই হবে!

এই 'হেস্তনেস্ত'-র জের এসে পৌঁছলো কলকাতায়, একেবারে বিনোদিনীর ঘরে। তিনি আর বিনোদিনী তো ছিলেনই, আর ছিলেন গিরিশবাবু আর অমৃতলাল বসু। বোঝা যাচ্ছে বিষয়টি যথারীতি উত্থাপিত হয়েছিল। তারই জের টেনে গিরিশবাবু বলছিলেন,—সাহেবদের কাগজগুলো পর্যন্ত বিনোদিনীর সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ। তাকে ছেড়ে আমি থিয়েটার করবো কী করে? এটা তোমাকে বুঝে দেখতে হবে কুমার বাহাদুর?

কুমার পায়চারী করছিলেন, বললেন, কিন্তু আমার একেবারেই অমত যে বিনোদিনী থিয়েটার করে!

গিরিশবাবু বললেন,—কেন বলো তো? যে থিয়েটারে বিনোদিনীকে দেখে তোমার ভালো লেগেছিল, সেই থিয়েটারের ওপর তোমার এতো রাগ কিসের? না কি আসল রাগটা আমাদের ওপর?

কুমার অপ্রতিভ হয়ে বললেন— ছি-ছি! কী বলছেন? আপনি বা এই ভুনিবাবুর ওপর আমার অসীম শ্রদ্ধা। আসল কথা বিনোদিনীকেই জিজ্ঞাসা করুন, ও জানে।

ওঁরা দুজনেই তাকালেন বিনোদিনীর মুখের দিকে।

গিরিশবাবু বললেন,—বিনোদ?

মুখখানা নিচু করলো বিনোদিনী, আরক্ত হয়ে উঠলো মুখ, কোনো কথা মুখ ফুটে বলতে পারলো না।

কুমার বললেন,—ও লজ্জা পাচ্ছে। তাহলে আমিই বলি। দেশে আমাদের যে জমিদারী আছে, তা খুব ছোট নয়। তার ওপর আমি বাপের এক ছেলে। সমস্ত সম্পত্তি আমিই পাবো। সেজন্যই খুব সন্তর্পণে আমাকে এগোতে হচ্ছে। যেদিন বুঝবো সময় হয়েছে, সেইদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে করবো ওকে। আমি কথা দিয়েছি!

গিরিশবাবু গম্ভীর হলেন, বললেন,—হুঁ।

অমৃত বসু বললেন,—আমি বলি কী, যে-কদিন তা না হচ্ছে, সে-কদিন তুমি ওকে থিয়েটার করতে দাও। গিরিশবাবু দারুণ ঝুঁকি নিয়ে থিয়েটারে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, আমাদেরও তো উচিত সবাই মিলে ওঁর হাত শক্ত করা! কী বিনি, তোর কী মত?

বিনোদিনী উত্তর দিলো—সব তো শুনলে ভুনিদা, আমার মতামতে কী আসে যায়?

কুমার বললেন, আসে-যায় বই কী! আমার মত আমি জানিয়েছি, তা বলে জোর-জবরদস্তি করতে চাই না!

বিনোদিনী বললে, তাহলে আমাকে থিয়েটার করতে দাও? আমার ঘরও থাকুক—থিয়েটারও থাকুক।

একটু অবাক হয়েই কুমার তাকালেন ওর মুখের দিকে, তারপরে তাকালেন গিরিশবাবু আর অমৃত বাবুর দিকে। তাঁরা উৎসুক হয়ে ওঁকেই নিরীক্ষণ করছিলেন। কুমার মুখ ফিরিয়ে বিনোদিনীকে বললেন,—থাকুক। কিন্তু একটা শর্তে। আমার জুড়ি গাড়িতে করে থিয়েটারে যাবে, আবার সেই গাড়িতেই ফিরে আসবে। আর তাছাড়া, মাইনে নেবে না। মাইনে নিয়ে মালিকের খবরদারীতে চলবে, এ আমি চাই নে!

অমৃত বসু বলতে গেলেন, কিন্তু—

গিরিশবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, –তাই হবে বাবা, তাই হবে।

কুমার বললেন, তাহলে আপনারা বসে কথা বলুন, আমি যাচ্ছি, আমার জরুরী কাজ আছে।

বলে, দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেলেন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন বিনোদিনীর মা। তিনি বললেন, ওমা! সে কি কথা গো! কাজ করবে, মাইনে নেবে না?

অমৃতবাবু বললেন, আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলে বুঝি?

—শুনবো না! মেয়ের ভবিষ্যৎ বলে কথা!

গিরিশবাবু বললেন,—মাইনে ঠিকই পাবে। আমি বা ভুনি লুকিয়ে এসে তোমার হাতে টাকা দিয়ে যাবো। কুমারকে বললেই হবে, বিনি মাইনে নিচ্ছে না।

অমৃত বসু বললেন,—যাক—সব ভালো যার শেষ ভালো।

তারপরে বিনোদিনীকে লক্ষ্য করে বললেন, এইবার খোদ গুরুর কাছ থেকে ব্বেশ করে বুঝে নাও তোমার পার্ট!

বিনোদিনীর মুখ হলো উজ্জ্বল। সে কাছে এসে দাঁড়ালো গিরিশচন্দ্রের। গিরিশবাবু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি করবে লীলার পার্ট। নাটকের নাম,—হামির।

১৮৮১ সালের ১লা জানুয়ারি এটি মঞ্চস্থ হলো, এর কয়েকখানি গান রচনা করেছিলেন গিরিশবাবু, ভুমিকা লিপি: হামির—গিরিশচন্দ্র, উদয় ভট্ট—মহেন্দ্রলাল বসু, জাল মাহাতো—অমৃতলাল বসু, ধীমন দেব—অমৃতলাল মিত্র, চারণ—রামতারণ সান্ন্যাল, লীলা—বিনোদিনী, কমলা-কাদম্বিনী, পান্না—বনবিহারিণী।

এই সময় বেঙ্গলে ছিলেন গোলাপসুন্দরী। এর পরে আর কোনো নাটকে বিনোদিনী ও গোলাপসুন্দরী, এই দুইজনের নাম একসঙ্গে পাওয়া যায় না।

সে যাই হোক, 'হামির' জমলো না। হামিরের বেশে গিরিশচন্দ্র এসে বসেছেন তাঁর সাজঘরে, নাটক শেষ হয়ে গেছে, এবার মেক-আপ তুলবেন, এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলেন প্রতাপ জহুরী। বললেন, না গিরিশবাবু, আপনের 'হামির' তো জমলো না! হামি বলি কী, আপনে নিজে লিখেন—দেখবেন—বিলকুল জমে যাবে!

—কী করে বুঝলেন?

—দেখেন, হামরা বেওসা করে খাই। কতক-কতক জিনিস ঠিক বুঝতে পারে। আপনে আচ্ছা আচ্ছা গানা লিখতে পারেন, ঐ সব গানা-উনা দিয়ে কুছু বানিয়ে লিন—আদমী লোক মাতোয়ারা হয়ে যাবে!

গিরিশবাবু বললেন, ঠিক আছে। আজ বাড়ি যাবো না। কে আছিস? বেলবাবুকে বল তো? যেন বাড়ি না যায়। স্টেজে বসেই নাটক লিখবো। সারারাত।

প্রতাপ জহুরীর মুখে ফুটে উঠলো তৃপ্তির হাসি।

গিরিশবাবু তাই করলেন। স্টেজের ওপর মাদুর, চাদর, তাকিয়া, গড়গড়া সব দেওয়া হলো। বেলবাবু, অর্থাৎ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় তখন ছিলো তাঁর অনুলেখকদের অন্যতম। এসে বসলো খাতা-কলম নিয়ে। স্টেজের লোক একটা ডেস্কও দিয়ে গেল। শুরু হলো লেখা। ঘড়িতে যখন ঢং করে শব্দ হলো, তখন ওদের চমক ভাঙলো। রাত তখন একটা। গিরিশবাবু বললেন, যাক—দোললীলা শেষ হলো। নাও—আর একখানা লিখবো—নাম দাও শিবের বিবাহ।

এই নাটিকা যখন শেষ হলো, তখন রাত তিনটে। উভয় পক্ষের কারুরই ক্লান্তি নেই। গিরিশবাবু বললেন,—কী, শেষ হলো তো? তোমার যদি কষ্ট না হয়, তো, আর একখানা ধরো, নাম দাও,—'মায়াতরু'।

এই মায়াতরুর প্রথম অভিনয়-তারিখ ঃ ১৮৮১-র ২২ জানুয়ারি। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, 'গিরিশচন্দ্রের মায়াতরু পলাশীর যুদ্ধের সহিত প্রথম অভিনীত হইল। দুই-তিন রাত্রি এই গীতিনাট্যের অভিনয়ের পর হইতে আবার থিয়েটার লোকে লোকারণ্য হইতে লাগিল। এই গীতিনাট্যে শ্রীমতী বিনোদিনীর 'ফুল-হাসি'র ভূমিকা ছিল। এই ভূমিকাটি বিনোদিনী এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল যে দর্শকগণ শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়াও শেষ করিতে পারে নাই।'

গীতিনাট্যটির শুরুই ছিল বিনোদিনীকে নিয়ে। ফুল-হাসি-রূপে সে

প্রথমেই একটা গান দিয়ে আসর মাত করে দিতো, খেমটা তালে পাহাড়ী পিলু রাগে (রামতারণবাবুর দেওয়া সুর)। একদিন তার অভিনয় দেখতে এসেছিল অবাঙালী এক ধনী যুবক তার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে। গানের সঙ্গে উইঙ্গসের পাশে বসে তবলা বাজাতো বন্ধু বিধু মৌলী। সে বাজাচ্ছে আর বিনোদিনী গাইছে : না জানি সাধের প্রাণে কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি। আমি তো প্রাণ দেবো না, প্রাণ নেবো না, আপন প্রাণে ভালবাসি।

একসময় ঐ অবাঙালী সুদর্শন যুবকটি একটি ফুলের তোড়া বিনোদিনীর গায়ে ছুঁড়ে মারে। বিনোদিনী তখন কিছু বলে না, কিন্তু সিন পড়লে সে রাগে গরগর করতে করতে সাজঘরে ঢুকে যায়, সঙ্গে সেই তোড়া হাতে একটি দাসী, আর পিছনে পিছনে অমৃতলাল বসু। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিনোদিনী, বলে, না ভুনিদা, অসভ্যতার একটা সীমা আছে! লোকে প্লের শেষে ফুল পাঠায়। কিন্তু এমন করে অসভ্যের মতন গায়ে ফুল ছুঁড়ে কেউ মারে না!

অমৃত বসু বললেন,—তা রাগ করছিস কেন বিনি? নানারকম লোক তো থাকবেই দুনিয়ায়! দেখু তো তোড়ার সঙ্গে কার্ডে কিছু নাম লেখা আছে কিনা?

বিনোদিনী ঝির কাছ থেকে তোড়াটা হাতে নিয়ে কার্ড দেখতে গিয়ে চমকে উঠলো। তার সঙ্গে একটি ছোট থলি বাঁধা ছিল। বিনোদিনী তাড়াতাড়ি থলির মুখটা ছিঁড়ে সেটি খুলে ফেললো। বেরিয়ে এলো, একটি নয়-দুটি নয়-পাঁচটি মোহর। বিনোদিনী অবাক হয়ে বললে,—এ কী!

অমৃত বসুও অবাক হলেন,—মোহর! এ-তো যা তা লোক নয়! কার্ডে কার নাম লেখা রয়েছে দেখি?

বিনোদিনী তোড়াটা অমৃতবাবুর হাতে দিলো। তিনি কার্ডটা দেখলেন। ইংরেজীতে লেখা রয়েছে—G. Musaddi. অমৃত বসু বলে উঠলেন,—জি মুসাদ্দি! খোঁজটা তো নিতে হচ্ছে!

জহুরী মশাই খুব খুশি আশাতীত বিক্রি দেখে। রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবীকঙ্কণ'-এর নাট্যরূপ দিয়েও অভিনয় করালেন গিরিশচন্দ্র। নিজে নামলেন সাতটি বিভিন্ন চরিত্রে। লোকে দেখে অবাক হয়ে গেল। বিনোদিনী সাজতো হেমলতা, জেলেখা—বনবিহারিণী। এর পরে করলেন নিজেরই লেখা আর একখানি গীতিনাট্য : মোহিনী প্রতিমা। এতে সাহানা—বিনোদিনী, কুসুম—কাদম্বিনী, নীহার—বনবিহারিণী, হেমন্ত—রামতারণ সান্যাল। এর সঙ্গে তিনি নিজের আরও একখানি রঙ্গনাট্য জুড়লেন, 'আলাদিন'। এটি দর্শকচিত্ত জয় করেছিল। 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ'-বইতে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই বইটি সম্পর্কে লিখেছেন.—'ন্যাশানালে বইখানি বড়ো জমিত। গিরিশবাবু যখন রামতারণের সম্মুখে যাদুদণ্ড ঘুরাইতেন, সকলে বিস্মিত হইতেন। আর

আলাদিন যখন চীনেম্যানের বেণী দুলাইয়া 'কার তোয়াক্কা রাখি আর' গানটি গাহিতে গাহিতে বাহির হইত, দর্শক আনন্দে মাতিয়া উঠিত।'

কুহকীর ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রই এক দ্রষ্টব্য বস্তু ছিলেন। আলাদিন—রামতারণ সান্ন্যাল, বাদশাহ—মহেন্দ্রলাল বসু, উজীর—নীলমাধব চক্রবর্তী, জিনি—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), আলাদিনের মা—ক্ষেত্রমণি, বাদশাহ-কন্যা ও পরী—বিনোদিনী। ধরা যাক সেই রগড়ের দৃশ্যটা। কলুর দোকানে কলু (গিরিন্দ্র ভদ্র) বসে আছে। হাতে তেলের জন্য ভাঁড় নিয়ে গাইতে গাইতে 'আলাদিনের মা' ক্ষেত্রমণি ঢুকলেন ঃ

'বেলা যায় সন্ধ্যা হলো, তেল-পলা দে কলুর পোলা!

বেটাকা সাদী দেগা—রাজাকো বেন বনে গা।

কলু—কেয়া? তোমরা বেটা আলাদিন কা সাদী দেগা? রাজকন্যাকা সাথ?

মা—ঐ কথাই তো বোলতা হ্যায়! আমার বেটা আলাদিনকা আশ্চর্য প্রদীপ মিলা না? প্রদীপ ঘষেগা, আর অমনি জিনি নিকাল আয়ে গা!

—তব কেয়া হোগা?

—যা কহে গা, তাই মিলে গা!

—মিলা?

—বহুৎ মিলা! এত্না এত্না সোনা-দানা! সব রাজাকো দিয়া!

বলে আবার গান ধরলেন ক্ষেত্রমণি ঃ

হীরামতি খেজুর আঁতি দেখকে রাজা পছন্দ কিয়া!
বোলা হ্যায় দেগা বিয়া আজও রাজার ঝরতা নোলা!
বেলা যায় সন্ধ্যা হলো, তেল-পলা দে কলুর পোলা!

নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে তখন কলু অবাক হয়ে বলে উঠলো—আরে বাপ্!

মা ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নেপথ্যে দেখলো,—কেয়া!

কলু নেপথ্যের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে,—ঐ দেখ! উজিরের ছেলে যাচ্ছে রাজার মেয়েকে বে করতে। তার কপালে ঝাঁটা!

নৃত্যভঙ্গিমায় উজিরের ছেলে বরবেশে পাগড়ি মাথায় বরযাত্রীসহ ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে এ উইংস থেকে বেরিয়ে ও উইংস দিয়ে বেরিয়ে যায়। মা আর্তনাদ করে বসে পড়লেন,—একী হলো!

এই সময় আলাদিন পাল্টি খেয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে ও আর্তনাদ করে ওঠে ঃ ওরে মারে-ভাইরে! মরমে হাম তো মরে যাইরে!

মা কাঁদেন ঃ গালে হাত দে ভাবছি বসে তাই রে!

আলাদিন কী যেন ভাবলো, তারপরে প্রদীপটা ঘষতে লাগলো। সংগে সংগে বিকটদর্শন জিনির আবির্ভাব। জিনি ঘুম ঘুম চোখে হেঁড়ে গলায় বলে: হরঘাড়ি বোলাতে আপনি! রাতকো ঘুরে, দিনকো নিদমে গিরে, কভি মুছপর নেহি করে মেহেরবানি!

আলাদিন গায়: কেয়া কিয়া রাজাকো জহরৎ দিয়া! হামকা সাদী দেগা—এ-বাত হুয়া!

কাঁহাকা উজিরপোলা, আয়া শালা, মেরা তগদিরমে লাগা দিয়া চাঁপা কলা!

জিনি বললে--অ্যায়!

আলাদিন॥ জিনি বাবা, জলদি জলদি দৌড় যাও, শালা-শালীকো এধার লে আও।

জিনির তিরোভাব। পরক্ষণেই সে বরবেশী উজিরপুত্র আর কনেবেশী রাজকন্যাকে নিয়ে ফিরে আসে। আলাদিন খুশি হয়ে বলে,—বহুৎ খুব! ব্যাটাকে নে যা ধরে পগার পারে দাঁড়-দড়া বেঁধে জোরে!

উজিরপুত্রকে বেঁধে নিয়ে জিনির তিরোভাব। আলাদিন এবার রাজকন্যা-বেশী বিনোদিনীকে বলে,—জানি, তু মেহেরবানি কর জেরা! দোসরাকো করকে শাদী হামকো কাহে জানে মারা?

রাজকন্যা বলে,—ছেড়ে দাও হামকো তুমি! হামকো তো দোসরা স্বামী।

ছেড়ে দাও হাম চলে যায়—বেহায়া কেয়া বাৎ হ্যায়?

কী জন্য তোম হাত ধরা!

আলাদিন বলে—Because তোমার জন্য যাতা হ্যায় মারা!

সেরাতেরই ঘটনা। গিরিশবাবুর সাজঘর। তখনো তাঁর শরীরে কুহকীর পোষাক। কিন্তু মুখ গম্ভীর। তাঁর পাশে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে বৃদ্ধ তবলচী বিধু মোলী। ঢুকলেন অমৃত বসু ও অমৃত মিত্র। অমৃত সোল্লাসে বললেন—নাটকের তো জয়জয়কার! রোজ রোজ এক বাড়ি বিক্রি! প্রতাপ জহুরী তো লাল হয়ে গেল!

গিরিশবাবু মন্তব্য করলেন,—টাকায় লাল হচ্ছে, অর্থাৎ বড়ো হচ্ছে, কিন্তু মনে বড়ো হচ্ছে কী? এই যে বিধু দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওর কাছ থেকেই শোনো।

অমৃত বসু বললেন,—কী হয়েছে বিধু?

বিধু কাঁদো কাঁদো গলায় বললে,—আমি গরিব মানুষ, একা মানুষ,

কেউ কোথাও নেই! তাই বড়োবাবু আমাকে থিয়েটারেরই এক চিলতে একটা ঘরে থাকতে দিয়েছিলেন।

অমৃত মিত্র বললে,—তা তো জানি। কী হয়েছে বলো না?

বিধু কথাটা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললো,—প্রতাপবাবু আজ আমাকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছেন।

—কেন—কেন?

গিরিশবাবু বললেন,—তার যুক্তি অদ্ভুত। থিয়েটারের ঝাঁটপাটে যখন কাজে আসে না, তখন বিনে ভাড়ায় ঘর দখল করে থাকবে কেন?

অমৃত মিত্র বললে,—কী আশ্চর্য! ও কি চাকর-বাকর-না দারোয়ান! যে, ঝাঁটপাট দেবে?

অমৃত বসু বললেন,—ও তবলচী। শিল্পী। শিল্পীর এ অপমান!

গিরিশ উঠে দাঁড়ালেন,—তোমরা বসো। বিধু এসো আমার সঙ্গে। আজ প্রতাপ জহুরীর একদিন কী আমারই একদিন!

বিধুকে নিয়ে বেরিয়ে যান তিনি। অমৃত বসু বললেন,—গুরু আজ ক্ষেপেছে!

অমৃত মিত্র। খ্যাপাই উচিত!

অমৃত বসু। খেপে যদি থিয়েটারই ছেড়ে দেয়!

অমৃত মিত্র। তা দিক। আমরাও ছাড়বো। তুমি জানো ভুনিদা, দিনরাত গাধার মতো যারা খেটে মরে, তারা একদিন কামাই করলে তাদের মাইনে কাটবে!

—জানি না আবার! হাড়ে হাড়ে জানি! কিন্তু কী জানো, থিয়েটারের এখন বাড়-বাড়ন্তের সময়। এ সময়ে ঘা দিলে—

গিরিশবাবু ঢুকলেন,—বুঝলে হে! জোঁকের মুখে নুন পড়েছে। বিধুকে আবার ঘরে ঢুকিয়ে তবে ছেড়েছি!

বলে, বসে পড়ে 'কুহকী'র পোষাক ছাড়তে আরম্ভ করলেন। অমৃত মিত্র বললে,—তাহলে আমাদের জয় হয়েছে বলুন?

—তা হয়েছে। কিন্তু এই শুরু হলো ঠোকাঠুকি। বেশিদিন টিকতে পারবো বলে মনে হয় না!

অমৃত মিত্র বললে, তাহলে নতুন একটা থিয়েটারের চেষ্টা দেখতে হয়।

গিরিশবাবু বললেন,—কিন্তু নতুন কাপ্তেন পাকড়ানো এতো সোজা?

অমৃত বসু বললেন,—আছে—আছে—কাপ্তেন আছে। তোমার কি মনে আছে—এক ছোঁড়া বিনোদিনীর গায়ে ফুল আর মোহর ছুঁড়ে মেরেছিল?

—হ্যাঁ।

—সে ভেতরে এসে আমাদের কাছে ভাবসাব করেছে! চেপে ধরলে মনে হয় থিয়েটার করতে পারে! তাকেই একবার—!

গিরিশবাবু বললেন,—কিন্তু From frying pan to fire হবে নাতো? তাড়াহুড়ো করো না, আরও কয়েকটা দিন যেতে দাও। দেখাই যাক না—কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়!

এরপরে গিরিশচন্দ্র 'রাণা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ ও সন্ধি প্রস্তাব' এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এক কাল্পনিক কাহিনী উপহার দিলেন। তিনি সাজলেন 'বেতাল', একটি অদ্ভুত চরিত্র। তার মুখের বুলিই হচ্ছে 'আনন্দ রহো!' আকবর ও রাণা প্রতাপ সাজলেন অমৃতলাল মিত্র, সেলিম—বেলবাবু (অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়) মানসিংহ—অমৃতলাল বসু, নারায়ণ সিংহ—মহেন্দ্রলাল বসু, ভামশা—মতিলাল সুর, মহিষী—ক্ষেত্রমণি, যমুনা—কাদম্বিনী, লহনা—বিনোদিনী। এই নাটকের একটি গান নিদারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল: নেচে নেচে চল্ মা শ্যামা, দুজনে তোর সঙ্গে যাবো।

দেখবো রাঙা চরণ দুটি, বাজবে নূপুর শুনতে পাবো॥
ঘোর আঁধারে ভয় বা কারে, ডাকবো শ্যামা অভয়ারে।
ওমা বলে যাবো চলে, 'মা' বলে মা প্রাণ জুড়াবো।

তাল ছিল মধ্যমান, সুর ছিল—বাহার-ভৈরবী।

এরপর গিরিশচন্দ্র লিখলেন রাবণবধ, তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ পৌরাণিক নাটক। অমৃতলাল মিত্র এই সময় তাঁর অনুলেখক ছিলেন। ১৮৮১-র ৩০শে জুলাই রাবণ-বধ অভিনীত হয়ে নিদারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অমৃতলাল মিত্র ছিলেন রাবণ, গিরিশবাবু—রাম। লক্ষ্মণ—মহেন্দ্রলাল বসু, বিভীষণ—অমৃতলাল বসু, ইন্দ্র—বেলবাবু, ব্রহ্মা—নীলমাধব চক্রবর্তী, মারুতি—অঘোরনাথ পাঠক, সুগ্রীব—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, সীতা—বিনোদিনী, মন্দোদরী—কাদম্বিনী। নিকষা-কালী-দুর্গা ও ত্রিজটা-ক্ষেত্রমণি। (মোট চারটি পার্ট) বিনোদিনীও 'ন্যাশানালে' 'মেঘনাদবধ' নাটকে ছটি পার্ট করে ছিল, প্রমীলা বারুণী-রতি-মায়া-মহামায়া-সীতা।

'রাবণ-বধ' এই প্রথম 'গৈরিশীছন্দ'-এর উৎপত্তি। রাবণ-বধ লেখবার আগে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র প্রারম্ভিক পৃষ্ঠার একটি কবিতার ছন্দঃ হে সজ্জন / স্বভাবের সুনির্মল পটে/রহস্য-রসের রঙ্গে/চিত্রিনু চরিত্র দেবী সরস্বতী বরে' ইত্যাদি। এটি পড়েই তাঁর মনে হয়েছিল, যা তিনি চাইছিলেন তা পেয়ে গেছেন। এই ছন্দেই তাই লিখলেন 'রাবণ-বধ।' এই ছন্দের প্রশংসা করলেন 'ভারতী' পত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখলেন, 'এতদিনে নাটকের ভাষা সৃজিত হইয়াছে।'

এই নাটক অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। গিরিশচন্দ্র এরপর লিখলেন 'সীতার বনবাস,' অভিনীত হলো ঐ ১৮৮১ সালেরই ১৭ই সেপ্টেম্বর বিনোদিনী তখন অষ্টাদশী মাত্র। ভূমিকালিপিতে গিরিশচন্দ্র এবার একটু অভিনবত্ব আনলেন। সীতার ভূমিকায় এবার নামালেন কাদম্বিনীকে, বিনোদিনীকে দিলেন লবের ভূমিকা। ওর সঙ্গে কুশ করতো 'খোঁড়া' কুসুমকুমারী, অলিক্ষরা—বনবিহারিণী, নিকষা—ক্ষেত্রমণি। বাল্মীকি—অমৃতলাল মিত্র, দুর্মুখ—অমৃতলাল বসু, ভরত—বেলবাবু, গিরিশবাবু নিজে 'রাম', মহেন্দ্রলাল বসু 'লক্ষ্মণ।' বশিষ্ঠ নীলমাধব চক্রবর্তী, অশ্বরক্ষক—অঘোরনাথ পাঠক, সুমন্ত—অতুল কৃষ্ণ মিত্র (বেড়োল)। এই সীতার বনবাসও ন্যাশানালের সুনাম ও জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন রাখে। লব কুশ মাতিয়ে রাখতো মঞ্চ, বিশেষ করে লব রূপে বিনোদিনী। ন্যাশানালের এই সব নাটক সম্পর্কে ধর্মদাস সুর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন,—'প্রথম রাবণ বধ। তাহাতে উৎসাহ পাইয়া 'সীতার বনবাস'—এইরূপ যে বইখানি লেখেন, তাহাই জমিয়া যায়। সাধারণে গিরিশচন্দ্রকে একজন লেখক বলিয়া জানিতে পারিল।'

এই সালের ২১শে সেপ্টেম্বর অমৃতলাল বসুর 'তিল-তর্পণ' অভিনীত হলো। তার পরে ২৬ শে নভেম্বর মঞ্চস্থ হলো গিরিশচন্দ্রের অভিমন্যু বধ। এই বইতে 'অভিমন্যু'র ভূমিকায় বেলবাবু খুব নাম করেছিলেন বলে জানা যায়। উত্তরা করতেন বিনোদিনী (পরে ছোটরাণী), রোহিনী-কাদম্বিনী, সুভদ্রা-গঙ্গামণি (সেই গঙ্গামণি, যার কাছ থেকে ছোট বেলায় গানের তালিম নিয়েছিল বিনোদিনী), যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন—গিরিশচন্দ্র (পরে যুধিষ্ঠির—অর্দ্ধেন্দু-শেখর) শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রোণাচার্য—কেদার চৌধুরী, ভীম ও গর্গ—অমৃতলাল মিত্র, অর্জুন ও জয়দ্রথ—মহেন্দ্রলাল বসু, দুঃশাসন—নীলমাধব চক্রবর্তী, কৃপাচার্য ও শকুনি—অতুলচন্দ্র মিত্র (বেড়োল), ভগদত্ত—গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র, কর্ণ ও গণক—অঘোরনাথ পাঠক।

'সীতার বনবাস-এর মতো জনপ্রিয়তা লাভ করে নি 'অভিমন্যু-বধ। এই সময় জহুরী গিরিশবাবুকে বলেন,—এইবার যখন কেতাব লিখবেন, তখন ওহি লবকুশের মাফিক দুনো লেড়কা ছেড়ে দিবেন।'

গিরিশচন্দ্র কথাটা বুঝে লিখলেন 'লক্ষ্মণ-বর্জন।' আয়তনে অপেক্ষাকৃত ছোট নাটক। ১৮৮১ সালের ৩১ ডিসেম্বর অভিনীত হয়েছিল। রাম-লক্ষ্মণ যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র ও মহেন্দ্রলাল বসু, কালপুরুষ—অঘোরনাথ পাঠক, ব্রহ্মা—

নীলমাধব চক্রবর্তী। দুর্বাশা—অমৃতলাল বসু, আর লব-কুশ যথাক্রমে বিনোদিনী ও খোঁড়া কুসুম।

এরপরের নাটক গিরিশবাবুরই 'সীতার বিবাহ।' এতে সীতা করলো ছোটরাণী, অহল্যা-কাদম্বিনী, জনক-নীলমাধব চক্রবর্তী, বিশ্বামিত্র—গিরিশচন্দ্র, রাবণ—অঘোরনাথ পাঠক, রাম—বেলবাবু, লক্ষ্মণ—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, পরশুরাম ও কালনেমি—অমৃতলাল মিত্র। জনকপত্নী—ক্ষেত্রমণি। এর প্রথম অভিনয় হয় ১৮৮২-র ১১ই মার্চ। এ নাটক বিশেষ আদৃত হয় নি। কিন্তু পরের নাটক গিরিশচন্দ্রের 'রামের বনবাস' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। কঞ্চুকীর ভূমিকায় অমৃতলাল বসু অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়। এতে 'কৈকেয়ী'র ভূমিকায় নামলো বিনোদিনী। তারও অভিনয় বিশেষ আদৃত হয়েছিল। অমৃতলাল বসু কঞ্চুকী ও ভরত করেছিলেন। রাম-মহেন্দ্রলাল বসু, লক্ষ্মণ—বেলবাবু, শত্রুঘ্ন—রামতারণ সান্যাল, দশরথ—অমৃতলাল মিত্র, বশিষ্ঠ—নীলমাধব চক্রবর্তী, গুহক—আঘোরণাথ পাঠক। গুহক ও তার সাথীদের গান 'হো-হো-হো- এলো রামা মিতে' সে সময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। সীতা করেছিলো ভূষণকুমারী। মন্থরা—ক্ষেত্রমণি, কৌশল্যা—কাদম্বিনী। গুহক-পত্নী -গঙ্গামণি। এই নাটকে মন্থরার ভূমিকায় ক্ষেত্রমণিও সার্থক অভিনয় করেছিলেন।

এরপর ২২শে জুলাই মঞ্চস্থ হলো গিরিশচন্দ্রের 'সীতাহরণ'। এই নাটকে সীতা আবার বিনোদিনী। মন্দোদরী—গঙ্গামণি, উগ্রচন্ডা, চেড়ী ও সুপর্ণখা ক্ষেত্রমণি, সরমা—বনবিহারিণী, দুর্গা, মায়া, তারা—কাদম্বিনী, সাগর-পত্নী,- ভূষণকুমারী। রাম—মহেন্দ্র বসু, লক্ষ্মণ -বেলবাবু, রাবণ ও বালি—অমৃত মিত্র, সাগর—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইন্দ্র—প্রবোধ ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ—উপেন্দ্র মিত্র।

ন্যাশানালে যখন এই সব নাটক হচ্ছে ১৮৮২ সালে, তখন বেঙ্গল থিয়েটার করলেন আগস্ট মাসে রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী, আর ১৫ই ডিসেম্বর হরিশচন্দ্র। 'সোমপ্রকাশ'-এ এই দুটি নাটকেরই প্রশংসা বার হয়েছিল।

ন্যাশানালে অক্টোবরে গিরিশচন্দ্রের নাটিকা 'ভোটমঙ্গল' ও 'মলিনমালা'র পর অমৃতলাল বসুর 'ডিসমিস' হয়ে ছিল ডিসেম্বরে, আর এই মাসে হয়েছিল 'মাধবী-কঙ্কন'-এর পুনরভিনয়। হেমলতা-চরিত্রে বিনোদিনী, জেলেখা-বনবিহারিণী।

এরপর এলো ১৮৮৩ সাল। ৩রা ফেব্রুয়ারি মঞ্চস্থ হলো গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত নাটক 'পান্ডবের অজ্ঞাতবাস।' কীচক ও দুর্যোধন—গিরিশচন্দ্র, অর্জুন (বৃহন্নলা)—মহেন্দ্র বসু, ভীম, ভীষ্ম ও জনৈক ব্রাহ্মণ—অমৃত মিত্র, শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রোণাচার্য—কেদার চৌধুরী, বিরাট—অতুল মিত্র (বেডৌল),

যুধিষ্ঠির—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, উত্তর—বেলবাবু, কৃপাচার্য—নীলমাধব চক্রবর্তী, অভিমন্যু—বনবিহারিণী, দ্রৌপদী—বিনোদিনী, সুদেষ্ণা—কাদম্বিনী, উত্তরা—ভূষণকুমারী, হাড়িনা—ক্ষেত্রমণি। নকুল—বিহারীলাল বসু, সহদেব—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোপ—জীবনকৃষ্ণ সেন।

'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'-নাটকের যেরকম বাঁধুনি, অভিনয়ও হতো খুব সুন্দর, জনপ্রিয়ও হয়েছিল তেমনি। কীচক রূপে গিরিশচন্দ্রও অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন বলে শোনা যায়।

সেই দৃশ্যের অভিনয়ের কথা চিন্তা করা যাক, যেখানে কীচকের কুপ্রস্তাবে ভীত হয়ে রাণী সুদেষ্ণার কাছে ছুটে গিয়ে ত্রস্তা দৌপদী বলছে ঃ

হে রাজমহিষি! ধরি দেবী চরণে তোমার! দাসী আমি, মাতাজ্ঞান করি তোমা! কুকথা কহিল ভ্রাতা তব!

সুদেষ্ণা।। শুনলো সৈরিন্ধ্রি, পশ্চাৎ শুনিব কথা ; পিপাসায় মরমপীড়িতা আন সুধা ভ্রাতা-গৃহ হতে!

দ্রৌপদী ।। ক্ষমা করো রাজরাণি। হেনবাণী না কহ আমারে!

সুদেষ্ণা ।। পরগেহী, পরান্নপালিতা, এতো অহঙ্কার তোর!
চাহ যদি আশ্রয় আমার, যাও ত্বরা সুধাপাত্র লয়ে, তৃষ্ণায় কাতরা আমি ; নহে গতি চিন্ত আপনার! কিঙ্করী—ঈশ্বরী নহ তুমি!

এই বলে সুদেষ্ণা প্রস্থান করে।

পরের দৃশ্যে দেখা যায়, আপন কক্ষে একা কামমোহিত কীচক দ্রৌপদীর জন্য অপেক্ষা করছে। আগেই কথা হয়েছিল, ভ্রাতার জন্য ভগ্নী সুদেষ্ণা যে কোনো ছল করে দ্রৌপদীকে এখানে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু এখনো সে না আসায় কীচক অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। সে বলছে—

এখনো সুদেষ্ণা নাহি প্রেরিল তাহারে!
আহা, কিবা বিম্বাধর অলসে বিভোর!
সুধাপানে মুগ্ধ হয়ে নয়নে চাহিয়ে এলোকেশ বেড়িয়ে বাঁধিব বাহু!
ওই মৃদু পদ-সঞ্চালন!—ছার ভৃত্যগণ!
সুদেষ্ণার মুখে ছাই!—কার কণ্ঠস্বর!—ছি-ছি! কর্কশ বায়স-ধ্বনি? কালি সব করিব নিধন!
নয়নে অনল—সুধা!
জ্বলে, পরাণ জুড়ায়!
নিবিড় নিতম্ব ঢাকা কেশ আচ্ছাদনে—
যমুনা উজান—বিনা বায়ে দোলে যেন!

হৃদি-হ্রদে যুগল কমল !
তরঙ্গিত লাবণ্য-হিল্লোলে !

এই সময় সুধাভাণ্ড নিয়ে প্রবেশ করলো দ্রৌপদী, বললো—সুধাহেতু আসিয়াছি মহাশয় ।

কীচক ।। সুধাময়ি, আগে সুধা দেহ মোরে !

দ্রৌপদী ।। দুরাচার, সংহারের করেছ উপায় !

কীচক ।। কোথা পলাইবে কিঙ্করে ঠেলিয়ে পায় !

দ্রৌপদী ।। রে পামর ! অনলে না কর করার্পণ, সমনে না দেহ কোল !

কীচক ।। পায়ে ধরি, রাখ প্রাণ !

দ্রৌপদী ।। দুরাচার, অচিরে পাইবি প্রতিফল ! [দ্রৌপদীর প্রস্থান]

কীচক ।। কী ! সামান্য বনিতা, অবহেলা কর মোরে !
পদাঘাতে বধিব জীবন ! [প্রস্থান]

সেই রাত্রেরই ঘটনা । গিরিশবাবুর সাজঘরে গিরিশবাবু তাঁর কীচকের মেক-আপ তুলছেন । পাশে বসে কথা বলছিলেন অমৃতলাল বসু । দরজার কাছ থেকে ভেসে এলো বিনোদিনীর গলা ঃ আসতে পারি ?

ওঁরা মুখ ফিরিয়ে তাকালেন । গিরিশবাবু বললেন,—কে ? বিনোদ ? এসো—এসো ?

বিনোদিনী অবসন্নভাবে ঘরে ঢুকলো । গায়ে ওর অভ্যস্ত দামী পোষাক—থিয়েটারের বেশবাস নয় । সে বললে,—আমি বাড়ি যাচ্ছি । সেকেণ্ড নাটকে নামতে পারবো না । অন্য কাউকে দিয়ে চালিয়ে নিন ।

অমৃত বসু অবাক হয়ে বললেন—সে কী !

বিনোদ বললে,—সিন থেকে বেরিয়ে আমি ভিরমি খেয়েছিলুম, জানেন না, কেউ বলে নি ?

—না তো !

ভাগ্যিস সেই মানুষটা নিজে আজ এসেছিল ! এসে, গাড়িতে বসেছিল ! ছুটে এসে সে-ই তো যা করবার, করলে !

গিরিশবাবু এতক্ষণ কোনো কথা বলেন নি, এবার তিনি উঠে কাছে এসে সস্নেহে বললেন,—ভিরমি খাওয়ার আর দোষ কী ? যে খাটান—খাটাই ? নতুন বই—পুরোনো বই—পঞ্চরং আর প্যানটোমাইম—এসবের রিহার্স্যাল লেগেই আছে ! শো-ও চলছে, রিহার্স্যালও চলছে । তাছাড়া, ও আসে নি, ও-পার্টটা করে দাও । নিজের পার্ট ছাড়া খুচরো কতো যে পার্ট তোমাকে করতে হয় !

ওঁর কথায় একটু নরম হয় বিনোদিনী, বলে,—আপনারা আছেন, তাই আছি। নইলে জহুরীর থিয়েটারে থাকতে ইচ্ছে করে না! আমি এক মাসের ছুটি চাইতে গেলুম, অনেক তর্কাতর্কির পর মাত্র পনেরো দিনের ছুটি দিয়েছে!

অমৃত বসু অবাক হয়ে বললেন, সে কী! পনেরো দিন তুই আসবি না।

—শরীরে আর কুলোচ্ছে না ভুনিদা! দিনকতক বাইরে গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে আসি, তারপরে আবার কাজ নিয়ে মেতে উঠবো।

বলতে বলতে গিরিশবাবুকে প্রণাম করলো, বললো,—কী? দিচ্ছেন তো অনুমতি?

গিরিশবাবু ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বললেন,—তাই হোক বিনোদ—তুমি সুস্থ হয়ে ফিরে এসো।

বিনোদিনী এবার প্রণাম করলো অমৃত বসুকে। তিনি বললেন,—বাইরে কোথায় যাবি ঠিক করেছিস, বিনি?

—কোথায় আবার? কাশী। আমার মহাতীর্থ!

অমৃতলাল বললেন, কাশী সবারই মহাতীর্থ। আমিও তো ছিলাম কাশীতে।

—তাই নাকি?

অমৃত বসু বললেন, কলকাতায় পড়তাম আমার পিতাঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত কম্বুলিয়াটোলা স্কুলে। সেখানে আমার সঙ্গে পড়তো অর্ধেন্দু। তখন থেকেই আমার আলাপ ওর সঙ্গে। আমি স্কুলের পালা শেষ করে চলে যাই কাশীতে হোমিওপ্যাথী ডাক্তারী শিখতে ওখানকার নাম-করা হোমিওপ্যাথ ডাক্তার লোকনাথ মৈত্রের কাছে। কাশীতে থাকতাম বটে, মন পড়ে থাকতো কলকাতায়। কলকাতায় তখন 'লীলাবতী'র রিহার্স্যাল চলছে। আমি এলাম কাশী থেকে বেড়াতে। অর্ধেন্দু আমাকে ধরে 'যোগজীবন'-এর পার্ট দিলে। কিন্তু কথাটা চাউর হয়ে ছিল। লোকনাথ বাবু কাশী থেকে এসে আবার আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান কাশীতে। তখন আর 'যোগজীবন' আমার করা হয় নি।

ওর বলার ভঙ্গিতে মজা পাচ্ছিলেন গিরিশবাবু। বিনোদিনীও ওঁর হাত নাড়া আর মুখভঙ্গি দেখে কম আকৃষ্ট হয়নি, বললে, তারপর?

অমৃত বসু বললেন, তাহলে শোন্। ১৮৭২ সালের গোড়ার দিকে লোকনাথবাবুর সুপারিশ পত্র নিয়ে আমি কাশী ছেড়ে বাঁকিপুরে চলে এলুম ডাক্তারী করতে। সেখান থেকে ঐ সালেরই নভেম্বরে কলতাকায় এসেছিলাম। আর ফিরে যাওয়া হয়নি। অর্ধেন্দু আমাকে আবার ধরলো। ধ'রে নীলদর্পণে দিলে সৈরিন্ধ্রীর পার্ট। শুরু হলো নাট্য-জীবন। তাই বলছিলাম, কাশী আমাদেরও মহাতীর্থ!

॥ ৪ ॥

দেরি না করে কাশীতেই চলে যায় বিনোদিনী। তার শরীর ছিল সত্যিই অসুস্থ। গিয়েই জ্বরে পড়ে। সেই ঘরখানির পালঙ্কের ওপর সে শয্যাশায়ী। শিয়রের কাছে টেবিলে ওষুধের শিশিপত্র। সেগুলি হাতে তুলে মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন কুমার বাহাদুর। তারপরে ধীরে ধীরে এসে বসলেন বিনোদিনীর শিয়রে। হাত রাখলেন ওর কপালে। বিনোদিনী চোখ খুলে ওঁকে দেখলো। তারপরে ওঁর ঐ হাতটা টেনে বুকের ওপর নিলো, আচ্ছন্নের মতো বলতে লাগলো,—কতো লোক কতো ফুলের তোড়া এনে আমার ঘর ভরিয়ে দিয়েছে, কতো লোভ—কতো প্রস্তাব! তবু আমি এই হাতখানা ছাড়ি নি! জানি এই হাতখানা যদি আমার বুকে থাকে, আমি সব পাবো। পাবো ঘর—পাবো সংসার—কোনো সাধ অপূর্ণ থাকবে না!

এই সময় গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরে ঢোকেন সরকার মশাই, তাঁর পিছনে প্রৌঢ় ডাক্তারবাবু। কুমার হাতখানা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—আজ কেমন আছেন?

কুমার বললেন,—দেখুন তো, জ্বরটা বোধহয় ছেড়ে গেছে।

ডাক্তারবাবু বিনোদিনীর কপালে হাত দিলেন। তারপরে নাড়ি দেখলেন ভালো ক'রে, বললেন, very good, জ্বর নেই। আসলে অতিরিক্ত খাটাখাটুনিতে এই অবস্থা হয়েছে আর কী! দিনকয়েক বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে।

ঘরের দেওয়াল-ঘড়িটার পেণ্ডুলাম তখন টক্‌টক্‌ করে সময়ের সমুদ্র পার হচ্ছিল।

দিনকতক পরে। খাটের ওপর বসে আছে বিনোদিনী, দাসী চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। বিনোদিনীর চুল ছিল এক শোভা বিশেষ। যেমন লম্বা তেমনি ঘন, আর তেমনি ঝক্‌ঝকে কালো, কপালের কাছে কোঁকড়া কোঁকড়া। বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢুকলেন কুমার বাহাদুর। তাঁকে দেখে দাসী তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে চলে গেল। কুমারের মুখখানা ছিল গম্ভীর। তিনি ওর কাছে এসে বললেন,—মেনী, একটা মুশকিল হয়েছে, দেশ থেকে একটা টেলিগ্রাম এসেছে। কী ঝঞ্ঝাট ঘটেছে কে জানে! আমাকে যেতে লিখেছে। বলছে এখ্‌খুনি চলে এসো!

বিনোদের মুখখানা পাণ্ডুর দেখাচ্ছিল, সে উঠে ওর কাছে দাঁড়ালো, বললে, না। আমি তোমাকে যেতে দেবো না! কী করে ছেড়ে থাকবো?

কুমার ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন,—ছেড়ে থাকতে কে বলেছে? তুমিও আমার সঙ্গে কলকাতা চলো। এখানে কতদিন কাটলো বলো তো? পুরো এক মাস।

বিনোদিনী বললে,—আরও একটা মাস কাটুক! কাশীতে দেখছি আমার শরীর ভালো থাকে, মনও ভালো থাকে।

—তাহলে তুমি থাকো, আমি দেশ থেকে একবার ঘুরে আসি, কেমন?

—হে নাথ! এ-পদাশ্রিত জনে কী কারণে ঠেলো পায়? জাগরণে, শয়নে, স্বপনে, রাম নাম বিনা কভু নাহি জানে দাসী!

কুমার হেসে আবার ওকে জড়িয়ে ধরেন, বলেন,—কিন্তু তোমার এই রাম তোমাকে কখনো চিতার আগুনে পুড়তে বলবে না!

—কিন্তু বিরহ-আগুনে তো পোড়াবার ব্যবস্থা করছো!

কুমার ওকে আরও কাছে টেনে নিলেন,—না-গো-না! আমার থাকবার উপায় থাকলে সত্যিই থাকতুম! ঠিক আছে—চলো-একসঙ্গে কলকাতা পর্যন্ত তো যাই।

সুতরাং আবার কলকাতা। আবার সেই ন্যাশানাল থিয়েটার। দ্রৌপদীর ভূমিকার 'মেক-আপ' নিচ্ছে বিনোদিনী তার সাজঘরে বসে। দাসীটি ওর কাপড় চোপড় আলনায় গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললে,—তুমি ছিলে না দিদিমণি বিক্রিও কমে গিয়েছিল। আজ তুমি এসেছো, কাগজে খবর বেরিয়েছে,—আর অমনি দেখ, এক বাড়ি বিক্রি!

—সত্যি বলছিস!

—হ্যাঁ গো! মিথ্যে বলবো কেন! কতো লোক টিকিট না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে! আসলে, বাবুরা যাই বলুক, বিক্রি হয় তোমারই জন্য। তোমার নাম শুনে সমুদ্দুরের মতো লোকের ঢেউ যেন আছড়ে পড়ে!

—আর গিরিশবাবুর নাটক?

—হ্যাঁ—তা বলবো—বড়বাবুর নাটকের নাম হয় খুব! যেমন ওঁর অ্যাক্টো, তেমনি ওঁর নাটক! তার ওপর সোনায় সোহাগার মতো তুমি যখন পড়ো, তখন আর কথা নেই!

বিনোদিনী ওর কথার ঢং শুনে হেসে ওঠে। তারপরেই ঢোকে অমৃত মিত্র, ভীমের রূপসজ্জায়। বিনোদিনী বলে,—কী অমৃতদা, ভালো আছো তো সব?

অমৃত বলে,—তুমি যখন দ্রৌপদী, তখন ভীমের তো ভালো থাকবারই কথা। কিন্তু ভালো থাকতে দিচ্ছে কই ?

—কেন ?

—আমাদের সবারই ঘেন্না ধরে গেছে এই থিয়েটারে! আর একটা থিয়েটার যদি করতে পারতুম !

—কী ব্যাপার বলো তো ?

—এক বাড়ি বিক্রি—লোক থৈ থৈ করছে—সে কার দৌলতে ? নটিকুল সম্রাজ্ঞী বিনোদিনীর জন্যই তো ? কিন্তু সেই তোমাকেই ছুটির মাইনে দিতে চাইছে না প্রতাপ জহুরী? আমাদের সংগে দারুণ তর্কাতর্কি হয়ে গেল !

বিনোদিনীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। সে বললে,—জহুরীকে এখানে একবার ডেকে দিতে পারো ?

—কেন পারবো না ? ঐ তো গিরিশবাবুর ঘরে বসে বকবক করছে !

বিনোদিনী উঠে দাঁড়ালো। তার মাথায় তখন রাগ চড়ে গেছে! বললো, —তাহলে ডাকতে হবে না, আমিই যাচ্ছি। মাইনে দেবে না! মামদোবাজী পেয়েছে !

দ্রুত বেরিয়ে গেল বিনোদিনী, পিছনে পিছনে অমৃতলাল মিত্র।

গিরিশবাবুর ঘরে বসে প্রতাপ জহুরী তখন বলছিলেন,—না গিরিশবাবু —আপনি administration জানেন না! রাশ না টেনে ধরলে যে সোব আলগা হয়ে যাবে !

এই সময় ঘরে এসে ঢোকে বিনোদিনী। তার পিছনে ভীম-বেশী অমৃত মিত্র। বিনোদিনী তখন যাকে বলে 'রাগে আগুন!' সে প্রতাপ জহুরীকে বলে,—কেয়া শুনতা হ্যায়? আপ ছুটির মাসকা মাহিনা দেগা কি নেহী ?

প্রতাপ ওর মুখে হিন্দী শুনে নিজেও হিন্দীতে বলেন,—মাহিনা কেয়া ? তোম তো কাম নেহী কিয়া !

বিনোদিনী আরও রেগে গেল, বললে,—বটে! মাইনে দেবেন না! এই আমি চললাম।

বলে আর দাঁড়ায় না, সংগে সংগে চলে যায়। উদ্বিগ্ন হয়ে গিরিশচন্দ্র ডাকেন, —বিনোদ!—বিনোদ !

ওঁর কথা বিনোদিনীর কানে গেলেও সে দাঁড়ালো না, একেবারে চলে গেল থিয়েটারের বাইরে। বাইরে তার জুড়ি দাঁড়িয়েই থাকতো।

প্রতাপবাবু গিরিশবাবুকে বললেন,—দেখেন! দিমাক দেখেন! ঐ ছোকরা

কুমার বাহাদুর ওর মাথাটা খেয়ে নিয়েছে! আপনে দোসরা ছুকরি নিয়ে আজকের থিয়েটার চালিয়ে নেন।

গিরিশবাবু ক্ষুব্ধ। তিনি বললেন,—ভীমরতি হয়েছে আপনার! বিনোদিনীর জায়গায় অন্য কাউকে পাবলিক নেবে কেন? ইংরেজী কাগজগুলো দেখেন না? তাদের ভাষায় বিনোদিনী হচ্ছে Star of the Native Theatre! অমৃত, শিগগির গাড়ি ডাকাও—বিনোদিনীকে ধরে আনতে হবে! প্রতাপবাবুর মতো আমাদের তো আর মাথা খারাপ হয়নি!

অমৃত মিত্র তাড়াতাড়ি চলে যায় গাড়ির বন্দোবস্ত করতে।

বিনোদিনী ততক্ষণে পেঁাছে গেছে নিজের বাড়িতে! সেই হাতিবাগান অঞ্চলের বাড়িঃ ১৪৫ নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট। এখন হয়েছে দোতলা। বিনোদিনী সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে নিজের ঘরের ভেজানো দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে যায়। ওকে ঐভাবে আসতে দেখে, দিদিমাও পিছনে পিছনে আসেন। বলেন,—কী হলো রে?

—মা কোথায়?

—সে বাড়ি নেই। এক জায়গায় গেছে। তুই যে বড়ো ফিরে এলি?

—ও-থিয়েটারের মাথায় লাথি মেরে চলে এসেছি! আর যাবো না!

—বলিস কী! থিয়েটার হচ্ছে আমাদের লক্ষ্মী!

এই সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে দিদিমা সচকিত হন। বলে ওঠেন,—এই দেখ—কারা আসছে!

বলে তিনি নিজে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যান।

বিনোদিনী ঝংকার দিয়ে বলে,-কারা আবার! নিশ্চয়ই ঐ মুখপোড়া জহুরীর লোক। ওঃ! এই সময় ঐ লোকটি যদি দেশে না গিয়ে এখানে থাকতো!

কিন্তু যাঁরা এলেন, তাঁরা মুখপোড়া জহুরীর লোক নন, স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ও অমৃত মিত্র। ওঁরা যে এই সময় আসবেন বিনোদিনী তা ভাবতে পারেনি। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। গিরিশবাবু বললেন,—বিনোদ! ফিরে চলো। যারা ভিড় করে তোমাকে দেখতে এসেছে, তাদের কেন নিরাশ করবে? তারা তো কোনো অপরাধ করে নি?

বিনোদিনী বললে, জানি। কিন্তু তবু যাবো না। ঐ জহুরী আমাকে অপমান করেছে!

দিদিমা ওর কথা শুনে অপ্রতিভ হয়েছিলেন, বলে উঠলেন, ছিঃ বিনি! গিরিশবাবু নিজে এসেছেন, আর কি তোর অভিমান সাজে?

বিনোদিনী উত্তর দিলো—থিয়েটারটা তো আর গিরিশবাবুর নয়! শুনুন,

আপনি ওকে গিয়ে বলুন, আমি বেশি মাইনে চাই, আর যে টাকা বাকি পড়েছে তা চুক্তি করে চাই, নইলে কাজ করবো না !

অমৃত মিত্র বললে, দেখো বিনোদ, এখন গোল করো না, একজন নতুন থিয়েটার করতে চায়, যত টাকা খরচ করতে হয়, সে করবে ! এখন দিন কতক চুপ করে থাকো। দেখা যাক কতদূর কী হয়।

বিনোদিনী গিরিশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, আপনারও কি এই আদেশ ?

গিরিশবাবু বললেন,—বিনোদ, রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশিরাশি, আশার নেশায় করি জীবন যাপন ! আমি বলি কী, থিয়েটারে চলো। বেরুতে হয় একসঙ্গে বেরিয়ে আসবো ! কী বলো অমৃত ?

—নিশ্চয়।

বিনোদিনী বললে, চলুন।

ওরা রওনা হলো, বিনোদিনীর দিদিমাও নিশ্চিন্ত হলেন।

ন্যাশানাল থিয়েটারের পর্দা যথারীতি অপসারিত হলো। দেখতে দেখতে দ্রৌপদীর অপমানের দৃশ্যও পার হয়ে গেল। দেখা গেল বৃহন্নলা-রূপী অর্জুনকে। অর্জুনের ভূমিকায় তখন নামতেন মহেন্দ্রলাল বসু। তিনি বৃহন্নলার রূপে তখন একা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলছিলেন,

দিবাকর পল বহে যুগ সম ! দেখ বেশ, দেখ দীর্ঘবেণী
হের আভরণ, দ্রৌপদীর অপমান জীবিত থাকিতে !

এই সময় মঞ্চে ছুটে আসে বিনোদিনী দ্রৌপদীর রূপসজ্জায় :

সর্বনাশ হয় মৎস্যদেশে ! পিতামহ-চালিত কৌরব সেনাগণে বেড়িয়াছে
মৎস্যের গোধন !

অর্জুন সখেদে বলতে থাকেন : কত কহ পাঞ্চালি আমায় ! হের দীর্ঘ
বেণী, শঙ্খের বলয় ! আমি ধনঞ্জয়, কী
হেতু প্রত্যয় করো ?

দ্রৌপদী ॥ হে গাণ্ডীবি। ভয়ার্তেরে অভয় দানিতে সংকোচ কী হেতু তব !

অর্জুন ॥ কিন্তু হবে প্রকাশ সকলই !

দ্রৌপদী ॥ ফুরায়েছে দিন। নহে ক্লীব সনে নাহি কহি কথা !

অর্জুন (চাপা উল্লাসে) ॥ ফুরায়েছে দিন ! রাখিব গোধন আজি তোমার
বচনে। কিন্তু কেহ সমরে না বরে মোরে !

দ্রৌপদী ॥ বরিবে উত্তর তোমা সারথী করিয়ে ! রণে যাও তারে লয়ে !
জয় তব হইবে নিশ্চয় !

অর্জুন প্রস্থান করেন উদ্দীপিত হয়ে। দ্রৌপদী তাকিয়ে দেখে।

সেই রাত্রেরই ঘটনা। বিনোদিনীর বাড়ি। গায়ে একখানা চাদর, বিনোদিনীর মা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন, সিঁড়ির কাছে উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন লণ্ঠন হাতে—বিনোদিনীর দিদিমা। মেয়ের একটা খবর পেয়েই নিজে ছুটে গিয়েছিলেন. যে-কথা বিনোদিনী ঘুনাক্ষরেও জানতে পারে নি। দিদিমা বললেন, কী লো, বাড়ি খুঁজে পেয়েছিলি তো ?

বিনোদিনীর মা বললেন. পাবো না কেন ! কলকাতায় কুমার বাহাদুরদের কাছারী বাড়ি কে না চেনে ?

—তারপর ?

বিনোদিনীর মা বললেন,—দেখা হলো সরকার মশাইয়ের সঙ্গে ! তিনি কী কাজে এসেছেন, আবার এখ্খুনি দেশের বাড়িতে ফিরে যাবেন।

—কিন্তু, কী শুনে এলি ? খবরটা কি সত্যি ?

—হ্যাঁ মা, সত্যি। বিনির আমার কপাল সত্যিই পুড়েছে !

দিদিমা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপরে বললেন, আমি তখনই বলেছিলুম এ আলো নয়, আলেয়া !

বিনোদিনীর মা অবসন্ন হয়ে বসে পড়লেন, বললেন. অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা পাচ্ছে, বুঝলে না ? কনেও বিরাট জমিদারের মেয়ে, বাপের এক সন্তান। তার ওপর সুন্দরী। লোভ কি ছাড়তে পারে ? বাপের কথায় সংগে সংগে বিয়ের পিঁড়িতে বসে গেছে !

কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্যি। কুমার বাহাদুরের দেশের বাড়ির অঞ্চলে কনের বাপের বাড়িতে মহাসমরোহে সপ্তপদী হচ্ছে। কুমার বাহাদুরের মাথায় টোপর, গায়ে গরদের পাঞ্জাবী আর ফুলের মালা, গায়ে চাদর। সেই চাদরের খুঁটের সঙ্গে বাঁধা প'ড়েছে পরমাসুন্দরী কন্যার লাল বেনারসীর আঁচল। নববিবাহিত কুমার বাহাদুর চাদরে বাঁধা কনেকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করছেন !

এ-খবর চাপা থাকে না। বিনোদিনী তার ঘরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। কাছেই দাঁড়িয়ে তার মা আর দিদিমা। মা বলেন, কেঁদে আর কী করবি বল্ ? এ আমাদের ভাগ্য !

দিদিমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, ভাগ্য ছাড়া আর কী !

বিনোদিনী অশ্রুপ্লাবিত মুখখানা তুলে ওদের বললে, তোমরা যাও। আমাকে এখন একটু একা থাকতে দাও—একা থাকতে দাও।

বিছানায় প'ড়ে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। মা—দিদিমা সরে আসেন।

ওদিকে বৃথা কালক্ষেপ না করে অমৃত বসু আর অমৃত মিত্র সেই জি, মুসাদ্দির গদিতে গিয়ে হাজির হয়েছেন। এই মুসাদ্দি তারপরে মঞ্চের ভিতরে

এসে এঁদের সঙ্গে রীতিমত ভাব জমিয়ে নিয়েছিলেন। তারই জের টেনে এঁরা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন আর কী!

এই জি-মুসাদ্দির পুরো নাম,—গুরমুখ রায় মুসাদ্দি—রীতিমত সুপুরুষ তরুণ বয়স, বিনোদিনীর থেকে এক বছরের ছোট। (জন্মঃ ১৮৬৪ সাল)। এঁরা মাড়োয়ারী। দেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁর নায়িকা ও নাটমঞ্চ—বইতে লিখেছেন, 'গুরমুখের পিতা গনেশদাস মুসাদ্দি ছিলেন হোরমিলার কোম্পানীর বেনিয়ান। গনেশদাস ব্যবসা করে প্রচুর বিত্ত-সম্পদের অধিকারী হন। ২৫ নং বড়তলা স্ট্রীটে (বড়বাজার) বিরাট অট্টালিকা তৈরি করেন। এখনো এই গৃহটি গনেশদাসের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। গুরমুখের মায়ের নাম রূপা দেবী। রূপাদেবী অত্যন্ত পুণ্যবতী ও দানলীলা মহিলা ছিলেন। গুরমুখের বয়স যখন আঠারো বছর, সেই সময় গণেশদাস ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর পূর্বেই গুরমুখ লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এঁরা মাড়োয়ারী হলেও জৈন সম্প্রদায়ের লোক নন। বৈষ্ণব।'

আরও জানা যায়, গণেশদাস গত হবার পর তাঁর প্রতিবেশী ও বন্ধু সুরজমল ঝুনঝুনওয়ালা (তুলসান) গুরমুখের অভিভাবকরূপে গনেশদাসের বিষয় সম্পত্তি দেখা শোনা করেন। এই সুরজমল ছিলেন পরম ধার্মিক ও দাতা। ঋষিকেশ ছাড়িয়ে গঙ্গার ওপর যে সুবিখ্যাত সুদৃশ্য 'লছমনঝুলা'-টিকে আমরা দেখি, সেটি ইনিই নিজের অর্থে তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন।

পিতৃহীন গুরমুখের ওপর তাঁর স্নেহ ছিল অপরিসীম। যখনই গুরমুখ টাকা চাইতেন, ইনি দিতে কার্পণ্য করতেন না। দেবনারায়ণবাবু লিখেছেন,—এইভাবে কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে গুরমুখ বিপদগামী হয়ে ওঠেন। যার ফলে, ন্যাশানাল থিয়েটারে টিকিট কেটে বিনোদিনীকে দেখতে যাওয়া তার একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এ হেন গুরমুখের সঙ্গে দেখা করতে সেদিন এসেছিলেন দুই অমৃতবাবু, মিত্র ও বসু। গুরমুখ ওদের প্রস্তাব শুনে বললে,— হাঁ, করেন নতুন থিয়েটার —আমি সব খরচা দিবো—লেকিন—বিনোদিনীকে আমার হাঁথে তুলে দিতে হোবে—বিনোদিনীকে আমার চাই!

কথা শুনে অমৃতবাবুরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করেন। বড়ো আশা করে ওঁরা এসেছিলেন, ওঁদের বাড়া ভাতে যেন ছাই পড়লো! পাংশুমুখে অমৃত বসু বললেন,—কিন্তু বিনোদ—

ওর কথা শেষ না হতেই গুরমুখ বলে উঠলো,-না-অমৃতবাবু—বিনোদ নেই তো থিয়েটার নেই! এ আমার সাফ কথা আছে! আমার নাম

গুরুমুখ রায় মুসাদ্দি—আপনেদের লোকে আমাকে গুর্মুখ রায়—গুর্মুখ রায় বোলে! আমার কথার কখনো নড়চড় হোবে না—হাঁ!

ওঁরা নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন।

তারপরে বৈঠক বসলো বিনোদিনীর বাড়িতে বিনোদিনীর ঘরে। ঐ দুই অমৃত তো ছিলেনই, আর ছিলেন গিরিশবাবু। বিনোদিনী শুনছিল ওঁদের কথা। অমৃতলাল বসু বলছিলেন, গুরমুখ এক কথার মানুষ। যা বুঝলুম ওকে সংকল্প থেকে টলানো যাবে না।

অমৃত মিত্র বললে,—ওদিকে জহুরীর থিয়েটারে আর তিষ্ঠানো যাচ্ছে না! এতো পয়সা পাচ্ছে, আঙুল ফুলে একে বারে কলাগাছ! কারুর এক পয়সা মাইনে বাড়াবে না! তাই বলছিলাম—

বিনোদিনী বললে,—তাই বলছিলে একজনকে ছেড়ে আর একজনের কণ্ঠলগ্ন হতে! ছিঃ!

অমৃত মিত্র বললে—একশোবার 'ছিঃ' বিনোদ, একশোবার 'ছিঃ!' তবু বলছি কেন জানো? থিয়েটারের স্বার্থে।

তারপরে গিরিশবাবুকে দেখিয়ে বললে,—আর এই মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে। জহুরী আজকাল ওঁরও সম্মান রাখছে না!

বিনোদিনী গিরিশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে—সত্যি!

গিরিশবাবু বললেন,—হ্যাঁ বিনোদ—আজ পারলে আজই আমার ওখান থেকে সরে আসা উচিত। তার ওপর সংসারে চলেছে ঝঞ্ঝাটের ওপর ঝঞ্ঝাট! স্ত্রী কঠিন অসুখে বিছানা নিয়েছে। কিন্তু থাক আমার কথা, যে-কথা হচ্ছিল, তারই মীমাংসা হোক। বিনোদ, একটা কথাই বলবো: এ রকম কি হয় না?

বিনোদিনী বললে—হয়। অস্বীকার করছি না—আমরা বারাঙ্গনা—আমাদের জীবনে এটা হবে না কেন? কিন্তু—আপনাকেই বলি—আমার মন যে সায় দিচ্ছে না! আমি যে তাকে সত্যি সত্যি—

আর বলতে পারে না সে, উচ্ছ্বসিত কান্নায় তার কণ্ঠরোধ হয়ে যায়, সে ছুটে চলে যায় অন্য ঘরে।

ওঁরা তিনজন চুপচাপ, মুখে কোনো কথা নেই। ধীরে ধীরে উঠে ওঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন। সিঁড়ির সব গুলো ধাপ শেষ হবার পর ওঁরা যখন বাইরের দিকে পা বাড়ালেন, তখন নীরবতা ভঙ্গ করলো অমৃত মিত্রই প্রথম, বললে—তাহলে কী হবে? আবার কী গুটি গুটি কাল থিয়েটারে ফিরে যাবো?

গিরিশবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন,—না। ওখানে ষড়যন্ত্র চলছে। নইলে প্রতাপ জহুরী এতো সাহস পায় কী করে? ও কারুরই মাইনে

বাড়াবে না বলেছে আমার মুখের ওপরে। তাই, আমরাও যাবো না। চালাক দেখি—ও কাকে নিয়ে থিয়েটার চালাবে—চালাক!

অমৃতমিত্র বললে,—তাহলে তো গুরুমুখ ছাড়া আমাদের আর গতি নেই!

অমৃত বসু বললেন,—কিন্তু তার আবার এক কথা, বিনোদিনীকে তার চাই। তাকে না পেলে সে থিয়েটার করবে না!

অমৃত মিত্র বললে,—কিন্তু বিনোদ তো রাজী হচ্ছে না!

গিরিশবাবু বললেন,—এখানেই তো বিনোদের মহত্ব! এখানেই ও নিজেকে নিজে অতিক্রম করে গেছে! কাব্য করে বলতে হলে বলতে হয়, আমার 'সীতা' আজ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ!

পরদিন সকালবেলা। বিনোদিনীর ঘরে বিনোদিনীকে তখনো বোঝাবার চেষ্টা করছেন ওর দিদিমা। বলছেন,—দেখ—আমি একটা কথা সোজাসুজি বুঝি। কেউ যদি আমাকে ঠকায়, তো, তাকে ঠকাতে আমাদের দোষ কী? সব থেকে বড়ো কথা, একটা থিয়েটার হবে, পাঁচটা লোক করে খাবে!

বিনোদিনী চুপ করে থাকে, কোনো উত্তর দেয় না। এমন সময় ঘরে আসেন বিনোদিনীর মা, বলেন, ও বিনি, গিরিশবাবু আসছেন।

বিনোদিনী আঁচল টেনে ঠিকঠাক করতে করতে খাট থেকে নিচে নামে। দিদিমা সরে আসেন। ঘরে ঢোকেন গিরিশবাবু। তাঁকে দেখে দিদিমা বলেন, আসুন বাবা, সেই থেকে বোঝাচ্ছি, কিছুতেই বুঝতে চাইছে না!

গিরিশবাবু বলেন,—আমি কিন্তু কিছু বোঝাতে আসি নি। একটা কথাই আমি শুধু বলতে এসেছি, জহুরীর থিয়েটার আমরা বয়কট করেছি। ওখানে আর যাবো না।

দিদিমা উদ্বিগ্ন হন কথাটা শুনে। বলেন,—তাহলে তো বিনিরও থিয়েটার বন্ধ!

গিরিশবাবু মন্তব্য করলেন, সে কথা বিনিই জানে!

বিনোদিনী বলে ওঠে, আপনিও জানেন। গুরু যেখানে নেই শিষ্যাও সেখানে নেই। বসুন!

গিরিশবাবু চেয়ারে বসেন। দিদিমা ও মা ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

গিরিশবাবু বলেন, গুরু শিষ্যা না বলে বন্ধুও বলতে পারো। সংসারের পথে চলতে চলতে এক এক করে কতো ধাক্কা খেয়েছি, একের পর এক কম মৃত্যুও দেখলুম না, সব সুখদুঃখের কথাই তোমাকে বলতুম! আমার এখন ঠিক সেই-রকম একটা মুহূর্ত, জানো?

বিনোদিনী এগিয়ে গিয়ে ওঁর পায়ের কাছে বসে পড়ে। গিরিশচন্দ্রের লেখক-

সত্তার এই বহিঃপ্রকাশ তার চিরদিন ভালো লাগে। সে আগ্রহভরে তাই বলে উঠলো, বলুন?

গিরিশবাবু বলতে লাগলেন, বিনোদ, কিছুদিন ধরে আমার কিছুই ভালো লাগছে না। সেই যে তুমি যখন কাশীতে, তখন আমার কলেরা হয়, বাঁচবো সে আশা ছিল না! হঠাৎ স্বপ্ন দেখলুম আমার স্বর্গগতা মাকে। মা যেন কী একটা ওষুধ আমাকে খাইয়ে দিলে। আর দেখো, সত্যি সত্যি আমি বেঁচে উঠলুম! সেই থেকে—তোমাকে চুপিচুপি বলছি বিনোদ—যে গিরিশ ঘোষকে লোকে নাস্তিক বলে জানে, সেই গিরিশ ঘোষ লুকিয়ে লুকিয়ে কালীঘাটে যায় —হাঁড়ি কাঠের কাছে দাঁড়িয়ে 'মা-মা' করে কাঁদে!

বিনোদিনী অভিভূত। সে বলে,—আপনি বলুন। আপনার এই সব কথা শুনতে আমার চিরকালই ভীষণ ভালো লাগে!

—দক্ষিণেশ্বরে এক পাগল ঠাকুর আছে জানো? রামকৃষ্ণ ঠাকুর?

—হ্যাঁ। একটু একটু শুনেছি।

—এক একবার ভাবি, যাবো নাকি তাঁর কাছে—যদি এই ক্ষতবিক্ষত অশান্ত মনটা কিছু শান্তি পায়! পরক্ষণেই ক্ষেপে উঠি,—দূর-দূর! পাপী তাপী লোক আমরা! আমরা যাবো তাঁর কাছে! বড়ো অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিনোদ, বড়ো অন্তর্দ্বন্দ্ব! থিয়েটারটা ছিল, নাটক লিখে টিখে একরকম ছিলুম—কিন্তু এখন থিয়েটার নেই—সব যেন ফাঁকা!—সেই কান্নাটা আবার চেপে চেপে বসছে! ঘুমোতে পারি নি কাল রাত্রে! সকাল হলে মনে হলো কার কাছে যাই? কে যেন পথ দেখিয়ে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে এলো! কেন, কে জানে!

কথাগুলো শুনতে শুনতে বিনোদিনীর চোখে জল এসে পড়লো। সে উঠলো, মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে গিয়ে খাটের বাজু ধরে দাঁড়ালো। তার পরে নিজেকে সামলে, চোখ মুছে গিরিশবাবুর কাছে সরে এলো, বললো,—আপনি ওদের গিয়ে বলুন—আমি রাজী। কিন্তু থিয়েটার আমার চাই!

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন গিরিশবাবু, বললেন, বিশ্বাস করো বিনোদ আমার মায়ের নাম নিয়ে বলছি—আমি সেজন্য তোমার কাছে আসি নি—আমি এসেছিলাম—

বিনোদিনীর চোখ তখনো সজল। সে বললো,—আমি জানি। আপনার এই চেহারাটাকে যে দেখেছে, সে শ্রদ্ধায় ঐ পায়ে মাথা না লুটিয়ে পারে না! আপনি ঐ যে ঠাকুরের নাম বললেন, তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা, তিনি যেন আপনার এই চেহারাটাকে দিনদিন আরও উজ্জ্বল করে তোলেন!

—বিনোদ!

চোখ মুছতে মুছতে বিনোদিনী বললে,—আপনি বসুন, আমি মাকে একটা কথা বলে এখুনি আসছি।

বলে, ঘরে থেকে বেরিয়ে যায়।

ঘরের বাইরে বারান্দায় উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিনোদিনীর মা। দিদিমাও থাকতেন, কিন্তু তিনি তখন রান্নাঘরে, গিরিশবাবুর জন্য কিছু জলখাবারের আয়োজনে ব্যস্ত। বিনোদিনী বাইরে বেরিয়ে তার মাকে বললো, —মা, তুমি ওদের কাছে খবর পাঠাও। আমি রাজী। কিন্তু থিয়েটার আমার চাই—এখুনি চাই!

বিনোদিনীর মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। এবং অচিরেই খবর গেল গুরমুখের কাছে। গুরমুখ আর দেরি করলো না, পরদিন বেলা থাকতে থাকতেই অমৃতলাল বসুর সঙ্গে চলে এলো একেবারে বিনোদিনীর বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, পায়ের শব্দ শুনে বিনোদিনীর মা এসে দাঁড়ালেন সিঁড়ির মাথায়। হাসি মুখে অভ্যর্থনা করলেন, আসুন বাবা—আসুন।

গুরমুখও হাসিমুখে মাথা নাড়লো। অমৃত বসু নিচু গলায় বললেন, বিনোদিনীর মা।

গুরমুখ বললে, সে আমি বুঝেছি। নমস্কার।

বিনোদিনীর মা বললেন,—নমস্কার বাবা নমস্কার। আসুন। বিনোদ ঘরেই আছে।

বিনোদিনী ওদের আবির্ভাব আদৌ টের পায় নি। সে তখন তার টেবিল হারমোনিয়ামের সামনে বসে তন্ময় হয়ে গাইছিল তখনকার একটি প্রচলিত (শ্রীধর কথকের লেখা) গান:

যাবত জীবন রবে কারেও ভালবাসিব না!
ভালোবেসে এই হলো, ভালোবেসে কী লাঞ্ছনা!
আমি ভালোবাসি যারে—সে কভু ভাবে না মোরে—
তবে কেন তারি তরে নিয়ত পাই এ-যন্ত্রণা!

অমৃতবাবু গুরমুখকে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছিলেন। বিনোদিনী দেখতে পায় নি। অমৃত বসু বলতে গেলেন,—বিনোদ?

গুরমুখ তাড়াতাড়ি ওঁর মুখে হাত চাপা দিলো,—অর্থাৎ চুপ। গানটা শুনতে দিন।

কিন্তু 'বিনোদ' ডাকটা বিনোদিনীর কানে গিয়েছিল, সে গান থামিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে উঠতে উঠতে বললে,—আসুন?

গুরমুখ বললে,—না বিনোদবিবি—আগে গানটা হোক—কথা হোবে পরে!

বলে নিজেই চেয়ারে বসলো। বিনোদিনীর মুখে ফুটে উঠলো বিচিত্র

হাসি। সে টুলে আবার বসে প'ড়ে টেবিল-হারমনিয়াম বাজিয়ে গান শুরু করলো :

ভালোবাসা ভুলে যাবো—মনেরে বুঝাইব—
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারেও ভালোবাসে না !

গানের বাণী গুরমুখ তেমন বুঝছিল না, যিনি বুঝছিলেন তিনি অমৃতলাল বসু। তিনি তাই বসতে গিয়েও বসেন নি। তাঁর চোখ সজল হয়ে আসছিল, বিশেষ করে শেষ পংক্তিটি তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। চোখের জল সামলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বিনোদিনীর চোখও শুষ্ক ছিল না, সে মুখ নিচু করলো, গানও থেমে গেল হঠাৎ। গুরমুখ এসব কিছু লক্ষ্য করে নি, সে গান শুনেই খুশি। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে ওর কাছে গেল, বললে,—বাঃ! বহুৎ খুব !

বিনোদ নিশ্চুপে উঠে এলো। গুরমুখ বললে,—ভালবাসার গান আমার বহুৎ ভালো লাগে !

ওদের দুজনের পিছনে সেই বস্ত্রহরণের পটটা দেখা যায়! গোপিনীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে বস্ত্রের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন।

গুরমুখ বললে,—কেমন করে, প্রাণ ঢেলে এমন ভালবাসার গান তুমি গাইতে পারো বিনোদ! আমি তোমার কাছ থেকে ভালবাসার গানও চাই, আওর—ভালবাসাও চাই !

বলতে বলতে ওর হাতখানা ধরে। সে স্পর্শে চমকে উঠলো বিনোদিনী তার সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। চোখও উঠলো ছলছল করে।

—বিনোদ !

নিজেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে বিনোদিনী তার পালঙ্কের কাছে চলে যায়। একটা ছত্রিকে অবলম্বন করে ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। নিজেকে সামলাতে থাকে। 'আমি রাজী'—এ কথা ঘোষণা করা সত্বেও তার মনপ্রাণ রাজী হতে চায় না! এ কী জ্বালা !

গুরমুখ আস্তে করে বলে—আমার কথার জবাব ?

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ায় বিনোদিনী। কণ্ঠে জোর এনে বলে ওঠে,—আমার থিয়েটার ?

—জরুর হোবে। আমার জবান একটাই। থিয়েটার হোবে—তোমার নামেই হোবে—বিনোদিনী থিয়েটার—ইয়ানে-বি-থিয়েটার।

বিনোদিনী ওর দিকে তাকায়,—বি-থিয়েটার ! তুমি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছো না তো গুরমুখ রায় !

গুরমুখ আবার ওর হাত ধরে,—না পিয়ারী—না! দেখো তুমি

—কেতো জলদি জলদি আমি থিয়েটার বানাই। ওদিকে চলবে গিরিশবাবুর রিহার্স্যাল, আর এদিকে চলবে আমাদের থিয়েটারের বাড়ি তৈরি। দুনিয়া উলটে যাবে, তবু আমার কথার নড়চড় হোবে না। লেকিন তুমিও সাথ সাথ বোলো—তুমিও আমার হোবে?

বিনোদিনী একথা শুনে দেহটা সোজা করে দাঁড়িয়ে মুখটা উঁচুতে তোলে। তারপর অদ্ভুত এক ধরনের গলায় বলতে থাকে, যার মধ্যে এক বিন্দুও আবেগ নেই।

: নাও আমাকে গুরমুখ—নাও আমাকে! কিন্তু বি-থিয়েটার? বি থিয়েটার আমার চাই। লোকে দলে দলে আসবে—বলবে—বি-থিয়েটার! আর কিছু না পাই—আমার নামটা তো পাবো! সেটাই আমার গৌরব!

ওর বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় ধীরে ধীরে গুরমুখ ওর দেহটাকে সামনের দিক থেকে দু-হাত আঁকড়ে ধরে নিচু হয়ে বসেছে। ওর বুকের কাছ বরাবর গুরমুখের মুখ! সে তৃপ্তির সুরে বলতে থাকে—আমি জবান দিলাম—জবান দিলাম!

বেশ কিছুদিন পরের কথা। কুমার বাহাদুর দেশে থাকতেই এ-খবর পান। পেয়ে সব ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। বনেদী জমিদারের ছেলে, সব-কিছু নিজের অধীনে রাখাতেই ওঁদের উল্লাস! 'আমার অধিকার' থেকে অন্য কেউ আমার 'গ্রাস' ছিনিয়ে নেবে,' এটা অসহ্য ওঁদের কাছে। বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু তার মুখে "আর এখানে এসো না, আমি অন্য লোকের"—এ-কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বিনোদিনীর কান্নাভরা কণ্ঠস্বর শুনে বা তার চোখের জল দেখেও তিনি—এই কথার অন্তর্নিহিত বেদনা অনুভব করতে পারেন না। একে 'প্রত্যাখ্যান' মনে করে ওকে শাসিয়ে যান। এ-কথা শুনে গুরমুখ দারোয়ান বসায় বিনোদিনীর বাড়িতে। কিন্তু কী করবে দারোয়ান? ক্ষিপ্ত কুমার বাহাদুর দেশ থেকে লাঠিয়াল এনে এক গভীর রাত্রে বাড়ি ঘেরাও করেন, উদ্দেশ্য বিনোদিনীকে লুট করে নিয়ে যাওয়া! দারোয়ান একা কী করবে? সে খিড়কি দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে গুরমুখকে খবর দেয়। জুড়ি হাঁকিয়ে লোক জন নিয়ে ছুটে আসে গুরমুখ। ওদিকে পাড়াপড়শীরা জানতে পেরে পুলিশে সংবাদ দেয়। পুলিশও ছুটে আসে। ব্যাপারটা আর একটু হলে দাঙ্গার রূপ নিতো! খুবই বেঁচে গেছে বিনোদিনী। কিন্তু আবার যদি হামলা হয়? গুরমুখ গিরিশবাবুদের পরামর্শে বিনোদিনীকে বাইরে—রাণীগঞ্জে পাঠিয়ে দেয়। কুমার-বাহাদুর অনেক কাণ্ড করেও এ খোঁজ পায় না! পায় না বলে তার আক্রোশ বাড়তে থাকে। কিন্তু কতদিন থাকা যায় থিয়েটার ছেড়ে? বেশ

কিছুদিন রাণীগঞ্জে কাটিয়ে ফিরে আসে বিনোদিনী। আবার প্লাকার্ড পড়লো, —বিনোদিনী সুস্থ হয়ে আবার ফিরে এসেছেন, ইত্যাদি।

সেদিন সেকেলে এক ঘোড়ায় টানা টমটম গাড়িতে করে বেড়াতে বার হয়েছিলেন রাঙাবাবু তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধু বললে,—আচ্ছা রাঙাবাবু, বিনোদিনীর সঙ্গে তোমার কখনো সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল?

—হয়েছিল বই কী? ন্যাশানাল থিয়েটারের গ্রীনরুমে সেদিন নিজে নিয়ে গিয়েছিলাম লাল গোলাপের তোড়া! ঐ গোলাপই আমার প্রতীক। ও ঠিক চিনতে পেরেছিল।

—সেই বিনোদিনীর খবর এখন কিছু রাখো?

—ওর সব খবরই আমি রাখি।

—সেই কুমার বাহাদুর সব শুনে খাপ্পা হয়ে গিয়ে দেশ থেকে লেঠেল এনে বিনোদিনীকে লুট করবার চেষ্টা করেছিল জানো?

—জানি বই কী! গুরুমুখ সেই লেঠেলদের রোখবার জন্য নিজের পোষা গুণ্ডা নিয়ে এসেছিল।

—ওঃ! কী কেলেঙ্কারী কাণ্ড!

—নাঃ! গুরুমুখের রোখ আছে! ৬৮ নম্বর বীডন স্ট্রীটে বাগবাজারের প্রখ্যাত কীর্তি মিত্রের জমি লীজ নিয়ে দেখতে দেখতে থিয়েটার-বাড়ি বানিয়ে ফেললো! এখন থিয়েটারের নাম কী হবে তাই নিয়ে বিভ্রাট বেঁধে গেছে!

—কেন? বি-থিয়েটার?

—কিন্তু বিনোদিনীর সহকর্মী বন্ধুরা তা হতে দিচ্ছে কই? এখন তাদের হঠাৎ মনে পড়েছে বিনোদিনী বারাঙ্গনা। আর বারাঙ্গনার নামে থিয়েটার হলে দেশ রসাতলে যাবে, কেউ থিয়েটার দেখতে আসবে না—মেয়েরা তো নয়ই!

বন্ধু চুপ করে রইলো, শুনে সে 'হ্যাঁ'—'না'—কিছুই বললো না! গাড়ি চলতে লাগলো।

গুরুমুখ-নির্মিত নতুন থিয়েটারের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। কাছেই একটা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে রিহার্স্যালের জন্য। সেখানে চুটিয়ে রিহার্স্যাল হয়—খাওয়া-নাওয়ার জ্ঞান থাকে না কারুর! সেখানকার কাজ শেষ হলে সবাই পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি চলে যায়, যায় না কেবল বিনোদিনী। একদিন গুরুমুখ এসে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করে, মজুরাণীদের সঙ্গে মাথায় তাদের মতো বিড়ে বসিয়ে মাটি বয়ে বয়ে এনে স্টেজের মাটি ভরাট করছে বিনোদিনী স্বয়ং! দেখে, নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না গুরুমুখ। সে অবাক হয়ে যায়। তারপরে বিনোদিনীর কাছে গিয়ে বলে,—একী! তুমি মজদুরদের সাথে নিজে টুকরিতে করে মাটি নিয়ে এসে ভিতের উপর ফেলছো!!

বিনোদ একটু হেসে বললে,—বা রে! তাতে কী হয়েছে! আমার নিজের থিয়েটার, নিজে কাজ করবো না!

—ওদিকে ও-বাড়িতে গিরিশবাবুদের সাথ রিহার্স্যালে সমানে খাটছো। তার উপর থিয়েটারে এসে হাতে হাতে কাজ করছো! কাদের জন্য করছো?

—কেন?

—বিনোদ, এ থিয়েটার আমি চাই না। এ থিয়েটার আমি জ্বালিয়ে দেবো! তুমি তার বদলে আমার কাছ থেকে পঁচাশ হাজার টাকা নাও! কম নয় টাকাটা! সারা জিন্দগী তোমাকে ভাবতে হোবে না!

বিনোদিনী একটু অবাক হয়ে বললে,—কী বললে? পঞ্চাশ হাজার টাকা! হ্যাঁ, আমার মা তো টাকাই চাইছিল। দেবে ঐ টাকা?

—আলবাৎ দেবো!

বিনোদিনী বললে;—না রায়, আমি টাকা চাই না, আমি চাই থিয়েটার আমার বি-থিয়েটার!

গুরমুখ ক্ষুব্ধ হয়ে উত্তর দিলো, লেকিন ওরা ঐ নামে নাম রেজেস্টি করেনি বিনোদ, করেছে ষ্টার থিয়েটার!

—কী বললে?

—হ্যাঁ বিনোদ—ষ্টার থিয়েটার!

বিনোদিনী হতাশ হয়ে বসে পড়ে।

বিনোদিনীর মনোবেদনা অমূলক নয়। সেজন্য গিরিশবাবু চলে আসেন বিনোদিনীর বাড়িতে। বিনোদিনী ও বিনোদিনীর মাকে তিনি বোঝাতে থাকেন,—বিনোদিনী তো আমাদের ষ্টার অ্যাকট্রেস, তাই ওর নামেই পরোক্ষে 'ষ্টার থিয়েটার' রাখা হয়েছে। গুরমুখ বাবুকে জানিয়েই করা হয়েছে। কিন্তু ছেলেমানুষ তো, তখন অতটা বুঝতে পারেনি, এখন ক্ষেপে গেছে। বলছে বিনোদিনীর কাছে আমার কথার খেলাপ হয়েছে, তাই আমি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ওকে আমি ষ্টার থিয়েটারের মালিক করে দিতে চাই।

বিনোদিনীর মা বললেন,—তা মন্দ কী?

গিরিশবাবু বললেন, বিনোদের মা, ওসব ঝঞ্ঝাটে তোমাদের কাজ নেই। তোমরা স্ত্রীলোক, অত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে পারবে না। আমিই পারিনি! আমরা অভিনয় করবো—নাট্যলক্ষ্মীর সেবা করবো, মালিক হবো না। এটা আমারও প্রতিজ্ঞা। মালিক হওয়া সোজা নাকি? হাজারো ঝঞ্ঝাট! উকিলরে মোক্তাররে—মামলা-মোকদ্দমা—এটা সেটা লেগেই থাকে!

বিনোদিনীর মা মেয়েকে বলেন, ওলো, ওঁর কথা শোন্—ওঁর থেকে বড়ো হিতৈষী আমাদের কেউ নেই!

বলে, তিনি অন্য কাজে চলে যান।

গিরিশবাবু বলেন, বিনোদ, আর কিছু না হোক—তোমার দয়ায় একটা থিয়েটার তো হলো! কী, কথা বলছো না যে?

বিনোদিনী বলে, যে নাটক দিয়ে স্টার থিয়েটার শুরু হবে বলে রিহার্স্যাল দিচ্ছেন সেই নাটকের শেষ দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে। আপনার 'দক্ষযজ্ঞ' পতির নিন্দা সইতে না পেরে সতী যেখানে আত্মাহুতি দিচ্ছে, সেখানকার কথাগুলি মনে পড়ছে! আপনিই বলুন, আজ যা হলো, তা আমার আত্মাহুতি ছাড়া আর কী!

বলে, কান্নায় ভেঙে পড়ে মুখে হাত চাপা দেয়।

গিরিশবাবু ওর কাছ থেকে সরে আসেন। কিন্তু ওর অন্তর্বেদনা ও'র অন্তরে আলোড়ন তোলে। তিনি এর পর থেকে মনপ্রাণ ঢেলে বিনোদিনীকে গড়ে তুলতে থাকেন। কিন্তু সহজেই কি ভুলতে পেরেছিল বিনোদিনী তার এই বঞ্চনাকে? বারাঙ্গনা-জীবনের আত্মগ্লানিই তাকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছিল। থিয়েটারের মালিকানা নেওয়া বা নিজের নামে থিয়েটার হওয়া এ সবই ছিল তার সেই উত্তরণ-অভীপ্সার প্রতীক মাত্র। রাত্রে শুয়ে শুয়ে কেন কে জানে তার এই সময়ে এক একদিন মনে পড়তো দ্রৌপদীর কথা। পঞ্চ পতি সত্ত্বেও তিনি সতী। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস-এ সে দ্রৌপদী সাজতো। মনে পড়ে যায় কিচক বধের পরে কিচক ভ্রাতারা এসে যখন তাকে কুলটা বলে বন্দী করেছিল তখন দ্রৌপদীর আর্ত-চিৎকার: মরে অনাথিনী দেখ জয় বিজয় আসিয়া।

হে জয়ন্ত, জয়সেন, জয়দ্বল, এস ত্বরা
যায়—যায় প্রাণ দারুণ বন্ধনে!
রক্ষা কর-রক্ষা কর অভাগীরে!

কিন্তু কে রক্ষা করবে বিনোদিনীকে? কে বুঝবে তার অন্তর্দাহ! একদিন বিনিদ্র রাত্রে সে দ্রৌপদীর মতো 'রক্ষা কর রক্ষা কর' বলে সত্যিই চিৎকার করে উঠেছিল। সে-চিৎকারে ছুটে এসেছিলেন তার মা,—কী হলো রে! পুঁটি? বিনোদিনী (তার ডাক নাম ছিল পুঁটি) মার দিকে তাকিয়ে বললে, কিছু না।

আর তার পরে, মা চলে যেতেই নীরব কান্নায় উদ্বেল হয়ে উঠলো বিনোদিনী।

॥ ৫ ॥

কিন্তু সময় বসে থাকে না। নবনির্মিত নাট্যমঞ্চ 'ষ্টার থিয়েটার'-এর দ্বারোদ্ঘাটন হয় ১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই তারিখে গিরিশচন্দ্রের ঐ 'দক্ষযজ্ঞ' নিয়ে। দক্ষ—গিরিশচন্দ্র, মহাদেব—অমৃত মিত্র, দধীচি—অমৃতলাল বসু, তপস্বিনী—ক্ষেত্রমণি, প্রসূতি—কাদম্বিনী, সতী—বিনোদিনী, ব্রহ্মা—নীলমাধব চক্রবর্তী, বিষ্ণু—উপেন্দ্র মিত্র, ভৃগু-পত্নী—গঙ্গামণি, নন্দী—অঘোর পাঠক, ভৃঙ্গী—প্রবোধ ঘোষ, প্রভৃতি। বিনোদিনী এ-সম্পর্কে তার 'আমার কথা'য় লিখে গেছে: 'প্রথম দিনের সে লোকারণ্য, সেই খড়খড়ি, দেওয়ালে লোকসবের ঝুলিয়া ঝুলিয়া বসে থাকা দেখিয়া আমাদের বুকের ভিতর দুরুদুরু করিয়া কম্পন বর্ণনাতীত। আমাদেরই সব দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। কিন্তু যখন অভিনয় আরম্ভ হইল, তখন দেবতার বরে যেন সত্যই দক্ষালয়ের কার্য আরম্ভ হইল। বঙ্গের গ্যারিক গিরিশবাবুর সেই গুরুগম্ভীর তেজপূর্ণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মূর্তি যখন ষ্টেজে উপস্থিত হইল, তখন সকলেই চুপ—তাহার পর অভিনয়-উৎসাহ? সে কথা লিখিয়া বলা যায় না। গিরিশবাবুর দক্ষ, অমৃত মিত্রের মহাদেব যে একবার দেখিয়াছে, সে বোধহয় কখনই তাহা ভুলিতে পারিবে না। 'কে-রে-দে-রে সতী দে আমার!'…বলিয়া যখন অমৃত মিত্র ষ্টেজে বাহির হইতেন, তখন বোধহয় সকলেরই বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিত। দক্ষর মুখে পতি নিন্দা শুনিয়া যখন সতী প্রাণত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া অভিনয় করিত, তখন সে বোধ হয় নিজেকেই ভুলিয়া যাইত!'

'দক্ষযজ্ঞ'-এর শেষ দৃশ্য বাস্তবিকই দেখবার মতো ছিল। তিনদিকে অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলছে, তার মধ্যে সতী নিমজ্জিত, তাঁর বেদনামথিত মুখখানি দেখা যাচ্ছে শুধু, তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদছে শিব-অনুচর, আর অদূরে দাঁড়িয়ে প্রস্তরবৎ দক্ষ। শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে সতী বলছে আমি নারী, মহিমা কি বুঝিবারে পারি? দেবদেব নিজগুণে ক্ষমিবেন অপরাধ!

শিব-অনুচর নন্দী হাহাকার করে ওঠে,—মা জননী!

সতী বলে,—বলিস ভোলারে, কভু যেন মনে করে মোরে! অজ্ঞান অবোধ, সেবা তার করিতে নারিনু! ছিল বহু সাধ, সে সাধ রহিল মনে।

সমস্ত দর্শক অভিভূত, তাদের চোখে জল। মহিলা-আসনে অনেকেই

ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। দর্শকদের আসনের এককোণে বসে আছেন কুমার বাহাদুর তীক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে, আর দ্বিতীয় সারির মধ্যিখানে বসে রয়েছেন রাঙাবাবু, তার চোখ সজল। সতীরূপিনী বিনোদিনী বলছে তার মুখখানি অগ্নি গ্রাস করার পূর্ব মুহূর্তেঃ ভিখারীর কেহ নাহি ত্রিসংসারে, দিগম্বর ! ক্ষমা করো অধীনীরে ! এ-অন্তিমে হৃদ্‌পদ্মে দেহ আসি দেখা !

তারপরেই এলিয়ে পড়ে। অগ্নি তাকে পূর্ণভাবে গ্রাস করে নেয়। অদূরে মঞ্চের কোণে উচ্চ পর্বত থেকে দেখা যায় নেমে আসতে মহাদেবকে। তিনি জলদ গম্ভীর —অথচ তীব্রস্বরে হাহাকার করছেন—কে রে ! কে রে !

সবাই মুখ ফিরিয়ে সেদিকে তাকায়। মহাদেব নেমে আসেন,—সতী দে সতী দে আমার !

থিয়েটার ভাঙার পর সে রাত্রে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফেরে বিনোদিনী। তার ঘরে সে একা। পোষাক পালটাবার উদ্যোগ করছে।

ঘড়ির কাঁটাটা বসে নেই, সে ঠিক 'টিক-টিক' করে সময়-সমুদ্র পার হচ্ছে। বিনোদিনী চট্ করে কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছে। রাত তখন শেষের দিকে। বিনোদিনীর মা তার ঘরে শুয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। দিদিমা শোন ছাদের ওপর চিলেকোঠার ঠাকুর ঘরে—রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সামনে। তিনিও ঘুমোচ্ছিলেন। সদর-দরজা বন্ধ করে সেখানে খাটিয়া পেতে যথারীতি ঘুমোচ্ছে দারোয়ান। সে জানতেও পারলো না, দেওয়াল টপকে একজন বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লো। পরণে মিলিটারীদের মতো খাকী পোষাক, কোমরে ঝুলছে কোষবন্ধ তরোয়াল। অসম সাহসী সে। পাইপ বেয়ে একেবারে ছাদে উঠে গেল। তারপরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো দোতলায়। ঘটনাচক্রে সেদিন ক্লান্তিবশত ঘরের দরজায় খিল দিতে ভুলে গিয়েছিল বিনোদিনী। আগন্তুক দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পড়লো। আলগোছে ভেজিয়ে দিলো দরজা, তারপরে ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়ালো ঘুমন্ত বিনোদিনীর শিয়রে। জানালা দিয়ে পাণ্ডুর চাঁদের আলো এসে পড়েছে তার মুখের ওপর। সেই মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো আগন্তুক। সে আর কেউ নয়, কুমার বাহাদুর স্বয়ং ! বাড়ির অদূরে জুড়িগাড়ি রেখে তিনি এ-বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আজকেই-শোনা সতীর অন্তিম কথাগুলো মনে পড়ে গেল তাঁর: যদি পাগল আমার —আমা বিনা হয় উচাটন—করিয়ো যতন !

আর থাকতে পারলেন না তিনি, ডেকে উঠলেন সেই পুরানো সুরে: মেনী !

এই ডাকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল বিনোদিনীর। সে তখনো বুঝতে পারছে না। এ স্বপ্ন, না, বাস্তব !

—এতো ঘুম কেন ?

বিনোদিনী এবার ধড়মড় করে উঠে বসলো। কুমার বললেন,—আমি পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবো, আর তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমুবে, তা কি হয় ?

বিনোদিনী উঠে দাঁড়ালো, বললে—পাগল কিসে ?

কুমার বললেন,—কথাটা আগেও বলেছি। হয়ত ভুল করেছি, দোষও হয়ত করেছি, কিন্তু সে অনুতাপ প্রকাশ করার সুযোগও তুমি দিলে না ! তার ওপর যখন শুনলাম গুরমুখ তোমাকে— !

—থাক ও-কথা।

—থাকবে না ! ও-কথা শুনে মাথায় আগুন ধরে গিয়েছিল ! ছুটে এসেছিলাম তোমার কাছে। তুমি আমার কোনো কথা শুনলে না !

—তা বলে রাতের অন্ধকারে লেঠেল পাঠিয়ে—

—আমি রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলুম ! তার ওপর আজ যখন তোমাকে স্টেজে দেখলুম—

—তখন ?

—দেখো, ঐ গুরমুখকে তোমায় ছাড়তে হবে ! টাকা ? সব টাকা আমি দেবো। এই নাও সঙ্গে এনেছি দশ হাজার—এই নাও !

বলে, পকেট থেকে গোছা গোছা নোট বার করে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। বিনোদিনী তা তাকিয়েও দেখলো না। কুমার বলতে লাগলেন,—আরও দেবো ! যত চাও সব দেবো ! শুধু তুমি ওকে ছেড়ে দাও !

বিনোদিনীর মুখের ভাব শক্ত হলো। যাকে সে মনপ্রাণ সব দিয়েছিল, সে আজ টাকার ওজনে সব-কিছু কিনতে চায় ! এই চিন্তাটাই তাকে বিমুখ করে তুললো, সে গম্ভীর গলায় বললে,—না-তা আর হয় না—টাকা তুমি উঠিয়ে নাও ! টাকা আমি রোজগার করেছি বই টাকা আমায় রোজগার করে নি ! ভাগ্যে থাকলে অমন দশ-বিশ হাজার আমার কতো আসবে ! তুমি এখুনি চলে যাও !

কুমার দাঁতে দাঁতে চেপে বললেন,—বটে ! এতো সহজে তোমায় ছেড়ে দেবো !

বিনোদিনী কিছু একটা আশঙ্কা করে ওর দিকে তাকালো। তারপরে ভয় পেয়ে ঘরের অন্য দিকে সরে এলো। কেমন যেন হকচকিয়ে গেছে সে, বিহ্বল হয়ে গেছে ! চিৎকার করে যে মাকে ডাকবে, তা-ও পারছে না ! ওদিকে কুমারের কোষ-খোলা তরোয়াল, চোখে অগ্নিদৃষ্টি। পরমুহূর্তেই সেই তরোয়াল দিয়ে বিনোদিনীর মাথা লক্ষ্য করে তিনি কোপ বসালেন। এটা

খে হতে যাচ্ছে, বিনোদিনী তা আন্দাজ করেছিল। চোখের পলকে সে টেবিল—হারমনিয়ামটার পিছনে চলে গিয়েছিল। কুমার তাকে তরোয়ালের কোপ মারবার সঙ্গে সঙ্গে টেবিল-হারমনিয়ামটার আড়ালে সে বসে পড়েছিল। ফলে কোপ গিয়ে পড়লো হারমনিয়ামটার ডালার ওপরে। ডালাটা ধারালো তরোয়ালের কোপে দু-আধখানা হয়ে গেল। সেই তরোয়ালটা সজোরে উঠিয়ে নিয়ে আবার যখন কুমার তাকে কাটতে যাচ্ছেন, তখন মরীয়া হয়ে বিনোদিনী এগিয়ে এসে ওর হাত সজোরে চেপে ধরে তরোয়ালের ধারালো কোপ থেকে নিজেকে রক্ষা করলো। বললে,—কী করতে যাচ্ছো? আমি না হয় মরলাম! আমি তুচ্ছ এক বারাঙ্গনা, আমি মরলেই বা কী, বাঁচলেই বা কী! কিন্তু তোমার কী হবে! আইন! আদালত! অতো বড়ো বংশের ছেলে, কত তোমাদের নাম-ডাক! সে বংশে কালি দিয়ে রাশি রাশি কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে ফাঁসির দড়িতে গলা দেবে! তুচ্ছ একটা ঘৃণ্য নারীর জন্য? ছি-ছি!

জমিদার-পুত্রটি তলোয়ার ফেলে দিয়ে বসে পড়ে দু-হাতে মুখ ঢাকলেন। মুখে কোনো কথা নেই। বিনোদিনীও নীরব। কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। ঘড়িটা শুধু সজাগ!! সে সমানে টিক-টিক করে চলেছে! কুমার একসময় ওঠেন, আড়ালে চোখ মুছে তরোয়ালটা নিয়ে কোষবন্ধ করেন, তারপরে মুখ নিচু করে চলে যান দরজার দিকে।

বিনোদিনীও চোখ মোছে, তারপরে ধরা গলায় বলে,—শোনো?

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়েন কুমার। বিনোদিনী কাছে যায়, চোখের জল বাঁধ মানতে চায় না। তবু নিজেকে কোনক্রমে বেঁধে রেখে বিনোদিনী বলে,—আর এসো না। এসে কোনো লাভ নেই। আমাকে পাবে না।

বড়ো করুণ দৃষ্টিতে কুমার মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালেন। তারপরেই চলে গেলেন। ততক্ষণে সকাল হয়ে গিয়েছিল, দারোওয়ান দরজা খুলে রেখেছিল। সেজন্য তাঁর চলে যেতে কোনো অসুবিধে হয় নি। বিনোদিনী ততক্ষণে বিছানায় এসে কান্নায় লুটিয়ে পড়েছিল।

যাই হোক, সতীর ভূমিকায় বিনোদিনী অভিনয় করেছিল প্রাণ ঢেলে। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখে গেছেন—'বিনোদিনী তাহার সতীর ভূমিকা এত সুন্দর করিয়াছিল যে সেরূপ অভিনয় আজকালকার অভিনেত্রীর করা অসম্ভব।'

গিরিশচন্দ্রও এ-সম্বন্ধে লিখেছিলেন,—দক্ষযজ্ঞে সতীর ভূমিকা আদ্যোপান্ত বিনোদিনীর দক্ষতার পরিচয়। সতীর মুখে একটি কথা আছে,—বিয়ে কি মা? —এই কথাটি অভিনয় করিতে অতি কৌশলের প্রয়োজন। যে অভিনেত্রী পর অঙ্কে মহাদেবের সহিত যোগ-কথা কহিবে, এইরূপ বয়স্কা

স্ত্রীলোকের মুখে 'বিয়ে কি মা ?'—শুনিলে ন্যাকামো মনে হয়। সাজসজ্জায় -হাবভাবে বালিকার ছবি দর্শককে না দিতে পারিলে অভিনেত্রীকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু বিনোদিনীর অভিনয়ে বোধ হইত যেন দিগম্বর-ধ্যান-মগ্ন বালিকা সংসার-জ্ঞানশূন্য অবস্থায় মাতাকে 'বিয়ে কি মা'—প্রশ্ন করিয়াছে। যজ্ঞস্থলে পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, অথচ দৃঢ়বাক্যে পূজ্য স্বামীর পক্ষ-সমর্থন। পতিনিন্দায় প্রাণের ব্যাকুলতা, তৎপরে প্রাণত্যাগ, স্তরে স্তরে অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইত।'

এরপরে গিরিশচন্দ্রেরই 'ধ্রুবচরিত্র।' (১৮৮৩ সালের ১১ আগস্ট। উত্তানপাদ—অমৃত মিত্র, বিদূষক—অমৃত বসু, সুরুচি—বিনোদিনী (ওর তখন কুড়ি বছর বয়স), ধ্রুব—ভূষণকুমারী, সুনীতি—কাদম্বিনী, মহাদেব—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, ব্রহ্মা—নীলমাধব চক্রবর্তী, নারদ—অঘোর পাঠক প্রভৃতি।

উল্লেখ্য, এই নাটকে সুরুচির গর্ভজাত রাজার পুত্রের নাম গিরিশচন্দ্র রেখেছিলেন 'উত্তমকুমার।' যাইহোক, এ-নাটকও জনপ্রিয় হয়েছিল। ধ্রুবর ভূমিকায় ভূষণকুমারীর নাম হয়েছিল খুব। বিশেষ করে তার গান। যেমন, আজ খেলবো খালি, ঘরে যাবো না, লুকোবো গাছের পাশে খুঁজতে এলে মা। কিম্বা, 'কোথা পদ্মপলাশলোচন। বলেছে মা আমারে, বনে পাবো দরশন।'

সেদিন সাজঘরে 'সুরুচি'র ভূমিকায় সাজসজ্জা করার পর নিজের চুলটা ঠিকঠাক করছিল বিনোদিনী। বিনোদিনী নিজেই নিজের মেক-আপ করতো, সাজতো। সবাই বলতেন, সে সাজতে পারতো দারুণ! তার নিজের ছিল এক ঢাল চুল, যেমন লম্বা, তেমনি ঘন, তেমনি নরম। সত্যিকার 'কেশবতী কন্যা' ছিল সে। কারও সাহায্য না নিয়ে সে নিজেই চুলের বিন্যাস করতো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে-চরিত্র অনুযায়ী। সে সেদিন তখন কেশেরই বিন্যাস করছিল, এমন সময় প্রবেশ করলেন গিরিশবাবু। এই নাটকে তিনি কোনো ভূমিকা নেন নি। ডাকলেন,—বিনোদ ?

বিনোদিনী মুখ তুললো,—এই যে আসুন। আপনার ধ্রুবচরিত্রও তো লোকে নিয়েছে !

গিরিশচন্দ্র চেয়ারে বসলেন। বিনোদিনী বললে,—এতো ভক্তির স্রোত কী করে বওয়ালেন ?

গিরিশচন্দ্রের মুখ উজ্জ্বল হলো। বললেন,—সেই কথাই তো তোমাকে বলতে এলুম ! একদিন হয়েছে কী জানো ? বাড়ির রকে বসে আছি, হঠাৎ দেখি গাড়ি থেকে নেমে দু-তিনজন ভক্তের সঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরহংসদেব কোথায় যেন চলেছেন ! আমি ছবি দেখেছিলুম, চিনতে কষ্ট হলো না। কিন্তু

তিনি আমাকে চিনবেন কী করে ? অথচ হঠাৎ দেখি, তিনি আমারই দিকে মুখ ফিরিয়ে দু-হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। আমি হতভম্ব। সম্বিৎ ফিরে এলে নমস্কার করতে যাবো, দেখি, চলে গেছেন অনেকটা দূরে। সেই থেকে কী হয়েছে জানো ? কথাটা শুধু তোমাকেই বলছি, যেন টান পড়েছে কিছুতেই স্থির হতে পারছি না।

বিনোদিনী মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, বললে,—যান না একদিন—দেখা করে আসুন!

—সর্বশরীরে পাপ! যাই কী করে ?

বিনোদিনী বললে,— আপনি যদি এ-কথা বলেন, তাহলে আমরা কোথায় যাবো ? আপনি যান, ঠাকুরের নাম স্মরণ করে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করে আসুন। আর, কেমন দেখলেন—আমাকে এসে বলবেন। আমাদের তো উপায় নেই, তাই আপনার চোখ দিয়েই ওঁকে দেখবো! যদি শান্তি পাই।

এরপরে আর একটি যুগান্তকারী নাটক—গিরিশচন্দ্রের 'নল-দময়ন্তী।' এতে নল—অমৃত মিত্র, দময়ন্তী—বিনোদিনী, বিদূষক—অমৃত বসু, রাজমাতা-গঙ্গামণি, ব্রাহ্মণী—ক্ষেত্রমণি, সুনন্দা—ভূষণকুমারী, পুষ্কর—নীলমাধব চক্রবর্তী, কলি—অঘোর পাঠক, ইন্দ্র—প্রবোধ ঘোষ ইত্যাদি। বিনোদিনীর অভিনয় সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছিলেন,— 'দময়ন্তীর ভূমিকা বিনোদিনীর পৌরাণিক অভিনয়ের যুগের একটি আদর্শ অভিনয়। বিনোদিনীতে দর্শকবৃন্দ মূর্তিমতী বৈদর্ভীই প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ ও চরিতার্থ হইত। ফলতঃ তাদৃশ অভিনয় আর কখনো অপর কোনো অভিনেত্রীর দ্বারা কোনো স্টেজে হয় নাই।'

এই 'নল দময়ন্তী' সম্পর্কে দেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁর বইতে লিখেছেন,—ঐ নাটকে সরোবরের একটি অপূর্ব দৃশ্য ছিল। এই দৃশ্যটি ছিল সে যুগের খ্যাতিমান মঞ্চ-সজ্জাকর জহর ধরের পরিকল্পনা। পর পর দুটি পদ্মের ভিতর দুজন কমলবাসিনীর আবির্ভাব হতো। মাঝখানের পদ্মটি ছিল সবচেয়ে বড়ো। সেই পদ্মের ভেতর থেকে একজন কমলবাসিনী বেরিয়ে আসতেন। একদিন একজন সখী না আসায় গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীকে ধরে বসলেন সখীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্য। (এর ওপর নায়িকা দময়ন্তীর অভিনয় তো আছেই—লেখক)…ঐ দৃশ্যে ক্রেন ব্যবহার করা হতো। বিনোদিনী ক্রেনে চড়ে যেই ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছে, অমনি তার এলোচুলের রাশি পাক খেয়ে জড়িয়ে চড়চড় করে ছিঁড়তে আরম্ভ করলো। সেই সময়ে সবে অর্ধেক মুখ পদ্ম থেকে বেরিয়েছে। 'আরে চুল গেল—চুল গেল' বলে দাশু নিয়োগী মশাই ছুটতে ছুটতে এসে কাঁচি দিয়ে দু-তিন জায়গায় কেটে

ক্রেনের দড়ি থেকে বিনোদিনীর মাথাটা ছাড়িয়ে দিলেন। স্টেজ থেকে বেরিয়ে এসে বিনোদিনীর সে কি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না! শেষে বিনোদিনী রাগে ও অভিমানে গোঁ ধরে বসলো, আর কিছুতেই সে মঞ্চে প্রবেশ করবে না।

শেষপর্যন্ত অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে গিরিশবাবু ওকে রাজী করান।

এই সময়ই একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে কাটিয়ে এলেন গিরিশচন্দ্র। বিনোদিনী তখন তার সাজঘরে বসে 'দময়ন্তী'র রূপসজ্জা করছিল। দাসী বলছিল,—এই বই-ও তোমাদের জমে গেছে দিদি—যা লোক হয়েছে না!

—কয়েক রাত তো হয়ে গেল, এখনো লোক হচ্ছে?

—হবে না! বড়োবাবুর নাটক। অমৃত মিত্তির মশাই নল আর তুমি দময়ন্তী। লোকে তো লুফে নিয়েছে!

অন্তরাল থেকে এই সময় ডাক ভেসে আসে গিরিশবাবুর, —বিনোদ?

—আসুন?

গিরিশবাবু ঢুকলেন। দাসী বেরিয়ে গেল। তিনি চেয়ারে বসতে বসতে বললেন,—কী দেখলুম বিনোদ! নরেন্দ্র দত্তের গান আর ঠাকুরের স্বর্গীয় রূপ। মনে হচ্ছিল পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ি!

—তারপর!

গিরিশবাবু বলতে লাগলেন,—আমিও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলুম! মনে হচ্ছিল—অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার! এক বিন্দু আলো নেই—তার মধ্যে আমার এই 'আমি'টা যেন ডুবে যাচ্ছে—হারিয়ে যাচ্ছে! নিজেকে আর খুঁজে পাচ্ছি না! আমার কী হলো বিনোদ? সাধে কি আর ছুটে এসে মদের বোতল বার করি? কিন্তু তাতেই বা শান্তি পাচ্ছি কই?

বলতে বলতে হঠাৎ উঠে চলে গেলেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো। বিনোদিনী চুপ করে বসে রইলো। তখনো 'ফাস্ট বেল'-এর অনেক দেরি আছে। সে হাতের ওপর মাথাটা রাখলো। কখন যে দাসী এসে ঘরে ঢুকেছে সে টেরও পায় নি। তাই চমকে উঠলো দাসীর ডাকে,—দিদি? কী হলো দিদি?

—অ্যাঁ!

দাসী বললে,—দিদি, তোমাকে মালিক একটু ডাকছে—তাঁর ঘরে।

বিনোদিনী অবাক হয়ে বললে,—সে কী! এমন করে তো কখনো ডেকে পাঠায় না!

—কী যেন আজ হয়েছে! মুখ গম্ভীর করে বসে আছেন!

বিনোদিনী উঠে দাঁড়ালো। তারপরে চলে গেল মালিকের ঘরের দিকে।

মালিক অর্থাৎ গুরুমুখ রায় মুসাদ্দি তার ঘরে চুপচাপ মুখ নিচু করে বসে

ছিল—একেবারে একা—মুখখানা গম্ভীর। বিনোদিনী ঘরে ঢুকে একমুহূর্ত চুপ করে দাঁড়ালো, তারপরে বললে—কী হয়েছে! এমন করে বসে আছো যে?

গুরুমুখ মুখ তুললো, বললো,—বিনোদ, আমাকে বাড়ির লোক থিয়েটার ছাড়তে বোলছে! থিয়েটার কেনো, তোমাকেও ছাড়তে বোলছে!

বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায়, বলে—এই কথা তোমাকে বোলবার জন্য থিয়েটারে ছুটে এলম। কী হয়েছে জানো? আমার তো বাবা নেই, আছে মা। সেই মায়ের কানে সব উঠেছে! মা সব শুনে কী করেছে জানো? আমাদের ঘরে কিষণজী ঠাকুর আছেন? সেই ঠাকুরের সামনে হত্যা দিয়ে পড়ে আছে!

—বলছো কী!

—কিষণজীর সামনে চোখের জল ফেলে কাঁদছে আর মাথা ঠুকছে,—কিষণজী! হামারা বেটাকো ওয়াপস দো! যবতক নেহী দেওগে, হাম এক বুঁদ পানিভী নেহি পিউঙ্গি!

বিনোদিনী শিউরে ওঠে কথাটা শুনে! সে যেন মনশ্চক্ষে দেখতে পায় গুরুমুখের মা রূপাদেবীকে!

গুরুমুখ বলে,—একদিন নয়—দুদিন নয়—আজ নিয়ে তিনদিন! মা ওভাবে পড়ে আছে—এক বিন্দু জল মুখে দিচ্ছে না! আমি থিয়েটার না ছাড়লে তোমাকে না ছাড়লে আমার মা মুখে জলটুকুও ছোঁয়াবে না! আমি এখন কী করি বিনোদ, আমি এখন কী করি!

বিনোদিনী নিজেকে সামলায়, বলে,—মাকে তিনদিন এমন করে উপবাসী রেখে দিয়েছো? জলটুকু মুখে দিতে দাও নি! যাও—এখখুনি ছুটে যাও মায়ের কাছে। যা বলছেন, তাই করো।

গুরুমুখ অসহায়ের ভঙ্গিতে বলে,—লেকিন তোমাকে কেমন করে ছাড়বো বিনোদ, কেমন করে ছাড়বো তোমার থিয়েটার!

বিনোদিনী বললে,—মা তিনদিন মুখে কুটোটি কাটেন নি, তবু এই কথা? যদি আমাকে তুমি একটুও ভালোবেসে থাকো, তাহলে সেই ভালোবাসার দোহাই দিয়ে বলছি, এখুনি মায়ের পায়ে গিয়ে পড়ো, বলো,—মা, আমি এই মুহূর্তে বিনোদিনীর থিয়েটার ছাড়লাম—বিনোদিনীকেও ছাড়লাম!

গুরুমুখ চলে গেল। মঞ্চে 'সুনীতি' বেশী কাদম্বিনী যখন ধ্রুবর জন্য কেঁদে কেঁদে বিলাপ করছিল, তখন বিনোদিনীর মনে হচ্ছিল, যেন গুরুমুখের মা-ই ছেলের জন্য অমন হাহাকার করছেন : আর কতদিন রবে প্রাণ, শূন্য ত্রিভুবন, কেঁদে কেঁদে অন্ধ দু-নয়ন, চাঁদ মুখ আর কি দেখিব? আর কি সে মা বলে ডাকিবে? দেখা দাও—দেখা দাও একবার! ওরে, মার প্রাণ সহে না যে আর!

এই সময় 'ধ্রুব'-র বেশে ভূষণকুমারী ছুটে আসে,—মা! পেয়েছি মা: পদ্মপলাশলোচন হরি!

সুনীতি ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে—ধ্রুব—ধ্রুব! হারানিধি, অন্ধের নয়ন!

গুরুমুখ ফিরে গেছে মায়ের কাছে। কিষণজীর ঘরে কিষণজী। যেন হাসছেন। তাঁর সামনে কেউ হত্যা দিয়ে আর পড়ে নেই!

গুরুমুখ রায় বাড়ি ফেরার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার আহ্বানে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন গিরিশবাবু, অমৃতলাল বসু, অমৃত মিত্র, দাশু নিয়োগী ও হরিপ্রসাদ বসু। বিছানায় আধ-শোওয়া অবস্থায় বসে আছে গুরুমুখ। ওঁদের জন্য তার সামনে চেয়ার পেতে দিয়ে গিয়েছিল চাকরে। গুরুমুখ বলছিল,—হঁা—আমার মাতাজী ভালো আছেন। লেকিন আমার শরীরটা হঠাৎ খারাপ হোয়েছে। সেইজন্য আপনাদের একটু কষ্ট দিলম। এখন শুনেন। থিয়েটার আমি বেচে দিবো। বিনোদিনীকে আমি দিতে চাই অর্ধেক শেয়ার, আর অর্ধেক আপনারা ভাগাভাগি করে নিন।

গিরিশবাবু বললেন, কিন্তু বিনোদ ও বিনোদের মার তরফ থেকে আমি বলছি, বিনোদ থিয়েটারের মালিকানা নেবে না। আর—আমিও তাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবন্ধ· মালিকানা নেবো না। এই চারজন মালিক হোন। কতো টাকা দিতে হবে, এইবার বলুন!

গুরুমুখ একটু চিন্তা করে বললে,—কী খরচ-খরচা হয়েছে আপনারা জানেন। কিন্তু আমি আপনাদের ওপর চাপ দিতে চাই না। আপনারা আমাকে এগারো হাজার টাকা দিন, আমি থিয়েটারটা আপনাদের চারজনের নামে লেখাপড়া করে দিচ্ছি।

গিরিশবাবু বললেন,—বেশ, ঠিক আছে, তাই হবে।

বলে, অমৃতবাবুদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা এইটুকু দেখো, তোমাদের হাতে যেন কোনো ভদ্রসন্তান লাঞ্ছিত না হয়।

অমৃতলাল বসু উত্তর দিলেন, আমরা কথা দিলাম।

নতুন ব্যবস্থায় গিরিশবাবুর নাটক 'কমলে কামিনী' অভিনীত হলো গুরুমুখ-বিহীন ৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রীটের 'স্টার থিয়েটার'-এ ১৮৮৪ সালের ২০ শে মার্চ তারিখে। শ্রীমন্ত করলো বনবিহারিণী (ভুনি), খুল্লনা ও চণ্ডী—বিনোদিনী, পদ্মা ও দুর্বলা—ক্ষেত্রমণি, গুরুমশাই ও সভাসদ—অমৃতলাল বসু।

ঐ সালের ২৬ এপ্রিল গিরিশচন্দ্রের বৃষকেতু। কর্ণ—উপেন্দ্র মিত্র, বৃষকেতু—ভূষণকুমারী, পদ্মাবতী—বিনোদিনী, বিষ্ণু—অঘোর পাঠক। এই নাটকের সঙ্গে ছিল গিরিশচন্দ্রেরই গীতিনাট্য 'হীরার ফুল'। এতে মদন—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রতি—ভূষণকুমারী, আর শশীকলার ভূমিকায় বিনোদিনী। ওর

ভূমিকাটি ছোট, কিন্তু তারই মধ্যে বিনোদিনী একটু 'বিশেষত্ব দিয়াছিল' গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন,—এক্ষণে অভিনয়দর্শনে দর্শকের ধারণা হয় যে, রতিই হীরার ফুল গীতিনাট্যের নায়িকা, কিন্তু যিনি হীরার ফুলে বিনোদিনীকে দেখিয়াছেন, তাঁহার ধারণা যে হীরার ফুলে গ্রন্থকার-রচিত নায়িকাই নায়িকা, রতি নায়িকা নয়।'

এই সঙ্গে অমৃতলাল বসুর 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে'ও অভিনীত হতো। চাটুজ্যে-অমৃতলাল বসু (দ্বিতীয় রাত্রি থেকে উপেন্দ্র মিত্র), আর বাঁড়ুজ্যে-চরিত্রে নীল মাধব চক্রবর্তী।

ঐ সালেরই ৭ই জুন তারিখে মঞ্চস্থ হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের 'শ্রীবৎস চিন্তা' এই বইতে 'বাতুল' বলে একটি বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি করেন গিরিশচন্দ্র, তাতে অমৃতলাল বসু অভিনয় করে বিশেষ সার্থকতা লাভ করেন। শ্রীবৎস সাজতেন অমৃত মিত্র, চিন্তা—বিনোদিনী, লক্ষ্মী—লক্ষ্মীমণি, শনি—নীলমাধব চক্রবর্তী ভদ্রা—ভূষণকুমারী, সদাগর—অঘোর পাঠক। ঐ নাটকও ভালো হয়েছিল, কিন্তু এর পরের নাটক গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা'ই ষ্টার থিয়েটারের বিজয়-বৈজয়ন্তী হয়ে দাঁড়ায়। চৈতন্যের ভূমিকায় বিনোদিনী একেবারে উৎকর্ষের চরমে পৌঁছায়। নিতাই—বনবিহারিণী (ভুনি), প্রতিবেশী—অমৃতলাল বসু, জগাই—প্রবোধ ঘোষ, মাধাই—অমৃত মিত্র, গঙ্গাদাস—মহেন্দ্র চৌধুরী, লক্ষ্মী—প্রমোদা, বিষ্ণুপ্রিয়া—কিরণবালা, মালিনী—ক্ষেত্রমণি, জগন্নাথ মিশ্র—নীলমাধব চক্রবর্তী, অদ্বৈত—উপেন্দ্র মিত্র, শচীমাতা—কাদম্বিনী। অভিনয়ের তারিখ ২রা আগষ্ট ১৮৮৪ সাল।

কিন্তু এই নাটক আরম্ভ হবার আগে একটু ভূমিকা আছে। থিয়েটারে তাঁর ঘরে একদিন গিরিশবাবু নিয়ে এলেন তাঁর সুহৃদ ও শুভানুধ্যায়ী অমৃত-বাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষকে। বসেছিলেন অমৃতলাল বসু ও আরও অনেকে। তাঁকে দেখে তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। গিরিশবাবু শিশিরবাবুকে বললেন,—আসুন—আসুন—আসতে আজ্ঞা হোক।

করজোড়ে সবাইকে নমস্কার জানালেন শিশিরবাবু, ওঁরাও প্রত্যাভিবাদন করলেন, তারপরে আসন গ্রহণ করলেন শিশিরবাবু। গিরিশবাবু অমৃতবাবুদের বললেন, ইনি মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, আমার বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী।

গিরিশবাবু এরপর শিশিরবাবুকে বললেন,—একটা দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়ে ফেলেছি শিশিরবাবু। আপনি পরম বৈষ্ণব, আপনিই পথ বাতলাতে পারবেন। লিখে ফেলেছি চৈতন্যলীলা। কিন্তু চৈতন্যের ভূমিকা করবে কে? কে মঞ্চে আনতে পারবে ঐ ভাবসম্পদ! আমরা নির্বাচন করেছি বিনোদিনীকে। কিন্তু সে ভয় পাচ্ছে। তাকে একটু বুঝিয়ে বলুন তো।

অমৃতলাল বসু উঠে ডেকে নিয়ে আসতে গেলেন বিনোদিনীকে। শিশিরবাবু বললেন,—আসল কথা ভক্তি। অন্তরে ভক্তি থাকলে সব হবে। নাট্যকার যদি তাঁর অন্তরের ভক্তির বন্যা শিষ্যার মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন, তাহলে সে পারবে না কেন?

এই সময় ঘরে আসে বিনোদিনী, সঙ্গে অমৃত বসু। শিশিরবাবু বলেন,—এসো মা, এসো!

বিনোদিনী ওঁকে প্রণাম করে। শিশিরবাবু বলেন,—মাগো, সবসময় গৌর পাদপদ্ম চিন্তা করবে। দেখবে, তিনি নিজেই তাঁর কাজ উদ্ধার করে নিচ্ছেন! তখন কে তুমি, কে তিনি, সব বোধ একাকার হয়ে যাবে!

বিনোদিনী ভরসা পায়। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

ঐ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন 'চৈতন্যলীলা' দেখতে। তাঁকে যত্ন করে একটি বক্সে বসিয়ে দেওয়া হলো। চৈতন্যের বেশে মঞ্চে দেখা দেয় বিনোদিনী। একটা দৃশ্যে সে ভাবোন্মাদ হয়ে বলে ওঠে, গয়াধামে হেরিলাম বিদ্যমান, বিষ্ণুপদ পঙ্কজে করিতে মধুপান ভ্রমে কত কোটি অশরীরী প্রাণী কত ব্রহ্মা শিব নাহি জানি সবে হরিময় হরিগুণ কয়, আমি ভাগ্যহীন—নাহি চিনিলাম হরি!

বক্সে ভক্তসঙ্গে তন্ময় হয়ে অভিনয় দেখছিলেন ঠাকুর, তিনি বলে উঠলেন আহা!

আর একটি দৃশ্য। নিমাই মঞ্চে। হাহাকার করতে করতে ছুটে এলেন শচীমাতা রূপিনী কাদম্বিনী,—নিমাই—নিমাই! কী নিয়ে সংসারে রব বল? আছে মম একটি বন্ধন, কেন তাহা করিবে ছেদন? তোমা বিনা গৃহ মম অরণ্য-সমান শ্মশানে কেমনে রবো একা? নিমাই! নিমাই আমার! বজ্রাঘাত করো না হৃদয়ে!

বলে, কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়েন। নিমাই বা চৈতন্য বলতে থাকেন,—কৃষ্ণ বলে কাঁদো মা জননী! কেঁদো না নিমাই বলে! কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকলই পাবে! কাঁদিলে নিমাই বলে নিমাই হারাবে, কৃষ্ণে নাহি পাবে!

বক্সে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি শুনতে শুনতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন।

এরপরে আসে শেষ দৃশ্য। সন্ন্যাসীর বেশে ভক্তজনসহ শ্রীচৈতন্য ভাবাবেশে গাইতে থাকেন: হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়! আমি ভবে একা। দাও হে দেখা—প্রাণসখা রাখো পায়! কালো শশী, বাজালে বাঁশি, ছিলাম গৃহবাসী করলে উদাসী। কুল ত্যজি হে অকুলে ভাসি। হৃদিবিহারী কোথায় হরি, পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়!

বক্সে ঠাকুর বলে ওঠেন,—আহা! আসল—নকল এক দেখলাম গো, আসল-নকল এক দেখলাম।

গিরিশচন্দ্র অসুস্থ বোধ করে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, থিয়েটার ভাঙবার আগে ফিরে এলেন, ঠাকুরকে নিয়ে গেলেন মঞ্চে, তাঁর ঘরের সামনে। ঠাকুর বলতে বলতে আসছিলেন,—আহা! নকল আতা দেখলে আসল আতারই উদ্দীপন হয়! আমি তো ওর মধ্যে আসল মহাপ্রভুরই লীলা দেখলাম!

অদূরে নিমাইবেশী বিনোদিনী দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে ঠাকুরকে দেখছিল, ঠাকুর তখন তাকে দেখতে পান নি। গিরিশবাবু বললেন,—আজ বাংলার রঙ্গভূমি আপনার পায়ের ধূলোয় পবিত্র হলো।

ঠাকুর বললেন,—সবই মা আনন্দময়ীর লীলা!

গিরিশবাবু বললেন,—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে : গুরু কে?

ঠাকুর হেসে বললেন,—কুটনী। কুটনীরা জুটিয়ে দেয়—গুরুও তাঁর সঙ্গে মিল করিয়ে দেন। কিন্তু তোমার ভাবনা নেই। তোমার গুরু হয়ে গেছে!

গিরিশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, - হয়ে গেছে! আমার গুরু হয়ে গেছে! তাহলে মন্ত্র কই?

—মন্ত্র আবার কী! মন্ত্র হচ্ছে ভগবানের নাম!

বিনোদিনী এই সময় একটু এগিয়ে আসে। সজলচোখে বলে—কিন্তু আমার যে পাপের পাহাড় জ'মে গেছে!

ঠাকুর ওর দিকে তাকিয়ে বললেন,—পাপের পাহাড় হচ্ছে তুলোর পাহাড়। মায়ের নাম করে ফুঁ দিয়ে দে—সব উড়ে যাবে! কিন্তু তুমিই তো চৈতন্য? আয় মা—আরও কাছে আয়। আমার সঙ্গে বল্—হরি গুরু—গুরু হরি!

বিনোদিনী বলে ভাববিহ্বল কণ্ঠে—হরি গুরু—গুরু হরি!

হঠাৎ-ই ওর শিরে হাত রাখেন ঠাকুর, বলে ওঠেন, মা, তোর চৈতন্য হোক!

বিনোদিনীর সারা শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বইতে থাকে!

এ সম্পর্কে বিনোদিনী নিজেই লিখে গেছে,—'তাঁহার উভয় হস্ত আমার মাথার উপর দিয়া আমার পাপদেহকে পবিত্র করিয়া বলিলেন,—মা তোমার চৈতন্য হোক! তাঁর সেই প্রসন্ন সুন্দর ক্ষমাময় মূর্তি! আমার ন্যায় অধমজনের প্রতি কী করুণাময় দৃষ্টি!'

চৈতন্যলীলায় তার নিজের অভিনয় সম্বন্ধে বিনোদিনী লিখে গেছে,—'সেই বাল্যলীলার সময়—রাধা বই আর নাহিক আমার, রাধা বলে বাজাই

বাঁশী—বলিয়া গীত ধরিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন একটা শান্তিময় আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। যখন মালিনীর নিকট হইতে মালা পরিয়া তাহাকে বলিতাম—কী দেখ মালিনী?—সেই সময় আমার চক্ষু বহির্দৃষ্টি হইতে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিত। আমি বাহিরের কিছুই দেখিতে পাইতাম না। আমি হৃদয়—মধ্যে সেই অপরূপ গৌর পাদপদ্ম যেন দেখিতাম! আমার মনে হইত—ঐ যে গৌরাঙ্গ—উনিই তো বলিতেছেন, আমি কেবল মন দিয়া শুনিতেছি ও মুখ দিয়া তাঁহারই কথা প্রতিধ্বনিত করিতেছি!'

গিরিশবাবু স্বয়ং লিখেছিলেন,—'এই ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় আদ্যোপান্তই ভাবুক-চিত্ত-বিনোদন। গৌরাঙ্গ—মূর্তির ব্যাখ্যা—অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃরাধা—পুরুষ প্রকৃতি একসঙ্গে জড়িত। এই পুরুষ—প্রকৃতির ভাব বিনোদিনীর অঙ্গে প্রতিফলিত হইত। বিনোদিনী যখন—কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই বলিয়া সংজ্ঞাহীনা হইত, তখন প্রকৃত বিরহ-বধুরা রমণীরই আভাষ পাওয়া যাইত। আবার চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোত্তম—ভাবের আভাষ বিনোদিনী আনিতে পারিত।···অষ্টপ্রহর গৌরাঙ্গ মূর্তি ধ্যানের ফল বিনোদিনীর ফলিয়াছিল।'

স্টারের 'চৈতন্যলীলা'র সার্থকতা ও অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বেঙ্গল থিয়েটারও ভক্তিরস মঞ্চে প্রবাহিত করতে চেয়ে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' অভিনয় করে। তাদের এই অভিনয় হয়েছিল ১৮৮৪ সালের ১১ই অক্টোবর। শরৎচন্দ্র ঘোষ-বিহীন 'বেঙ্গল থিয়েটার' এই 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নিয়ে জ্বলে ওঠে। নাম ভূমিকায় কুসুম বলে অভিনেত্রীটি এতো চমৎকার অভিনয় করে যে, তার নামই হয়ে যায় 'প্রহ্লাদ-কুসুম' বা 'কুসী।' হিরণ্য-কশিপু—যোগীন্দ্র ঘটক, ষণ্ড—কুঞ্জ বসু, অমর্ক—মথুর চট্টোপাধ্যায়, কয়াধু—বড়ো রানী। এ-বইয়ের 'হরিনাম শুনে পাষাণ গলে' গানখানা বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। লক্ষ্যণীয়, ভূমিকালিপিতে 'সুকুমারী দত্ত' বা গোলাপসুন্দরীর নাম নেই। সম্ভবত সে অভিমান করে এই সময় 'বেঙ্গল' ছেড়ে দেয়।

যাইহোক, বেঙ্গলের সাফল্য দেখে গিরিশচন্দ্রও স্টারে মঞ্চস্থ করেন তাঁর লেখা 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' ঐ সালের ২২শে নভেম্বর। গিরিশবাবুর নাটকটি ছোট, মাত্র দুই অঙ্কের। তাই এর সঙ্গে জুড়তে হতো অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ-বিভ্রাট।' প্রহ্লাদ-চরিত্রে প্রহ্লাদ—বিনোদিনী, হিরণ্যকশিপু—অমৃত মিত্র। কিন্তু তুলনায় বেঙ্গলের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'ই বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। বিবাহ-বিভ্রাটে বিনোদিনী এক স্বতন্ত্র ধরণের চরিত্র অভিনয় করে সবাইকে

চমৎকৃত করেন, চরিত্রটির নাম—মিসেস কারফরমা। মিঃ সিং—অমৃতলাল বসু, ঝি—ক্ষেত্রমণি। কর্তা—নীলমাধব চক্রবর্তী (পরে 'বেলবাবু')। এই বইয়ের ক্ষেত্রমণির 'ঝি' দারুণ প্রশংসা পায়। এর এক বিশেষ আসরে বড়লাট ও ছোটলাট ক্ষেত্রমণির 'ঝি' দেখে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানান। ছোটলাট বলেছিলেন—'So Powerful an artist can scarcely be seen even in a London theatre of these days.'

স্টার ও বেংগলের কথা বলতে গিয়ে ন্যাশানালের কথা বলা হয়নি। প্রতাপ জহুরীর থিয়েটার থেকে সদলবলে গিরিশবাবু চলে যাবার পর অধ্যক্ষ হয়েছিলেন কেদার চৌধুরী। যাঁরা ওঁর সংগে ছিলেন, তাঁরা হলেন বনবিহারিণী (ভুনি), মতিলাল সুর, মহেন্দ্র বসু, ছোটরাণী, জীবন সেন, বেলবাবু, রাধামাধব কর, ধর্মদাস সুর প্রভৃতি। ১৮৮৩ সালের ৭ই মে এঁরা করলেন কেদার চৌধুরী-নাট্যায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'। জীবানন্দ—কেদার চৌধুরী, মহেন্দ্র—মহেন্দ্র বসু, শান্তি—বনবিহারিণী, সত্যানন্দ—মতিলাল সুর, মহাপুরুষ—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। কিন্তু এ নাটক তখন জনপ্রিয় হয় নি। ঐ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নময়ী মঞ্চস্থ হয়। তারপরে হয় কেদার চৌধুরীর 'ছত্রভংগ'। এতে দুর্যোধন—কেদার চৌধুরী, দ্রৌপদী—বনবিহারিণী, শকুনি—রাধামাধব কর। কিন্তু এতো করেও থিয়েটার জমে না। প্রতাপ জহুরী ছেড়ে দেন থিয়েটার। ভুবন নিয়োগী লিজ নিয়ে কেদার চৌধুরীকে রাখেন, আর আনেন পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্যকে। ১৮৮৫ সালের ২৭শে আগষ্ট হরিভূষণের 'কুমার সম্ভব' অভিনীত হলো। শিল্পী-তালিকায় সুকুমারী বা গোলাপসুন্দরীর নাম পাওয়া যায়। তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন রতির ভূমিকায়।

১৮৮৫ সালের ১০ জানুয়ারি স্টারে অভিনীত হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের নিমাই-সন্ন্যাস। বিনোদিনী—নিমাই, কেশব-ভারতী—অমৃত মিত্র। শচীমাতা—গঙ্গামণি মালিনী ও ধোপানী—ক্ষেত্রমণি, সার্বভৌম-অঘোর পাঠক। নট—রামতারণ সান্ন্যাল, শিষ্য—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)। ইনি ন্যাশানাল থেকে এই সময় স্টারে এসেছিলেন। এই সালের মে মাসে হলো গিরিশবাবুরই 'প্রভাস-যজ্ঞ'। এতে—সত্যভামা—বিনোদিনী, জটিলা—ক্ষেত্রমণি, রাধিকা-বনবিহারিণী (ভুনি)। ইনিও স্টারে এসেছিলেন। বসুদেব—অমৃতলাল বসু, শ্রীকৃষ্ণ—বেলবাবু, শ্রীদাম - রামতারণ সান্ন্যাল। এই সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর গিরিশচন্দ্রের সাড়া-জাগানো নাটক 'বুদ্ধদেব-চরিত' অভিনীত হলো। এতে গোপার ভূমিকায় বিনোদিনী বিশেষ উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিলো। 'লাইট অব এশিয়া'-গ্রন্থের রচয়িতা এডউইন আরনল্ড এই সময় কলকাতায়

এসেছিলেন। মঞ্চে তার এই অভিনয় দেখে ভুয়সী প্রশংসা করেছিলেন তিনি। 'গোপা'র অভিনয় সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন,-'বুদ্ধদেব নাটকে পতি-বিরহ-ব্যাকুলা গোপার ছন্দকের নিকট—দাও, দাও, ছন্দক আমায় পতির বসন-ভুষা—মম অধিকার। স্থাপি সিংহাসনে, নিত্য আমি পুজিব বিরলে!'—বলিয়া পতির পরিচ্ছদ-যাচঞা একপ্রকার অতুলনীয় হইত। সে অর্ধোন্মাদিনীর বেশ—আগ্রহের সহিত স্বামীর পরিচ্ছদ হৃদয়ে স্থাপন এখনও আমার চক্ষে জাগরিত। যাহাকে পুর্বাঙ্কে অপ্সরোনিন্দিত সুন্দরী দেখা যাইত, পরিচ্ছদ-যাচঞার সময় তাপ-শুষ্ক পদ্মের মতো মলিন বোধ হইত।'

এতে অন্যান্য ভুমিকায় ছিলেন : বুদ্ধদেব—অমৃত মিত্র, ছন্দক—বেলবাবু, শিষ্য ও গণক—অমৃতলাল বসু, পুত্রহারা রমণী— ক্ষেত্রমণি, বিম্বিসার—প্রবোধ ঘোষ, রাহুল-পুঁটুরাণী. শুদ্ধধন—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীকালদেব—মহেন্দ্র চৌধুরী, গৌতমী—গঙ্গামণি, সুজাতা—প্রমোদাসুন্দরী। বুদ্ধদেব নাটকের একটি গান ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ প্রিয় ছিল। গানটি হচ্ছে : জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই!

গিরিশচন্দ্রের মনের ভাবও তখন এইরূপ। একদিন রাত্রে উন্মাদের মতো তিনি ছুটে গিয়েছিলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাঁদের কথা হচ্ছিল। গিরিশচন্দ্র বলছিলেন : গুরু বলে যখন স্বীকার করেছি, তখন Confession আমাকে করতেই হবে।

ঠাকুর বললেন,—কী করতেই হবে?

—আত্মদোষ—স্বীকার।

—কী এমন আত্মদোষ ঘটলো রে?

—কাল মদের ঘোরে এক বেটির ঘরে গিয়ে শুয়েছি, অমনি মনে হলো যেন বিছে কামড়ে দিলো। সে বললে, কী হলো? আমি বললুম, বাক্সের চাবি বৈঠকখানায় ফেলে এসেছি। বলে সঙ্গে সঙ্গে সটকান দিয়ে একেবারে নিজের বাড়িতে নিজের বিছানায় শুয়ে তবে শান্তি! কিন্তু এ আবার কোন্ গিরিশ ঘোষ! একে তো চিনি না? তাই একে চেনবার জন্য ছুটে এলুম তোমার কাছে!

—শালা, তুই কি ভেবেচিস তোকে ঢ্যামনা সাপে ধরেছে যে পালিয়ে যাবি! ও তোকে জাত সাপে ধরেছে, তিন ডাক ডেকেই চুপ করতে হবে।

—এখন থেকে তবে কী করবো? থিয়েটার?

—নিশ্চয়। ওটা ছাড়বি নি। ওতে লোক শিক্ষা হয়!

—তারপর?

—ভগবানের কথা একবার একটু ভাবিস—একটু নাম নিস।

—কখন নেবো ?

—সকালে।

—সকালে আমার ঘুমই ভাঙে না।

—বিকেলে ?

—বিকেলে অস্থানে-কুস্থানে। সেখানে ভগবানের নাম হয় না।

—রাতে ? শোবার আগে ?

—কোথায় শুই ? কখন শুই ? কোন্ বিছানায় ?

ঠাকুর বললেন,—যা শালা, তোকে কিছুই করতে হবে না। আমাকে তুই বকলমা দে।

—মানে !

—মানে, তোর হয়ে আমিই সব করবো। তুই মুক্ত।

গিরিশ আনন্দে 'হুর-রে' বলে গেটের দিকে ছুট লাগালেন। নিজের মনেই বলতে লাগলেন, আঃ ! কী আনন্দ ! কাকে গিয়ে এ-কথা বলি !

একবার মনে হলো, চলে যাবেন বিনোদিনীর বাড়ি ! কিন্তু না, রাত হয়ে গেছে। তাছাড়া. গিরিশচন্দ্র ভাবলেন,—না—তাকেও এ-কথা এখন বলা হবে না !

বিনোদ তখন তার ঘরে অবসন্ন হয়ে অগাধ ঘুমে আচ্ছন্ন। তার দরজার বাইরে তার মা বসে সুপুরি কাটছেন তখনো ঘুম আসছে না বলে। দিদিমা—যথারীতি চিলেকোঠায়—ঠাকুর ঘরে।

ঘুমের ঘোরেই বিনোদিনীর মনে হলো কে যেন তার শিয়রে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে সে অবাক হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে রয়েছেন আর কেউ নয়, কুমার বাহাদুর। তিনি একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন,—মেনি, আমি আবার এসেছি।

বিনোদিনী উঠে বসলো তাড়াতাড়ি। শঙ্কায় কেঁপে উঠলো তার বুক। বললে,—কেন ! আবার এসেছো কেন ? কী করতে চাও ?

—কিছু করতে চাই না। আমি চলে যাচ্ছি, তাই তোমাকে বলতে এলাম।

—কোথায় যাচ্ছো ?

—অনেক দূরে।

বলতে বলতে বিষণ্ণ মুখে ক্লান্ত পদক্ষেপে দরজা পর্যন্ত চলে যান কুমার বাহাদুর ! বিনোদিনী বিস্মিত। কোথায় গেল মানুষটির অতো তেজ—অতো রাগ !

পিছন থেকে বিনোদিনী ডাকলো,—শোনো ?

দাঁড়িয়ে পড়লেন কুমার-বাহাদুর। বিনোদিনী বললে,—এতো রোগা হয়ে গেছো কেন ?

মুখ ফিরিয়ে ম্লান একটু হাসলেন কুমার-বাহাদুর। তারপরে চলে গেলেন দরজা দিয়ে। বিনোদিনী কী মনে করে দরজা খুলে বাইরে এলো। দেখলো সিঁড়ির কাছে বসে আছেন তার মা। বিনোদিনী বললে,—মা! কেউ এসেছিল?

মা বললেন, কৈ! না তো?

বিনোদিনী বললে,—হ্যাঁ—এসেছিল—সেই কুমার-বাহাদুর।

বিনোদিনীর মা উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—বলিস কী! আমি এখানে বসে আছি—কাউকে আসতেও দেখি নি—নামতেও দেখি নি।

—তাহলে?

বিনোদিনীর মা বললেন,—নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছিস। যা, ঘরে গিয়ে শো।

পরদিন সকালবেলা। ঘড়িতে দেখা যায়, বেলা প্রায় সাড়ে সাতটা বিনোদিনী তখনো ঘুমুচ্ছিল। বিনোদিনীর মা এসে ঘরে ঢোকেন। ওকে জাগান তিনি। বলেন,—এই বিনি—ওঠ—ওঠ।

বিনোদিনী খড়ফড় করে উঠে বসলো। বিনোদিনীর মা বললেন,—কাল কুমার বাহাদুর এসেছিল না? সন্ধ্যে-রাত্রে?

—হ্যাঁ। তুমি তো বললে, স্বপ্ন!

বিনোদিনীর মা বললেন,—না, স্বপ্ন নয়। এই মাত্র ওদের নায়েব মশাই এসে খবর দিয়ে গেল—কাল ঠিক ঐ সময়ই কুমার-বাহাদুর মারা গেছে!

—মারা গেছে!

—হ্যাঁ। তোকে শেষ দেখা দেখে গেল আর কী।

এ-গেল এক অধ্যায়। বিনোদিনী নিজেই লিখে গেছে এই ঘটনার কথা এর পর আসে গুরমুখের কথা। তার আমলে ষ্টারে অভিনীত হয় যথাক্রমে দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুব-চরিত্র আর নল-দময়ন্তী। এর পর সে ছেড়ে দেয় থিয়েটার। ছেড়ে দেয় বিনোদিনীর সংস্রব। এর পরে গুরমুখ কিছুদিন নিয়ম করে হোরমিলার কোম্পানীতে যেতে আরম্ভ করে। কিন্তু সে বিনোদিনীকে ভুলতে পারে নি বলে মনে হয়। মাস ছয়েক পরে হঠাৎ একদিন চলে যায় কাশীতে। কাশীতে সে সাধু সজ্জনদের সঙ্গলাভের চেষ্টা করতো। সংসারের প্রতি হয়ে পড়ে নিরাসক্ত। পরে একসময় দীক্ষাও নিয়েছিলো। তারপরে হঠাৎ সে মারা যায় ঐ কাশীতেই ১৮৮৬ সালে, যখন তার মাত্র বাইশ বছর বয়স। রেখে যায় মা ও স্ত্রী ছাড়া দুই শিশু কন্যাকে,—পার্বতী ও বাসন্তী তাদের নাম। গুরমুখও মারা যায় এবং ঐ সালে (১৮৮৬) বিনোদিনীও মঞ্চ ছেড়ে দেয়। কিন্তু তার আগে বিনোদিনীর কথা আরও কিছু আছে।

ঐ গুরুমুখ-বর্জিত স্টার থিয়েটারের প্রসঙ্গই উত্থাপন করা যাক। রাত্রিবেলা সাজঘরের কাছাকাছি একটা ফাঁকা জায়গায়-দেওয়ালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বড়ো ছবি টাঙানো রয়েছে। ছবির ওপর মালা, নিচে ধূপ। গিরিশচন্দ্র ছবির সামনে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে আছেন। দেখতে দেখতে তাঁর চোখদুটি ছলছল করে এলো। ওঁকে ঐভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দাশু নিয়োগী কাছে এলেন, বললেন,—জানেন? আপনার বুদ্ধদেব চরিত দারুণ হয়েছে! লোকে বলছে!

সে-কথা কানে না তুলে গিরিশবাবু বলে উঠলেন,—জানো? ঠাকুরের গলায় দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েছে? ক্যানসার?

কথাটা শুনে চমকে উঠলেন দাশু, আর কোনো কথা না বলে একদিকে সরে যান। খানিক পরে আসে অমৃত মিত্র। তাকে দেখেও ঐ একই কথা বলেন গিরিশচন্দ্র, বলতে গিয়ে গলা তাঁর কেঁপে যায়,—ঠাকুরের ক্যানসার হয়েছে!

অমৃতও কোনো কথা না বলে চলে যায়। এরপরে আসেন অমৃতলাল বসু। তাঁকেও গিরিশবাবু বলেন,—ভুনি। ঠাকুরের ক্যানসার হয়েছে!

অমৃতলাল মুখ তুলে তাকান। এ-খবর তাঁকেও যেন শেলবিদ্ধ করে। বলে ওঠেন,—কার পাপে?

গিরিশবাবু অশ্রুভেজা গলায় বলেন, আমার! আমার পাপে। আমার পাপে!

বলতে বলতে উদভ্রান্তের মতো একদিকে চলে যান।

তাঁকে পরদিন সকালে আবার দেখা যায়। দেখা যায় বিনোদিনীর বাড়িতে। আলুথালু বেশ—বিপর্যস্ত চেহারা। বিনোদিনী সবে স্নান করে এসেছে। ওঁর কণ্ঠস্বর শোনামাত্রই সে দরজা খোলে, বলে,—আসুন—আসুন?

গিরিশ ঘরের ভিতরে ঢুকে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়েন। তারপরে অবসন্নভাবে বলেন,—বিনোদ, আমার পাপে ঠাকুরের দুরারোগ্য ব্যাধি—ক্যানসার হয়েছে!

বিনোদ আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে,—বলছেন কী!

গিরিশ বলেন,—হ্যাঁ বিনোদ—আমি তাঁকে বকলমা দিয়েছিলুম—সেজন্য আমার যত পাপের বিষ নিজের কণ্ঠে ধারণ করে ঠাকুর নীলকণ্ঠ হয়েছেন!

বিনোদিনী ডুকরে ওঠে,—ঠাকুর – ঠাকুর!

তারপর দুহাতে মুখ চেপে ধরে কান্না সামলাতে।

গিরিশবাবু বলেন,—তুমি তবু কাঁদতে পারছো! আমার কান্না সব জমাট বেঁধে পাথর হয়ে গেছে!

বিনোদিনী বললে,—আমি ওঁকে দেখতে যাবো।

—ওঁকে শ্যামপুকুরে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু যাকে তাকে ঢুকতে দিচ্ছে না! দরজায় পাহারায় রয়েছে নিরঞ্জন—সে বড়ো কঠিন দ্বারী!

—কিন্তু আমি যাবোই! তাঁকে একটি বার না দেখে আমি কিছুতেই শান্তি পাবো না! আপনি আমায় নিয়ে চলুন।

গিরিশবাবু কথাটা শুনে আঁতকে উঠলেন। বললেন,—না না আমি যাবো না! তুমি বরং আমাদের কালীকে ডেকে পাঠাও—সে আমার গাড়িতে বসে রয়েছে। সে অনেক কায়দা জানে, যদি তোমাকে কায়দা করে ঠাকুরের কাছে নিয়ে যেতে পারে!

বিনোদিনী বললে,—আমি নিজে গিয়ে কালীদাকে ডেকে আনছি!

বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

দিনের বেলা। শ্যামপুকুরের একটি বাড়ির ওপরের একটি ঘরে ঠাকুর শুয়ে আছেন। শুয়ে আছেন—বালিশ দিয়ে একটু উঁচু করে আধ বসার মতো। দেখা গেল, বারান্দার ওদিক দিয়ে দানাকালীর সঙ্গে তরুণ এক সাহেব আসছে হ্যাট-কোট পরে।

সাহেব এসে ঘরে ঢুকলো। ঠাকুর তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। বললেন,—এসো—এসো। আবার সেই কথাটাই বলি—তোমার চৈতন্য হোক!

'সাহেব' আর কেউ নয়, বিনোদিনী! অবাক হয়ে বললে—চিনেছেন!

টুপিটা খুলে ফেলে। ঠাকুর বলেন,—'আমি ভবে একা—দাও হে দেখা' কী সুন্দর গানই না গেয়েছিলে সেদিন!

বিনোদিনীর মাথার চুল পিঠ ছেড়ে এলিয়ে পড়েছে। সে 'ঠাকুর' বলে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো ওঁর পায়ের কাছে—মেঝের ওপর!

আর একদিন রাত্রের ঘটনা। ঠাকুর শুয়ে আছেন, ভক্তরা মেঝেতে বসে। তার মধ্যে গিরিশও রয়েছেন। তানপুরা নিয়ে নরেন দত্ত (পরে বিবেকানন্দ) মনপ্রাণ ঢেলে গাইছিলেন গিরিশচন্দ্রেরই গান: 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই! কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই! ফিরে ফিরে আসি, কতো কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই!'

ষ্টারে এরপর অভিনীত হলো গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল'—১৮৮৬ সালের ১২ই জুন। নামভূমিকায় অমৃত মিত্র, চিন্তামণি—বিনোদিনী, সাধক—বেলবাবু, ভিক্ষুক—অঘোর পাঠক, বণিক—উপেন্দ্র মিত্র, সোমগিরি—প্রবোধ ঘোষ, অহল্যা—বনবিহারিণী (ভুনি), থাকমণি—ক্ষেত্রমণি, পাগলিনী—গঙ্গামণি, ইত্যাদি। এই নাটক সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন,—'নাটকটি প্রায় পঞ্চাশবার আমি পড়েছি এবং প্রতিবারই নতুন কিছু পেয়েছি।'

ভগিনী নিবেদিতা এটির ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন। এক কথায়, এই নাটক রঙ্গমঞ্চে আর একবার ভাবের বান ডাকালো। এই নাটকের পাগলিনীর ভূমিকায় গঙ্গামণি দর্শকদের মাতিয়ে দিতো, বিশেষ করে গানে। আর বিনোদিনীর অভিনয় সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখে গেছেন—'বিল্বমঙ্গল' সেই হইতে আজি পর্যন্ত বহু রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হইয়াছে এবং বড় বড় অভিনেত্রী চিন্তামণির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু বিনোদিনী যেরূপ চিন্তামণির ভূমিকা করিয়া গিয়াছে, সেরূপ সর্বাংগ সুন্দর অভিনয় আজ পর্যন্ত কাহারও হয় নাই।'

ধরা যাক নদী তীরের সেই বিখ্যাত দৃশ্যটির কথা। বিনোদিনী বর্ষার ভরা নদীর ভয়ঙ্করী রূপ দেখে শিউরে উঠলো,—উঃ! এখনো নদী যেন রণমুখী! এই নদীতে তোমার ঝাঁপ দিতে সাহস হলো বিল্বমংগল ঠাকুর? কই, যে কাঠ ধরে নদী পার হয়ে আমার কাছে এলে, সে কাঠ কই?

অমৃত মিত্র (বিল্বমঙ্গল) নদীতে কিছু একটা দেখিয়ে বললে—ওই!

বিনোদিনী এগিয়ে গিয়ে সেটা দেখে চমকে উঠলো, বললে—একী! এ তো কাঠ নয়, এ যে পচা মড়া!

ওর কাছে এসে দাঁড়ালো চিন্তামণি রূপিনী বিনোদিনী—তুমি সত্যিই উম্মাদ! তোমার লজ্জা নেই, ভয় নেই, তুমি দড়ি বলে সাপ ধরো, কাঠ বলে পচা মড়া ধরো! আমি বেশ্যা, তোমার এই মন যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হতো বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, তোমার কাজ হতো!

কথাটা বিল্বমঙ্গলের মনে লাগে। সে মনে মনে আওড়ায়—'কাজ হতো!'

এমন সময় গান গাইতে গাইতে পাগলিনী ঢোকে,—আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে। যেখানে যাই যায় সে পাছে, আমায় বলতে হয় না জোর করে!'

গান গাইতে গাইতে পাগলিনী রূপিনী গঙ্গামণি চলে যাবার পর বিল্বমঙ্গল বলে, আমার কি কেউ নেই? আছে, নইলে ঘোরতর তরঙ্গ মধ্যে কে আমায় শবদেহ ভেলা দিলে! করাল কালসর্পের দংশন হতে কে আমায় বাঁচালে! কে তুমি! আমি অন্ধ, তাই তোমায় দেখতে পাচ্ছি না! কে আমায় চক্ষু দেবে!

বিল্বমঙ্গল-এর মাস দুই পরের ঘটনা। মঞ্চের সাজঘরের দেওয়ালে সাজানো রামকৃষ্ণদেবের সেই ফটোখানি, ঝুলছে মালা, পুড়ছে ধূপ। অনেকে এসে নমস্কার করছে।

বিনোদিনীর সাজঘরে বিনোদিনী টেবিলে মাথা রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছে। কাছেই দাঁড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো গিরিশচন্দ্র, খালি গা, মাথার চুল এলোমেলো,

গায়ে সাদা একখানা চাদর। তিনি বলছিলেন,—আজ তোমার নয়—আমার নয় — সারা দেশের শোক! আজ আঠারো শ ছিয়াশি সালের শ্রাবণ-সংক্রান্তির দিন—১৫ই আগস্ট আমাদের পরমারাধ্য ঠাকুর আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন!

বিনোদিনীর কান্না তখনো থামে নি।

কিন্তু সময় থেমে থাকে না—সে ঠিক চলতে থাকে নিজের ছন্দে। এলো ডিসেম্বর মাস। ১৮৮৬-র ২৫শে ডিসেম্বর অভিনীত হলো গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিক বাজার।' দুকড়ি সেন—অমৃতলাল বসু, পিসী—ক্ষেত্রমণি, ললিত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গদার—বেলবাবু, পুঁটিরাম—মহেন্দ্র চৌধুরী, ক্ষুদিরাম প্রবোধ ঘোষ, চীনেম্যান ও আরও দুটি ক্ষুদ্র ভূমিকায়—রামতারণ সান্ন্যাল এবং রঙ্গিনীর ভূমিকায়—বিনোদিনী।

বেংগল থিয়েটারে তখন রাজকৃষ্ণ রায়ের অনেকগুলো নাটকের অভিনয় হয়। কিন্তু সেরকম দাঁড়াতে পারে না নাটকগুলি।

অন্য একদিনের কথা। দিনের বেলা। বিনোদিনীর বাড়ি। চিলেকোঠা। ওর দিদিমা রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সামনে বসে চন্দন বাটছিলেন। বিনোদিনী কাছে এসে দাঁড়ালো। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে দিদিমা মুখ তুলে তাকালেন,—কী লো! থিয়েটারে যাবি নি—রিহার্স্যাল দিতে?

বিনোদিনীর দৃষ্টি তখন রাধাকৃষ্ণের মূর্তির দিকে। সে বললে—না দিদিমা—থিয়েটার আর ভালো লাগছে না!

—সে কী! ঐ থিয়েটার থেকেই তো তোর নাম—যশ—সব-কিছু।

—সব ফাঁকি—দিদিমা—সব ফাঁকি! যাদের জন্য এত করলুম—তারা যেন সব কেমন হয়ে গেছে! আমাকে বেল্লিক-বাজারে কী সাজতে হচ্ছে জানো? রঙ্গিনী। এ-সব রঙ্গিনী সেজে ছলাকলা করতে আর ভালো লাগে?

বিনোদিনীর মা তখন সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি ছাদে উঠে আসছিলেন। এসে তিনি দাঁড়ালেন চিলেকোঠার দোর গোড়ায়। বললেন,—ও বিনি! সেই ভদ্রলোকটি এসেছে তোর সঙ্গে দেখা করতে এক যুগ পরে! শীগ্‌গির আয়।

বিনোদিনী বললে,—আর কেন মা! অনেক তো হলো! ওদের হটাও না?

—হটাচ্ছি তো! কতো লোক কতো কী নিয়ে আসছে হাতে করে। সবাইকে হটাচ্ছি। হটাচ্ছি না? তবে—এ-মানুষটি তেমন নয়। দেখলেই চেনা যায়! এ হচ্ছে তোর সেই রাঙাবাবু!

সবিস্ময়ে উঠে দাঁড়ায় বিনোদিনী— রাঙাবাবু!

বিনোদিনীর ঘরে সত্যিই বসেছিলেন রাঙাবাবু। ওকে দেখে তিনি বললেন

লাগলেন,—কেন যেন মনে হলো এবার সময় হয়েছে। আমার এখন আসা দরকার।

বিনোদিনী অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে তাকালো। রাঙাবাবু বললেন,—সংসারে দেখলে তো অনেক—জানলেও অনেক! কিন্তু একটা দিক তোমার এখনো দেখা হয় নি। সে হচ্ছে তোমার বধূ-জীবন!

—কিন্তু আমার থিয়েটার?

—থিয়েটারই বা তোমাকে কী দিয়েছে! আমি সব জানি। সেখানেও তো তুমি বঞ্চিত।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ান রাঙাবাবু। কাছে এসে বলেন – প্রতীক্ষার মালাগাছি হাতে নিয়ে বহুদিন ধরে আমি দাঁড়িয়ে আছি! আমরা বৈষ্ণব—আমাদের সংসারে বিয়ে হয় মালা-চন্দন দিয়ে নারায়ণ সাক্ষী করে। আমিও সেইভাবে তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে যেতে চাই--বধূবেশে! রঙ্গিনী নয়—চিন্তামণি নয়—বরং বলতে পারো মেঘনাদের প্রমীলা।

বিনোদিনী কথাগুলো মন দিয়েই শুনছিল। কিন্তু এ-প্রস্তাবে সে শিউরে উঠলো,—না-না-অমন প্রলোভন আপনি আমাকে দেখাবেন না!

সরে যায় সেই ডালা-ভাঙা টেবিল-হারমনিয়মটার কাছে। তার ডালাটা তখনো সেই অবস্থায় দু-আধখানা হয়ে কাটা পড়ে আছে। ধীরে ধীরে তার কাছে আসেন রাঙাবাবু। বলেন, মানুষের জীবনস্রোত তো এক জায়গায় থেমে থাকে না! তাকে চলতে হয়—ভাঙা জিনিসকে জোড়া দিয়ে আবার তাকে উঠে দাঁড়াতে হয়!

শুনতে শুনতে এবার চোখে জল আসে বিনোদিনীর! সেই জলভরা চোখ নিয়ে বিনোদিনী তাঁর দিকে তাকায়। রাঙাবাবু বললেন,—আমি এসেছি প্রয়োজনে। তোমারও প্রয়োজন। আমারও প্রয়োজন। আমার ঘরে গেলেই বুঝতে পারবে! আমি তোমাকে ধোঁকা দিতে চাই না। আমি বিবাহিত, একটি ছেলেও আছে আমার। খুবই ছোট। কিন্তু তবু আমার তোমাকে দরকার—আমার শূন্য বুক ভরিয়ে দিতে!

—শূন্য বুক!

—হ্যাঁ। আমি সেই বেঙ্গল থিয়েটারের আমল থেকে তোমার দিকে তাকিয়ে আছি! কতো বছরের কথা বলো তো? কখনো হাত বাড়াই নি। নীরবে প্রীতির পুষ্প অঞ্জলি দিয়ে এসেছি!

—এ-অঞ্জলি তো বিনোদিনীর জীবনে নতুন নয়। কিন্তু বধূ জীবন—?

—সেই অনাবিষ্কৃত দিকই তুমি আবিষ্কার করবে চলো। আমি বলছি, তুমি সুখী হবে।

চোখ তুলে তাকায় বিনোদিনী। পরিপূর্ণ দুটি চোখ মেলে, তারপরে খুব নরম, খুব ধীর গলায় বলে—আমাকে ভাবতে একটু সময় দাও।

—বেশ।

চলে যান রাঙাবাবু। দিনের আলো নিভে গিয়ে রাত্রি নেমে আসে। জানালার বাইরে উঁকি দেয় পূর্ণিমার চাঁদ। মধুমাস। কোথা থেকে যেন কোকিল ডেকে ওঠে—কুহু—কুহু!

বিনোদিনী জানালার কাছে গিয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখনো চলেছে কুহুরব!

সে রাত্রে বিছানায় শুয়ে সহজে ঘুম আসতে চায় নি। নানান কথা—নানান ছবি—ভিড় করে আসছিল মনে! হঠাৎ কেন কে জানে, মনে পড়ে গেল গিরিশবাবুর 'রাবণ-বধ' নাটকের কথা। সে সেজেছিল সীতা। অশোক-কাননে সরমাকে বলা তার সংলাপ ঘুরে ফিরে মনে আসতে লাগলো—শুনলো সরমে, প্রাণ-সই, ঘোর নিশাকালে, ঘুমাইলে চেড়ীদল, কে রমণী নলিনী-নিন্দিত পাণি, বীণা-ধ্বনি বিনিন্দিত বাণী বসিয়ে শিয়রে, কন বিধুমুখী আমি রে জননী তোর! পরমান্ন দেয় মুখে, নিরাহারে বাঁচে প্রাণ!

মনে পড়ে যায়, প্রত্যেক 'চরিত্র' অভিনয় করবার আগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু জেনে নেবার বাতিক ছিল তার। গিরিশবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—এই যে সীতা বলছে কে এক রমণীর কথা, যিনি বলেছেন সীতাকে, 'আমিরে জননী তোর!'—ইনি কে? সীতা-জননী বসুমতী?

গিরিশবাবু বলেছিলেন,—হ্যাঁ।

তিনি আর কিছু বলেন নি। কিন্তু ঐ বইয়ে সীতা-অভিনয় কালে ঐ পার্ট বলার সময় সে অনুভব করতো, কেউ একজন তার আছে, অন্তরীক্ষে বসে তিনি ওর জীবনের গতি-প্রকৃতির জাল বুনে চলেছেন! তিনিই কি তার জীবনে—সর্বরিক্ততার কালে—এনে দিলেন রাঙাবাবুকে?

আজ তার বয়স তেইশ। কিন্তু 'রাবণ বধ-এ' সীতা যখন সে করে তখন ছিল আঠারো বছর বয়স। সেই সময় তার অভিনয় দেখে একটি বারো বছরের বালিকা উদ্দীপিত হয়েছিল। বয়সে সে ছিল বিনোদিনীর থেকে ছয় বছরের ছোট। কিন্তু বিনোদিনী অভিনয় ছেড়ে দেবার পর এই মেয়েটিই কালে মঞ্চ জগতে 'বড়বিবি' নামে প্রখ্যাত হয়েছিল। এর নাম—তিনকড়ি। বাচ্চা বয়স থেকেই ভিখারীদের মুখে গান শুনে তুলে নিতে পারতো, গলাও ছিল মিষ্টি। এরও জন্ম কলকাতার কোনো নিষিদ্ধ পল্লীতে, কিন্তু তিনকড়ির মায়ের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। 'রাবণ-বধ' দেখে এসে সে থিয়েটারে ঢোকবার জন্য মায়ের কাছে প্রবল আবদার করতে থাকে। মা এক

পরিচিত ভদ্রলোককে ধরে মেয়েকে ষ্টার থিয়েটারে পাঠিয়ে দেয়, তখন গিরিশবাবু 'রূপ-সনাতন' নাটকটির মহলা দিচ্ছিলেন। বারো বছরের মেয়েটি সে-নাটকে কোনো ভূমিকা পেল না বটে, কিন্তু বিল্বমঙ্গল-এর পুনরভিনয়ে সে একটি নির্বাক সখীর পার্ট পেয়েছিল, রাধাকৃষ্ণের মিলন দৃশ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু চামর ঢোলানো। এই সময় বিনোদিনী ছিল না। তারপরে একদিন 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এ বাসরে বাসর-সঙ্গিনী সেজে বসতে গেলো. এটাও নির্বাক ভূমিকা। তার পরে ষ্টারে খোলা হলো ১৮৮৭ সালের ২১শে জুন তারিখে 'রূপ-সনাতন'। এতে 'বিশাখা' চরিত্রে যে অভিনেত্রীটি অভিনয় করে, সেই কিরণবালাকেই গিরিশবাবু বিনোদিনীর অভিনীত চরিত্রগুলিতে তৈরি করে রাখছিলেন। ঐ সালেরই ৩১শে জুলাই 'বুদ্ধদেব' ও 'বেল্লিক বাজার' করে ষ্টার থিয়েটার মঞ্চ থেকে বিদায় নেয়। 'রূপ-সনাতন'-এ চৈতন্য সাজতেন বেলবাবু, রূপ—উপেন্দ্র মিত্র, সনাতন—অমৃত মিত্র, সুবুদ্ধি—অমৃতলাল বসু, অলকা—বনবিহারিণী (ভুনি)। করুণা ও চৌবের স্ত্রী গঙ্গামণি।

যাই হোক, ষ্টারের পর ঐ মঞ্চের নতুন থিয়েটার 'এমারেল্ড।' ধনকুবের গোপাললাল শীল, 'অর্ধেন্দুশেখর ও বাংলা থিয়েটার'-এর লেখক শঙ্কর ভট্টাচার্যের ভাষায় 'সুকৌশলে ষ্টারের বাড়ির জমি কিনে নিয়ে স্বত্বাধিকারীদের প্রতি উচ্ছেদের নোটিশ জারি করলেন। তাঁরা তিরিশ হাজার টাকার বিনিময়ে গোপালবাবুকে বাড়ি ছেড়ে দিলেন, কিন্তু ষ্টারের নাম (গুডউইল) হাতছাড়া করলেন না।[৮] ঐ টাকায় তাঁরা হাতিবাগানের জমি কিনে আবার ষ্টারের ভিত পত্তন করলেন।

ষ্টারের প্রতিপত্তি দেখেই বড়োলোক গোপাললাল শীলের নাকি থিয়েটার করার ইচ্ছা জেগেছিল, তারই পরিণতি হলো এমারেল্ড। গোপালবাবু গিরিশবাবুকেই প্রথমে কর্মাধ্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি শিষ্যদের ছেড়ে যেতে রাজী হননি। তাই তিনি ম্যানেজার করে আনলেন কেদার চৌধুরীকে। শিল্পী গোষ্ঠীর মধ্যে রইলেন অর্ধেন্দুশেখর, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর, ক্ষেত্রমণি, বনবিহারিণী (ভুনি), কিরণশশী (ছোটরাণী) এবং সর্বোপরি গোলাপসুন্দরী বা সুকুমারী। এ-ছাড়া এলেন ধর্মদাস সুর। ১৮৮৭ সালের ৮ই অক্টোবর কেদার চৌধুরীর 'পাণ্ডব নির্বাসন' দিয়ে এমারেল্ডের দ্বার উদ্ঘাটন হলো, এতে সুকুমারী ছিলেন না, বোধহয় তিনি কিছু পরে এসে যোগদান করেন। এতে ছিলেন ধৃতরাষ্ট্র—অর্ধেন্দুশেখর, দুর্যোধন—মহেন্দ্রলাল বসু, যুধিষ্ঠির—মতিলাল সুর, শকুনি—রাধামাধব কর, ভানুমতী—কিরণ শশী, দ্রৌপদী—বনবিহারিণী (ভুনি)।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ষ্টার থেকে ক্ষেত্রমণি আর বনবিহারিণী এলেন কেন ? ষ্টার বাড়ি ছাড়লেও হাতিবাগানে নতুন বাড়ি তৈরির প্রয়াসে নিরত, এবং সে সময় দলকে বসিয়ে না রেখে ওঁরা চলে গেলেন ঢাকায় অভিনয় করতে। দলে বালিকা তিনকড়ির যাবার কথা ছিল, কিন্তু ওর মা ওকে ছাড়তে রাজী না হওয়ায় সে ষ্টার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম, ক্ষেত্রমণিকে বেশি না নামিয়ে কর্তৃপক্ষ গঙ্গামণিকে সুযোগ দিচ্ছিলেন বেশি, আর বিনোদিনীর জায়গায় বনবিহারিণীকে সুযোগ না দিয়ে ওঁরা তুলছিলেন কিরণবালাকে। মনে হয় এ-জন্যই ওঁরা এমারেল্ডে চলে আসেন।

কিন্তু কেদার চৌধুরীর অধিনায়কত্বে 'এমারেল্ড' জমলো না। ঐ সালেরই ১৩ নভেম্বর খোলা হলো পুরোনো নাটক 'আনন্দ কানন'। এতে অর্ধেন্দু অবিবেক সাজলেও নাটকের বিক্রি তেমন হলো না। অতএব গোপাললাল শীল জিদ ধরলেন, যেমন করে হোক গিরিশচন্দ্রকে আনতেই হবে। শঙ্কর ভট্টাচার্য লিখেছেন, আগাম বিশ হাজার টাকা আর মাসিক সাড়ে তিনশো টাকা মাইনেতে পাঁচ বছরের কড়ারে এমারেল্ডের ম্যানেজারি নেবার জন্য গোপালবাবু গিরিশবাবুর কাছে প্রস্তাব পাঠালেন। অন্যথা গুণ্ডা ও আগুনের সাহায্যে তিনি ষ্টার নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। গিরিশচন্দ্র পড়লেন উভয় শঙ্কটে। গিরিশচন্দ্র তাঁর শিষ্যদের বললেন, লোকটা অপরিমিত ধনী, গোঁয়ার ও খেয়ালী, থিয়েটারের ক্ষতি করার চাইতে তার মতে মত দেওয়াই ভালো। বৎসরান্তে গোপাললালের থিয়েটারের নেশা কেটে গেলে আমি আবার ফিরে আসবো। গিরিশচন্দ্র গোপাল প্রদত্ত বোনাসের বিশ হাজার টাকার থেকে ষোলো হাজার টাকা শিষ্যদের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, এই টাকা দিয়ে তোমরা হাতিবাগানে নিজস্ব থিয়েটার বাড়ি বানাও। তোমাদের প্রয়াস ব্যর্থ হবে না, যদি তোমরা নাট্য শিল্পের ও নাট্য শিল্পীদের মর্যাদা রক্ষা করে চলো। এমারেল্ডে গিরিশের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই কেদার, অর্ধেন্দু রাধামাধবের প্রস্থান হলো।

ইতিমধ্যে বিনোদিনী মন স্থির করে ফেলেছিল। দেখা যায়, বিনোদিনীদের বাড়ির ছাদেই চাঁদোয়া খাটিয়ে বিয়ের বাসর বসেছে। পুরোহিতের সাহায্যে বৈষ্ণব মতে নারায়ণ ও অগ্নিসাক্ষী করে বিনোদিনীর সঙ্গেবিয়ে হচ্ছে রাঙাবাবুর। এই রাঙাবাবুর প্রকৃত নাম কী তা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা হয়েছে। কেউ বলে তাঁর প্রকৃত নাম, কালীপদ ঘোষ বা দানাকালী। সেই দানাকালী, যিনি বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইনি ছিলেন গিরিশবাবুর বন্ধু ও মদ্যপ। কিন্তু ঠাকুরের সংস্রবে আসবার পর এঁর পান দোষ আর ছিলনা। ইনি ঠাকুর কেন, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরে স্বামী বিবেকা-

নন্দর সংস্রবে এসেছিলেন। স্টার তখনো ছাড়েনি বিনোদিনী। স্টারে হচ্ছিল 'বিল্বমঙ্গল'। বিনোদিনী—চিন্তামণি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর রত্নাকর গিরিশচন্দ্র'—বইতে লিখে গেছেন,—'নরেনও একদিন এসেছিল বিল্বমঙ্গল দেখতে। অভিনয় শেষ হবার পর নরেনকে নিয়ে রঙ্গ মঞ্চে এলো গিরিশ। নর্তক-নর্তকীরা চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে তানপুরা নিয়ে বসলেন নরেন। হলঘর নিরিবিলি, নরেন ভজন ধরলেন। নট-নটিরা আর চাপাল্য করবার অবকাশ পেলো না। এ কী গান!

অচিন্ত্যকুমার গানটির কথা উল্লেখ করেন নি। কিন্তু আমরা লোক-পরম্পরায় যা শুনেছিলাম, গানটি ছিল স্বামীজীর নিজেরই রচনা। বিল্বমঙ্গল দেখার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির রেশ ছিল তাঁর মধ্যে। তাই বোধ হয় সে রাত্রে তিনি গিয়েছিলেন, 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতি, নাহি শশাঙ্ক সুন্দর। ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর।'

কিন্তু বলছিলাম আমরা কালীপদ ঘোষ বা দানাকালীর কথা। অচিন্ত্য কুমার লিখে গেছেন 'রত্নাকর গিরিশচন্দ্র' বইয়ের ৫৩৯ পৃষ্ঠায় [অচিন্ত্য কুমার-রচনাবলী : সপ্তম খণ্ড] : 'কালীপদ বিনোদিনীর বাবু হয়েছে।' এই সূত্র তিনি কোথায় পেলেন জানিনা। বিনোদিনী তার জীবনীতে ভদ্রলোকের নাম করেনি, আমরাও তাঁর নাম না দিয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র যাত্রাপালার অনুসরণে 'রাঙাবাবু'ই বলে যাবো।

এই প্রসঙ্গে কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আমি একটি বিশেষ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করতে চাই। রমাপতি দত্ত-রচিত 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' গ্রন্থে ঘটনাটির উল্লেখ আছে। অতি তরুণ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তখনকার দিনের পৌরবিভাগীয় নির্বাচন-উপলক্ষে একটি ছড়া লিখেছিলেন। এই ছড়ায় 'মেনি' শব্দটির উল্লেখ আছে। বিনোদিনীর অন্যতম ডাকনাম ছিল 'মেনি'। রমাপতি দত্ত লিখেছেন, "১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যখন অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক, স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয় ১নং ওয়ার্ড হইতে মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হইবার জন্য নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন, তখন অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ভোট-সংগ্রহে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। মতিবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন—রায় পশুপতিনাথ বসু ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু। উভয়েই স্বনামধন্য ব্যক্তি, পরিচয় নিষ্প্রয়োজন এবং ভোটাধিক্যে তাঁহারা মতিবাবুকে পরাজিত করেন। ফলাফল যাহাই হউক, সেই নির্বাচনদ্বন্দ্ব তখনকার দিনে কলিকাতায় একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রতিবাদী দলগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার খিস্তি খেউড় গাহিয়া শহর সরগরম করিয়া ফেলিয়াছিলেন।" এঁদের বিরুদ্ধে হ্যাণ্ডবিলে লিখেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ "তুমি মেনীর সনে প্রমোদ বনে করবে

মধুরে কোলি। সে আওয়াজ দেবে 'মিউমিউ'—বলবে মিঠে বুলি। তার মুখের পানে চেয়ে চেয়ে শুনবে প্রেমের কথা। মারবে ঝাঁটা মানের মুখে—বুকে দেবে ব্যথা।" ইত্যাদি। আমার প্রশ্ন এই 'মেনী' কে? বিনোদিনী? তাহলে তার স্বামী রাঙাবাবুর আসল নাম কী? উক্ত ভদ্রলোক দুজনের মধ্যে বয়সে তরুণ ভূপেন্দ্রনাথ বসু। অবশ্য এই ভোটরঙ্গ হয় ১৮৯২ সালে। তখন বিনোদিনীর বিবাহের পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কিন্তু হলে হবে কী? খিস্তিখেউড় তখনকার দিনে রেওয়াজ ছিল, আর সে খিস্তিখেউড়ে লোকে অতীত ধরে টান দিতো, আর 'তিল'কে 'তাল' করতে তারা তখন ছিল ওস্তাদ। অবশ্য এই 'মেনী' যে বিনোদিনী, এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। 'মেনী' কি অন্য স্ত্রীলোকের নাম হতে পারে না? হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে। বিনোদিনীর খ্যাতি ছিল, সেজন্য তার গোপন-নামটা থিয়েটার জগতের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েও পড়তে পারে। যা বলছি তা মাত্র অনুমান: কিন্তু সে যাই হোক, আমাদের পুরানো কথায় ফিরে আসি।

রাঙাবাবুকে দেখে ততটা বোঝা যায় নি, তাঁর জাঁকজমকের তেমন বহিঃপ্রকাশ নেই। আসলে তিনিও সবিশেষ অবস্থাপন্ন। উত্তর কলকাতা অঞ্চলেই তাঁর বাড়ি। বাড়িতে দেউড়ি আছে, দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছে দারোয়ান। জুড়ি গাড়ি করে বধূবেশে সেই দেউড়ির মধ্যে ঢুকলো বিনোদিনী। পিছনে আসছে সাহেবদের ব্যান্ডপার্টি, যাকে তখনকার দিনে 'গোরাবাদ্যি' বলা হতো। গাড়ি দেউড়ি ছাড়িয়ে অট্টালিকার থামওয়ালা সম্মুখভাগে এলো। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আশ্রিত পরিজন, চাকর-বাকর ও কর্মচারীবৃন্দ। গাড়ি সেখানেও না থেমে একটু এগিয়ে ডাইনে বাঁক নিয়ে একটা নতুন বানানো দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। এখানে অনেকে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির দরজায় মঙ্গল-ঘট, ইত্যাদি। গাড়ির উর্দি-পড়া সহিস নেমে এসে দরজা খুলে দিলো। বরবেশে রাঙাবাবু নিজে নেমে বধূ বিনোদিনীর হাত ধরে তাকে নামালেন। ব্যান্ডপার্টির বাজনা ছাপিয়ে শাঁখ বেজে উঠলো।

নতুন বাড়ি আর পুরানো বাড়ির মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকালে দেখা যাবে, নতুন বাড়ির দোতালায় কোনো বাইরের বারান্দা নেই। কিন্তু পুরানো বাড়ির আছে। সেখানে চিক ফেলা। চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে রাঙাবাবুর প্রথম পক্ষের বউ। একটু স্থূলকায়া, শ্যামবর্ণ, নাকে নথ, সর্বাঙ্গে গয়না, একটু গর্বিত ভাবভঙ্গি। তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল পাঁচ বছরের ফুটফুটে একটি ছেলে। মুখের সাদৃশ্য থেকেই বোঝা যায় কার ছেলে সে। সে একটুক্ষণ দেখে তারপরে

দৌড়ে পালাতে গেল। উদ্দেশ্য নিচে গিয়ে ঐসব দেখা। কিন্তু তার মা হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেললো। চোখের তিরস্কারে তাকে নিরস্ত করলো।

এবার আমরা দেখছি নতুন বাড়ির দোতালার একাংশ। এ-বাড়িতে অবশ্য চিকের বাড়াবাড়ি নেই। ভিতরের বারান্দা দিয়ে রাঙাবাবু-বিনোদিনী বরবধূ বেশে হেঁটে এসে ঠাকুরঘরের সামনে দাঁড়ালো। পুরোহিত মশাই সসম্ভ্রমে একটু সরে দাঁড়ালেন। সুন্দর রাধাকৃষ্ণমূর্তি। তার পাশেই ঠাকুর রামকৃষ্ণর বড়ো একটি ছবি, মাল্যভূষিত। ওরা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো।

নিচে, গোরা ব্যাণ্ড মাষ্টার তখন আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাণ্ড-বাজনার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। থেমে গেল ব্যাণ্ড-বাজনা।

রাঙাবাবু বিনোদিনীকে নিয়ে সাজানো-গোছানো প্রশস্ত শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। বললেন,—এই তোমার আসল ঘর। শয়ন-মন্দির। ওপাশে বসবার ঘর—এপাশে লাইব্রেরী। আসলে এ-মহলটাই পুরোপুরি তোমার। কেউ ডিসটার্ব করতে আসবে না।

এই সময় একটি তরুণী দাসী এসে ওদের প্রণাম করলো গলবস্ত্র হয়ে!

তার দিকে তাকিয়ে রাঙাবাবু বললেন,—এটির নাম মালিনী—তোমার খাস দাসী।

তারপর মালিনীকে উদ্দেশ করে বললেন,—হ্যাঁরে সব ঠিক আছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ট্রেতে করে একজন চাকর দু-গেলাস বরফ দেওয়া সরবৎ নিয়ে এসে টিপয়ে রাখে। একটি গেলাস তুলে মালিনী বিনোদিনীর হাতে দেয়,—নিন-ছোট মা।

অন্যটি নিজেই তুলে নেন রাঙাবাবু। চুমুক দিয়ে শেষ করে, তারপর বলেন—এই ঘরে একটা জিনিসের অভাব তুমি লক্ষ্য করছো, না? টেবুল-হারমনিয়ম বা ছোটখাটো পিয়ানো। সেটা আছে পাশের বসবার ঘরে। এসো না? দেখবে?

বিনোদিনীর সরবৎ খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। গেলাসটা রাখতে যেতেই মালিনী হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেয়। বিনোদিনী স্বামীর সংগে বসবার ঘরে যায়।

ঘরটি চমৎকার সাজানো। ধবধবে সাদা ভেনাসের একটা প্রস্তর মূর্তি আছে। দেওয়ালে টাঙানো আছে বড়ো বড়ো দু-তিনটি ইংল্যাণ্ডের পল্লী অঞ্চলের নৈসর্গিক দৃশ্য। একপাশে ছোট আকারের পিয়ানো। সেখানে ওরা দুজনে এসে দাঁড়ান। বিনোদিনীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। জানালার বাইরে পুরানো বাড়িটা দেখা যায়। রাঙাবাবু সেদিকে হাত দেখিয়ে বলেন,—ও-বাড়িটা হচ্ছে আমার হিসেবের খাতা। ওখানে টাকার অঙ্ক আর

বিষয়-আশয়ের হিসেব ছাড়া আর কিছু নেই। আর, এই নতুন বাড়িটা? এ-হচ্ছে আমার ছুটির হাওয়া—কাব্যলক্ষ্মীর পীঠস্থান।

বলতে বলতে ওর হাত ধরেন। বলেন—ওখানে আমাদের জমিদারী; এখানে আমার—কী বলবো? হৃদয়চর্চার বেদীমূল, না, মন্দির?

বলতে বলতে ওর বাহুমূল স্পর্শ করে নিজের দিকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেন। বিনোদিনী ওঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মৃদুভাবে মাথা নাড়ে—অধরে ফুটে ওঠে বিশেষ এক ভঙ্গিমা। চোখের ইঙ্গিতে জানায়: দরজায় লোক রয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে অপ্রস্তুত হয়ে ওর হাত ছেড়ে দেন রাঙাবাবু। দরজার দিকে তাকান। সেখানে বাস্তবিকই কেউ ছিল না। বিনোদিনীর ঠোঁটে দুষ্টুমীর হাসি খেলে যায়, সে মুখটা একটু ফিরিয়ে পিয়ানোর খোলা রীডে হাত রাখে।

সকালবেলা। নতুন মহলের বিস্তৃত ছাদ। একপাশে দাঁড়িয়ে বিনোদিনী আর মালিনী। তাদের সামনেই পুরোনো বাড়ির ছাদ। ও বাড়িও দোতলা, কিন্তু ছাদটা এ-ছাদের থেকে একটু উঁচু। সেই ছাদে দেখা যাচ্ছে পাঁচ বছরের ফুটফুটে একটি ছেলে খেলা করছে। সঙ্গে তার দাসী। বিনোদিনী বললে,—ভারী সুন্দর খোকাটি তো? ও কে রে, মালিনী?

মালিনী উত্তর দিলে,—ও মা! ঐ তো আপনাদের ছেলে! শিবরাত্রির সলতে। নিয়ে আসবো?

—ওর মা আসতে দেবে?

—দেবে না মানে? বাবু বাড়িতে রয়েছেন না? উনি চাইছেন শুনলে মানা করবে কে? বাবুকে গিন্নী ভয়ও করে খুব!

মালিনী ছুটে চলে গেল। বিনোদিনী তাকে অনুসরণ করে নিচে নামে।

রাঙাবাবু তখন ছিলেন লাইব্রেরী ঘরে। এটিও সুন্দর করে সাজানো। প্রচুর বইপত্র। লেখবার টেবিল ও সরঞ্জাম। মেঝেতে গালচে পাতা, বসবার ঘরের মতো। ইজিচেয়ার আছে—পড়বার টেবিলও আছে। রাঙাবাবু ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বই পড়ছিলেন।

বিনোদিনীর শোবার ঘরে খোকাকে কোলে করে মালিনী এসে ঢুকলো। ওকে নামিয়ে দিলো বিনোদিনীর কাছে। বিনোদিনী দু-হাত বাড়িয়ে দিলো।

মালিনী বললে,—যাও? ছোট-মা হয়, যাও?

ছেলেটা সরে আসে বিনোদিনীর কাছে, মুখ তুলে বলে,—ছোট-মা?

বিনোদিনী উচ্ছ্বসিত হয়ে ওকে কোলে তুলে নিলো। গালে গাল ঠেকিয়ে আদর করে বলে উঠলো,—গোপাল—আমার গোপালঠাকুর!

রাঙাবাবুর পুরানো মহলে তার আগের পক্ষের বউ, যাকে সবাই গিন্নী-মা বলে ডাকে, সে বসে আছে আয়েস করে তার নিজের ঘরে। তার পায়ে আলতা পরাচ্ছে নাপিত-বউ। গিন্নী ডাকলো তার খাস-ঝিকে: ও হীরে—হীরে?

'যাই মা.'—বলে সাড়া দিয়ে 'হীরে' ঝি এসে ঢোকে। বছর বাইশ হবে তার বয়স। হীরে আর মালিনী, এরা দুই বোন আসলে। হীরের রং শ্যামলা, মালিনী ফর্সা। মালিনী ছোট, বয়স হবে প্রায় কুড়ি। গিন্নী বললে,—খোকাকে তোর বোন ও বাড়িতে নিয়ে গেছে। ওটি হবে না। ও থিয়েটারের মাগির কাছে আমার ছেলে ঘনঘন যাবে—ওটি আমি হতে দেবো না। আমার সাত রাজার ধন এক মানিক—তাকে আমি হাতছাড়া করবো। যা-নিয়ে আয় এখ্খুনি! বল গিয়ে—দুধ খাওয়ার সময় হয়েছে!

—যাচ্ছি।

বলে তাড়াতাড়ি রওনা দিলো হীরে।

অন্য একদিনের সকাল। দেউড়িতে পেটা ঘড়িতে ঘড়িটা সময় জানাচ্ছে ঢং-ঢং করে সাতটা।

বিনোদিনীর শোবার ঘর। বিছানায় আধ শোওয়া অবস্থায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে খবরের কাগজে পড়ছেন রাঙাবাবু। গ্রীষ্মকাল—মাথার ওপর টানা পাখা চলছে। হঠাৎ একসময় হেঁকে উঠলেন রাঙাবাবু,—মালিনী—মালিনী?

মালিনী ছুটে এলো.—বাবু?

রাঙাবাবু বললেন,—হ্যাঁরে, তোদের ছোট-মা কই রে?

—রান্নাঘরে।

—রান্নাঘরে! কেন? রাঁধবার কি লোক নেই? হ্যাঁরে, নিজে গিয়ে উনুন-তাতে বসে নি তো?

মালিনী একটু লজ্জা পেয়ে বললে,—আমি ডেকে দিচ্ছি।

চলে যায়। আবার খবরের কাগজে মন দেন রাঙাবাবু। একটু পরেই আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ওর কাছে এসে দাঁড়ায় বিনোদিনী। বলে,—কী? ডাকছিলে কেন?

রাঙাবাবু মুখ তোলেন, ওর দিকে তাকিয়ে একটু হাসেন। তারপরে বলেন, ডাকবো না? একতিল না হেরিলে শত যুগ মনে হয়!

—আহা!—ওর কাছে বসে পড়ে বিনোদিনী,—বলো না গো, সাত-সকালে হঠাৎ এমন হাঁক ডাক কেন?

—তুমি. বলো না গো, সাত সকালে উঠে—উনুনের তাতে বসে আমার জন্য মাংসের সিংঙাড়া করছিলে কেন ?

—তুমি কী করে জানলে ! মালিনী বলেছে বুঝি ?

—উঁহু কাউকে বলতে হয় না—আমি হাত গুনে সব বলতে পারি !

বিনোদিনী ওর দিকে হাতটা এগিয়ে দেয়। বলে,—তাহলে—বলো না গো গনৎকার—আমার হাতে কী আছে ?

রাঙাবাবু সাগ্রহে ওর হাত ধরে দেখতে দেখতে বলেন,—বলবো ? তোমার স্টার থিয়েটার কর্পূর হয়ে গেছে !

—সে কী গো !

—তোমার স্টারের বাড়ির নাম এখন এমারেল্ড থিয়েটার। মালিক গোপাললাল শীল। ম্যানেজার গিরিশবাবু।

—আর ভুনিদা ? অমৃত মিত্তিরদা, ওরা ?

—ও'রা হাতিবাগানে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ওপর জমি নিয়ে নতুন স্টার থিয়েটার তৈরি করে ফেলেছেন।

—অতো টাকা পেলেন কোথায় ?

—জোগাড় করেছেন। গিরিশবাবু নিজে দিয়েছেন ষোলো হাজার টাকা। এ-টাকাটা বোনাস পেয়েছিলেন উনি গোপাললাল শীল মশায়ের কাছ থেকে। গিরিশবাবু ওঁদের জন্য লুকিয়ে বেনামে একটা নাটকও লিখে দিয়েছেন—নসীরাম। আজ ২৬শে মে, নতুন 'স্টার' এ খুলছে সেই নাটক।

—আর এমারেল্ড ?

—এমারেল্ডে পুরানো কিছু নাটক করার পর এই ১৮৮৮ সালেরই ফেব্রুয়ারি মাসে সুভদ্রাহরণ করলেন ওঁরা। এতে নাম-ভূমিকায় নামলেন সুকুমারী অর্থাৎ গোলাপসুন্দরী।

—যাক। গোলাপদি এখনো স্টেজে আছেন তাহলে ?

—তা আছেন। ভালো কথা। সেই যে ১৮৭৫ সালে তোমার গোলাপদির লেখা "অপূর্ব সতী" নাটক গ্রেট ন্যাশানালে অভিনীত হয়েছিল ? সেই নাটকখানি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে বসে সেদিন পড়লুম। বইখানা নিয়েই আসতে চেয়ে ছিলুম, বন্ধু কিছুতেই দিলে না ! দাঁড়াও না। শীগ্‌গিরই একখানা কপি জোগাড় করে নিয়ে আসছি।

—দরকার নেই।

—দরকার নেই কী গো ! দারুণ প্লট ! মেয়েটি হচ্ছে একটি—যাকে বলে বারনারীর মেয়ে ! তাকে মোটামুটি লেখাপড়া শিখিয়েছে তার মা। তার ইচ্ছে শিক্ষিত কোনো ছেলের হাতে মেয়েকে সঁপে দেওয়া। পাওয়াও গেল তেমন

একটি ছেলে। সেই ছেলের সঙ্গে মেয়ের যখন ভাব-ভালবাসা জ'মে উঠেছে, তখন এসে জুটলো এক দারুণ বড়োলোক। মায়ের টাকার লোভ। টাকার লোভে ঐ ছেলেটিকে সরিয়ে তারই হাতে স'পে দিতে চাইছে মা ঐ মেয়েটিকে। মেয়ে তা চাইছে না। তার অন্তর্বেদনাই এই নাটকের বিষয়বস্তু।

বিনোদিনীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। সে চোখ মুছে বললে, তার পর কী হলো?

রাঙাবাবু বললেন, মৃত্যু হলো মেয়েটির।

বিনোদিনী চুপ করে রইলো। রাঙাবাবু ওর বিমর্ষ ভাবটা কাটিয়ে দেবার জন্য আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে এলেন, বললেন,—তা যাক। যা বলছিলুম, তাই শোনো। এই যে দ্যাখো। কাগজে সব দিয়েছে। মার্চ মাসে হলো গিরিশবাবুর নতুন নাটক,—'পূর্ণচন্দ্র।' 'হিন্দী' 'পুরান-ভকত'-এর কাহিনী অনুসরণ করা হয়েছে এই নাটকে। এতে গিরিশবাবু সাধু গোরক্ষনাথের চরিত্র এমনভাবে এ'কেছেন, তাতে ঠাকুর রামকৃষ্ণের খানিকটা ছায়া মেলে।

—খুব চলেছিল?

—খুব। এখনো চলেছে। এতে পূর্ণচন্দ্র—তোমার গোলাপদি, রাজা শালিবাহন—মহেন্দ্র বসু। দামোদর—মতিলাল সুর, ইচ্ছা—ক্ষেত্রমণির গোরক্ষনাথ—দাসুবাবু।

—এবার ষ্টারের 'নসীরাম'-এর কথা বলো।

হাতে অনেকগুলো কাগজ ছিল রাঙাবাবুর। দৈনিক-সাপ্তাহিক মিলিয়ে অনেক কাগজ কিনতেন রাঙাবাবু। তার থেকে একখানি বেছে নিয়ে তিনি বললেন—নাম-ভূমিকায় তোমার ভুনিদা—অমৃতলাল বসু। অনাথনাথ—অমৃত মিত্র, যোগেশনাথ ও রাজা—উপেন্দ্রনাথ মিত্র, সোনা—গঙ্গামণি।

এই নামটি কানে যেতেই বিনোদিনী বলে উঠলো,—আমার সই ষ্টারে আছে তাহলে? জানো তো? এর কাছেই আমার গান শেখা।

বলতে বলতে বিনোদিনী আবার কেমন উন্মনা হয়ে গেল। রাঙাবাবুরও রক্তে ছিল নাটকের নেশা। নিজে তিনি মঞ্চে অবতরণ করেন নি বটে, কিন্তু নাট্যশালার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। যে বংশে তাঁর জন্ম, সে বংশের কাছে বঙ্গীয় রঙ্গালয় কম ঋণী নয়। তিনি চাইতেন নাটক নিয়ে বিনোদিনীর সঙ্গে সর্বক্ষণই আলোচনা করতে। বললেন—বিল্বমঙ্গল তো আমি দেখেছিলাম। একদিকে তোমার চিন্তামণি, অন্যদিকে পাগলিনীর ভূমিকায় গানে একেবারে মাতিয়ে দিতো গঙ্গামণি,—তাই না?

বিনোদিনী উত্তর না দিয়ে ও'র কাছ থেকে কাগজটা টেনে নিলো। নিয়ে ভূমিকালিপিটা নিজেই পড়তে লাগলো। পড়তে পড়তে বলে উঠলো,

—এতে বেলবাবু আছে, কাদম্বিনী আছে, কিন্তু কিরণের নাম নেই কেন? কিরণবালা? 'রূপসনাতন'-এ যে আমার ভূমিকা 'বিশাখা'টা করতো?

—কই দেখি?

কিন্তু কাগজটা ওর হাতে দিলো না বিনোদিনী, বললে,—দাঁড়াও আর একটা নাম পেয়েছি। ভীল বালকের ভূমিকায়—তারাসুন্দরী!

নামটা উচ্চারণ করতেই মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বিনোদিনীর, বললে,—জানো? এই বাচ্চা মেয়েটিকে আমিই প্রথম স্টারে নিয়ে গিয়েছিলাম। দিব্যি ফুটফুটে মেয়ে, মাত্র পাঁচ বছর বয়স তখন।

—সে কী? ঐটুকু মেয়েকে—?

—হ্যাঁ গো। ঐটুকু মেয়ের হাত ধরেই স্টারে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমাদেরই মতো ঘরে ওর জন্ম। আমাদেরই মতো অভাবের সংসার ছিল ওদের। ওর মার ছিল দুটি মেয়ে,—নেত্যকালী আর তারাসুন্দরী। তারাই ছোট। তারার মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের খুব ভাব হয়েছিল। তিনিই মাকে বলেন, যদি মেয়েকে থিয়েটারে দেওয়া যায়,—বাচ্চা বয়স থেকেই শেখাপড়া শুরু হয়ে যাবে। দেখতে ফুটফুটে আছে, যদি বাবুদের নজরে পড়ে যায়! বলে বিনোদিনী একটু হাসলো, ম্লান সে হাসি, বললে,—হায়রে মায়ের আশা! যদি মেয়ে আমার খেয়ে-পরে বাঁচে! কিন্তু ঐটুকু মেয়ে কী পার্ট করবে? সে যেত আর আমাদের পাশে চুপটি করে বসে থাকতো। শেষে 'চৈতন্যলীলা'র সময় ওকে বালকবেশে বালকদের ভিড়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো।

—তারপর?

বিনোদিনী বললে,—এখন তারার বয়স বেড়ে কতো হয়েছে? ন'-বছর? এখন আবার সে ফিরে এলো স্টারে, তবে আমাদের স্টার নয়, হাতিবাগানের স্টারে।

রাঙাবাবু বললেন,—চলো না স্টারে? 'নসীরাম' দেখে আসি? তোমার ভীল বালকটিকেও দেখে আসবে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনোদিনী উঠে দাঁড়ালো, বললে,—না।

বলে আর দাঁড়ালো না। কাজের অছিলায় চলে গেল অন্য ঘরে।

রাঙাবাবুর ইচ্ছা ছিল স্টারে যাওয়ার, কিন্তু একা-একা যেতে তাঁর ভালো লাগলো না। স্টারের হয়ে গোপনে ছদ্মনামে 'নসীরাম' লিখে দিলেন গিরিশচন্দ্র, নিজে চুক্তি মতো রয়ে গেলেন ভূতপূর্ব স্টার বাড়িতে, যার নতুন নাম হয়েছে 'এমারেল্ড,' চালাচ্ছেন ধনকুবের গোপাললাল শীল। বিনোদিনী চলে যাবার পর এখানে গিরিশবাবুর নতুন নাটক 'রূপসনাতন' অভিনীত হয়েছিল। তাতে বিনোদিনীর ভূমিকায় নামানো হয়েছিল কিরণবালাকে।

কথায়-কথায় রাঙাবাবু একদিন জিজ্ঞাসা করলেন বিনোদিনীকে,—কিরণবালাকে তুমি চিনতে ?

—বাঃ! চিনবো না!—বিনোদিনী উত্তর দিলে,—'চৈতন্যলীলা'য় সেই তো ছিল আমার 'বিষ্ণুপ্রিয়া!' কেন বলো তো? তার কথা এতো জিজ্ঞাসা করছো কেন ?

রাঙাবাবু বললেন,—কাগজে লিখেছে ওর কথা।

—প্রশংসা করেছে তো? প্রশংসা করবারই কথা। মুখখানা ছিল বড়ো মিষ্টি!

রাঙাবাবু বললেন,—তা যা-ই থাক, কাগজে কী লিখেছে জানো? তুমি তো 'বেল্লিক বাজার'-এ 'রঙ্গিনী' করতে করতে ছেড়ে এলে। তোমার পার্ট গিরিশবাবু দিয়েছিলেন এই কিরণবালাকে।

—বিশাখাও তো ওকে দিয়েছিলেন। রূপসনাতন নাটকের ?

—হ্যাঁ।

—কাগজে লিখেছে, থিয়েটারের অন্য লোকেরা মুখ বেজার করেছিল ওকে বড়ো-বড়ো পার্ট দেওয়ার জন্য, কিন্তু গিরিশবাবু উঠে পড়ে লেগেছিলেন তোমার জায়গায় ওকে তৈরি করে নিতে। ওকে দিয়ে তোমার সব পার্ট করাতে লাগলেন।

বিনোদিনী হাসলো, বললো, তা হোক। বড়ো ভালো মেয়ে। খুবই চিনতাম ওকে। আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট।

—'চৈতন্যলীলা' আবার করেছিল ষ্টার, তাতে কিরণবালা তোমার 'নিমাই-ই' করেছিল। একটা ইংরেজী কাগজ 'রেইজ অ্যাণ্ড রায়ত' লিখেছে, চমৎকার অভিনয় করেছে একেবারে ওর পূর্ববর্তিনীর মতো। অর্থাৎ তোমার মতো।

বিনোদিনী বললে,—কিন্তু আমার মতো ঠাকুরের আশীর্বাদ তো ও পায় নি! আমার এই মাথাটির ওপর হাত রেখে বলেছিলেন,—তোর চৈতন্য হোক!

বলতে বলতে গলা ধরে এলো বিনোদিনীর, নিজেকে সামলাতে সে অন্য দিকে মুখ ফেরালো।

বিনোদিনীকে নিয়ে রাঙাবাবু কোনো থিয়েটার দেখতে যেতে পারেন নি বটে, কিন্তু মনে মনে তিনি জানতেন, থিয়েটারের কথা বিনোদিনী শুনতে চায়। শুনতে চায় অভিনয়ের খবর। রাঙাবাবু নিজে যেতেন না, কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে আলোচনা শুনতেন। শুনলেন, 'নসীরাম' খুব নাম করেছে ষ্টারে, এমন কি, ঐ ন-বছরের বাচ্চা মেয়ে তারাসুন্দরী ভীল-বালকের ছোট্ট ভূমিকাটি এতো চমৎকার করেছে যে, থিয়েটারের লোকেরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছে!

খবরটা শুনে খুশি হলো বিনোদিনী। রাঙাবাবু বললেন,—অমৃত মিত্র মশাই নিজে ওকে হাতে ধরে নাকি এই পার্টটা শিখিয়েছেন।

—তুমি কী করে জানলে ?

—অঘোরনাথ পাঠক। একজন অভিনেতা। তাঁর কাছ থেকে শুনলুম।

বিনোদিনী হাসতে হাসতে বললে,—আর কী শুনে এলে তাই বলো।

—আর যা শুনে এলাম, তা কাগজেই আছে। এই দ্যাখো।

—আমি আর কী দেখবো ! তুমিই বলো না ?

রাঙাবাবু কাগজ পড়তে পড়তে বললেন,—এমারেল্ডে 'তুলসীলীলা' বলে একটা নতুন নাটক খুলেছিল, তারপরে অতুল মিত্রের 'নন্দবিদায়'—তারিখ হচ্ছে একুশে জুলাই। এতে গান লিখে দিয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র।

—এই নাকি তোমার আসল খবর ?

—না। আসল খবর অন্য জায়গায়।

—কী রকম ?

রাঙাবাবু বললেন,—এমারেল্ডে নতুন নাটক গিরিশবাবুরই—'বিষাদ'। এতে মহেন্দ্র বসু, মতিলাল সুর, হরিভূষণ ভট্টাচার্য প্রভৃতিরা তো আছেনই, মেয়েদের মধ্যে ক্ষেত্রমণি, ছোট রাণী, গুলফন হরি ছাড়াও কুসুম বলে একজন অভিনেত্রী 'বিষাদ'-চরিত্রে এমন অভিনয় করেছে যে, মুখে মুখে তার নাম দাঁড়িয়ে গেছে 'বিষাদ কুসুম।'

—তাহলে আর একজন অভিনেত্রী উঠছে বলো ?

—হ্যাঁ। আরও একজনের কথা আমার এক বন্ধুর মুখে শুনলুম। এ মেয়েটি আবার তোমার দারুণ ভক্ত। মেয়েটির বয়স তখন মাত্র বারো বছর, মার সঙ্গে প্রথম থিয়েটার দেখতে যায় 'রাবণ-বধ'—তাতে তোমার অভিনয় দেখে তারও সাধ যায় সে অভিনেত্রী হবে। কিন্তু তার মা তাকে থিয়েটারে পাঠাতে প্রথমে রাজী হয়নি। পরে রাজী হলেও থিয়েটারে ঢোকা মেয়েটির আর তখন হয়নি। তার সুযোগ এলো বছর ছয় পরে, যখন তার আঠারো বছর বয়স।

—কে বলো তো ? কী নাম তার ?

রাঙাবাবু বললেন,—তিনকড়ি। 'রূপ-সনাতন' যখন পুরোনো ষ্টারে মহলায় পড়েছিল, তখন সে ষ্টারে যাতায়াত আরম্ভ করেছিল। কিন্তু কোনো ভূমিকা পায় নি। ষ্টারে তখন মাঝে মাঝে 'বিল্বমঙ্গল' হচ্ছে, তাতে একবার একটি সখীর পার্ট পেলো সে, তাতে চামর দোলানো ছাড়া আর তার কোনো কাজ বা কথা ছিল না। 'বিবাহ বিভ্রাট'-এও নির্বাক বাসর-সঙ্গিনী, তারপরে ঐ 'রূপসনাতন'—এরই পুনরভিনয়ে সে একজন সখী অসুস্থ হয়ে পড়লে তার জায়গায় নেমে লোকের চোখে পড়ে গেল। একটি গান গাইতো সে শেষ-দৃশ্যে, —'দেখরে দেখ রাইয়ের বেণী কাল-ভুজঙ্গিনী !' তার গলার স্বর, তার গান গাইবার হাব ভাব দর্শকদের দারুণ ভালো লেগে যায়, তারা প্রচুর হাততালি দিয়ে

তাকে সংবর্ধনা জানায়। থিয়েটারের কর্তারাও তাকে খুশি হয়ে নগদ একটা টাকা বকশিস দেন সন্দেশ খেতে!

কথাটা শুনে বিনোদিনী হেসে ফেলে, বলে,—বাপবাঃ! খবরও জোগাড় করেছো বটে?

—আড্ডায় গেলে সব খবরই শোনা যায়।

—শোনাও, আর কী শুনে এসেছো?

বলে, ও'র গা ঘেঁষে বসে পড়ে। রাঙাবাবু বলেন,—মেয়েটি ছোট ছোট ভূমিকা যখন যা পায়, হাসিমুখে মেনে নিয়ে তা করে, কখনো এ-জন্য তার মন খারাপ হতো না। সে মহলায় বসে খুব মন দিয়ে মহলা দেখতো আর মনে মনে পার্ট গুলো রপ্ত করে নিতো। ইতিমধ্যে হলো গোপাললাল শীলের আবির্ভাব। স্টার বাড়ি ছেড়ে হাতিবাগানে থিয়েটার করবে বলে চলে এলো। কিন্তু বাড়ি করতে তো সময় লাগবে, তাই 'স্টারের দল' গেল ঢাকায় অভিনয় করতে। কিন্তু তিনকড়ির মা মেয়েকে ছাড়লো না। সেজন্য তার ঢাকায় যাওয়া হলোনা, ফলে স্টারের সংগে তার সম্পর্কও রইলো না। সে দিন কয়েক বসে থেকে এখন শুনছি এক 'প্রাইভেট'-দলে যোগ দিয়েছে, তারা স্টারের পুরানো বই গুলিই ঘুরে-ফিরে এখানে-ওখানে মাঝে মাঝে করে বেড়ায়, তাতে সে বড়ো-বড়ো পার্টই করে, আর খুব ভালোই করে। যারা দেখেছে, তারা খুব সুখ্যাতি করছে!

বিনোদিনী চুপ করে শুনছিল, কোনো কথা বললো না।

দিন কয়েক পরে, আরও কিছু খবর নিয়ে এলেন রাঙাবাবু। বললেন, এমারেল্ডের 'বিষাদ'-এর কথা তো বলেছি, এবার স্টারের কথা শোনো, হাতিবাগানের স্টারের কথা। 'নসীরাম'-এর পর 'সরলা'। তারকনাথ গংগোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'র নাট্যরূপ দিয়েছেন অমৃতলাল বসু মশায়। এই নাটক লোকে নিয়েছে দারুণ। দেখতে যাবে নাকি?

বিনোদিনীর সেই একই উত্তর,—না। তুমি যাও।

—তুমি না গেলে আমিও যাবো না।

বিনোদিনীর চোখ ছলছল করে এলো, বললে,—কিন্তু যেতে যে আমার মন চায় না!

—তাহলে থাক, যেয়ো না।

বিনোদিনী বা রাঙাবাবু দেখতে গেলেন না বটে, কিন্তু রাঙাবাবু খোঁজখবর রাখতে ছাড়েন নি। শশীভূষণ সাজতেন নীলমাধব চক্রবর্তী, বিধুভূষণ—অমৃত মিত্র, আর বেলবাবু—গদাধর। মেয়েদের মধ্যে গংগামণি করতো শ্যামা, কাদম্বিনী—প্রমীলা, কিরণবালা সরলা।

রাঙাবাবু বললেন,—তোমার সেই ছোট্ট মেয়ে তারাসুন্দরী এবারও এক ছোট ছেলের ভূমিকায় নেমেছে। তার ভূমিকার নাম—গোপাল।

'সরলা'র প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৮৮ সালের ২২ অক্টোবর। এর তিন দিন পরে ২৫ ডিসেম্বর গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী সুরবালা দেবীর মৃত্যু হয়। গোপাললাল শীলের ঐ সময় থিয়েটারের সখ মিটে গিয়েছিল। তিনি থিয়েটার পরিচালনায় না থেকে মঞ্চটি লীজ দিলেন মতিলাল সুর, হরিভূষণ ভট্টাচার্য পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও ব্রজলাল মিত্রকে। এর ফলে গিরিশচন্দ্র মুক্তি পেলেন। তাঁর চুক্তি ছিল গোপাললাল শীলের সংগে, এদের সংগে নয়। যেদিন সুরবালা দেবীর মৃত্যু হয়, সেই দিনই নতুন পরিচালনায় এমারেল্ড মঞ্চস্থ করলো অতুল মিত্রের'গাধা ও তুমি—'You and Ass'.

আর ১লা ডিসেম্বর ষ্টার অভিনয় করলে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুভঙ্গ'-এর সঙ্গে 'ঘোড়ার ডিম।' ('গাধা ও তুমি'র উত্তরে কি 'ঘোড়ার ডিম?' কে জানে!)

মাসখানেক পরে। ১৮৮৯ সালের ১লা জানুয়ারি ষ্টার অভিনয় করলে অমৃতলাল বসুর 'তাজ্জব ব্যাপার!' আর এই বছরেই আড়াই শো টাকা বেতনে গিরিশচন্দ্র এসে যোগ দিলেন ষ্টারে। এখানেই ২৭ এপ্রিল প্রথম অভিনীত হলো তাঁর প্রখ্যাত নাটক 'প্রফুল্ল।' 'সরলা'র সাফল্যই তাঁকে এই নাটকখানি রচনা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এতে অমৃত মিত্র যোগেশ, অমৃতলাল বসু রমেশ, বেলবাবু (অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়)—ভজহরি। উমাসুন্দরী—গংগামণি, জ্ঞানদা—কিরণবালা। আর ছোট ছেলে যাদবের ভূমিকায়—তারাসুন্দরী।

রাঙাবাবু বিনোদিনীকে বললেন,—মেয়েদের মধ্যে একদিকে যেমন তোমার সই গংগামণি, অন্যদিকে তেমনি 'কিরণবালা' আর 'তারাসুন্দরী!' সে নাকি দেখবার মতো অভিনয়! যারা দেখেছে তারা অভিভূত হয়ে গেছে! দশবছরের ছোট মেয়ে তারাসুন্দরী যাদবের বেশে যখন আর্তকণ্ঠে 'কাকাবাবু, একটু জল দাও'—বলে উঠতো, তখন দর্শক আর চোখের জল ধরে রাখতে পারতো না!

—আর কিরণবালা?

—লোকে বলছে,—দ্বিতীয় বিনোদিনী!

বিনোদিনীর মুখখানা স্নেহে কোমল হয়ে এলো, বললো,—আহা! বেঁচে থাক!

রাঙাবাবু বললেন,—নাটকটি বেরুলে আমি কিনে নিয়ে আসবো, পড়ে দেখো।

—দরকার নেই।

—কেন?

—নাটক পড়তে-টড়তে আর ইচ্ছে করে না। তুমি আমায় এসে সব বোলো। তোমার মুখে এ-সব শুনতে আমার ভীষণ ভালো লাগে।

—তাহলে শুনবে ?

—নিশ্চয়।

কিছুদিনের মধ্যেই খবর আনলেন রাঙাবাবু। এমারেল্ডের লীজ যাঁরা নিয়েছিলেন, তাঁরা চালাতে না পারায় গোপাললাল শীল আবার এলেন। কেদার চৌধুরী এলেন ম্যানেজার হয়ে। নাট্যকার রূপে এলেন মনোমোহন বসু. ১৮৮৯ সালের ৮ই জুন হলো মনোমোহন বসুর 'রাসলীলা।' ১৩ই জুলাই রাধামাধব করের 'সরোজা', আর ৩১শে জুলাই 'বক্রেশ্বর'। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, গোলাপসুন্দরী (সুকুমারী দত্ত) বিষাদ কুসুম প্রভৃতি। এই রকম শক্তিশালী শিল্পীসমাবেশ সত্ত্বেও নাটকগুলো জমলো না।

এই সময় নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় বীণা থিয়েটার বলে একটি নাট্যমঞ্চ চালাচ্ছিলেন। এতে তিনকড়ি রাজকৃষ্ণবাবুর 'মীরাবাঈ' নাটকে 'মীরাবাঈ'-এর ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিল। গানে আর অভিনয়ে তিনকড়ি চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিল বলা চলে। এমারেল্ডের মহেন্দ্রলাল বসু তার অভিনয় দেখে অভিভূত হয়ে যান। তিনি কর্তৃপক্ষকে বলে ওকে দ্বিগুণ মাইনে দিয়ে 'বীণা' থেকে 'এমারেল্ড'-এ নিয়ে আসেন। কিন্তু এখানে বেশিদিন থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

স্টারে ঐ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর খোলা হয় গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি'। এই নাটকে প্রথম নারীচরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেলো তারাসুন্দরী, তখন তার বয়স মাত্র দশ বছর। নিতান্তই বালিকা। বড়ো লোকের আদুরে মেয়ে 'হেমাঙ্গিনী'র ভূমিকাটি তারাসুন্দরীর অভিনয়ে অতি স্বাভাবিক ও প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছিল। একে পাঁচ বছর বয়সে হাত ধরে স্টারে এনেছিল বিনোদিনী। তাই ওর ওপর তার ছিল অপার স্নেহ। ওর কৃতিত্বের কথা শুনলে সে খুবই খুশি হয়ে উঠতো। রাঙাবাবু এসে জানালেন, তোমার ছোট্ট মেয়েটির যে সত্যিকার প্রতিভা আছে, তা এবার সে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছে! এই ভূমিকার জন্য তাকে সঙ্গীত পরিচালক রামতারণ সান্ন্যালের কাছে রীতিমত গান শিখতে হয়েছিল। আর নৃত্যশিক্ষক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে নৃত্যশিক্ষা।

বিনোদিনী রাঙাবাবুকে জিজ্ঞাসা করলো,—আর কে কে আছেন এ-নাটকে ?

—সবাই। উপেন্দ্র মিত্র, অমৃত মিত্র, বেলবাবু, নীলমাধব চক্রবর্তী,

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহেন্দ্র চৌধুরী, কিরণবালা, গঙ্গামণি, জগৎতারিণী, নগেন্দ্রবালা প্রভৃতি।

এমারেল্ডে ১৮৮৯ সালের ১৯ অক্টোবর মনোমোহন বসুর 'কিরণশশী' অভিনীত হলো, আর নভেম্বরে কেদার চৌধুরী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তারপরে দীর্ঘকাল রোগভোগের পর তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আগে ১৮৮৯ সালের ৩০শে নভেম্বর রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' অভিনীত হলো এমারেল্ডে। এই নাটকে মহেন্দ্র বসুর 'কুমারসেন' দারুণ সুখ্যাতি অর্জন করে। রাজা—মতিলাল সুরও খারাপ করেন নি। দেবদত্ত—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, ইলা—বিষাদ কুসুম এবং রাণী সুমিত্রা—গুলফন হরি। এই নাটক জনপ্রিয় হওয়ায় এমারেল্ডে বহুবার অভিনীত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ-সময় তিনকড়ি এমারেল্ডে ছিল না। ছাঁটাই-এর নাম করে তার মাইনে কমিয়ে দেন কর্তৃপক্ষ। মহেন্দ্রলাল বসু তাকে এনেছিলেন, তাই মহেন্দ্রবাবুকেই তাঁরা ভার দিলেন তিনকড়িকে বলতে যাতে সে কম মাইনেয় কাজ করে যেতে রাজী হয়। মহেন্দ্রবাবু সে-কথা বলতে, উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের ভাষায়,—'তিনকড়ি সতেজে উত্তর দিলো, এ হীনতা স্বীকার করার চেয়ে আমার ভিক্ষে করে খাওয়াও ভালো। আপনি আপনাদের কর্তৃপক্ষদের জানাবেন, তিনকড়ি আর কাল থেকে তাদের থিয়েটারে কাজ করবে না।'

ষ্টারে তখনো মহাসমারোহে চলছিল হারানিধি। এমন সময় একটা সংবাদে সারা রঙ্গজগৎ সচকিত হয়ে ওঠে। রাঙাবাবুর মাধ্যমে কথাটা শুনে বিনোদিনীও স্তম্ভিত হয়ে যায়। অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)—তার সদাহাস্যময় 'অমৃতদা'– আর ইহলোকে নেই। 'হারানিধিতে' 'অঘোর'-এর ভূমিকা সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করছিলেন তিনি, হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসলেন (১১ই মার্চ ১৮৯০)। বাগবাজারের সুবিখ্যাত মুখুজ্যে পরিবারে তাঁর জন্ম। পুরুষানুক্রমে এঁরা জমিদার। অতি বর্ধিষ্ণু পরিবার। এই পরিবারেরই একজন—শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজার থেকে হাতিবাগান অঞ্চলে ১৮ রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে আলাদা বাড়ি করে বসবাস শুরু করেছিলেন। কালীশ মুখোপাধ্যায়ের বইতে তাঁর জীবনী পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৬ বছর। কী এমন ঘটনা হঠাৎ ঘটলো যে আনন্দময় এই সুদর্শন পুরুষটিকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়েছিল? এর উত্তর পাওয়া যায় না।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র হলেন জগৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইনি পৈতৃক সম্পত্তি আরও বাড়িয়ে তোলেন। দান-ধ্যান-সামাজিকতায় তাঁর সুনামের অন্ত ছিল না।

এই জগৎবাবুর পুত্র উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উপেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রই হচ্ছেন বেলবাবু। খুবই সুপুরুষ। ছোট বেলায় খুবই গোলগাল দেখতে ছিলেন, তাই বাড়ির সবাই আদর করে ডাকতো—'বেলবাবু।' বড়ো আদরের সন্তান হলেও, খুব অল্প বয়সে উনি ওঁর মাকে হারান। কিন্তু সে-অভাব বাড়ির কেউ ওঁকে বুঝতে দেননি। খুবই আদর-যত্নে মানুষ হয়েছিলেন। বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের শৈশব অবস্থাতেই বেলবাবু এসে গিরিশবাবু ও নগেনবাবুদের সঙ্গে মেশেন। 'সধবার একাদশী' মহলার সময়ই তিনি এসেছিলেন, এতে তিনি নিয়েছিলেন 'কুমুদিনীর' ভূমিকা। তখনকার দিনে স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না বললেই হয়। নীলদর্পণের ক্ষেত্রমণিও ছিল তাঁর সুবিখ্যাত ভূমিকা। পরে হাস্যরসাত্মক ভূমিকায় তিনি যথেষ্ট স্বকীয়তা অর্জন করেন। তাঁর 'সরলা'র গদাধরচন্দ্র ও 'প্রফুল্ল'র ভজহরি, কিম্বা 'হারানিধি'র অঘোর—অসামান্য অভিনয়ে চিত্রিত ছিল। তাঁর মহাপ্রয়াণে ষ্টারে একদিন অভিনয় বন্ধ রাখা হয়। ষ্টারের পক্ষে তাঁকে হারানো বিরাট ক্ষতি বলে ধরতে হবে।

মার্চ মাসে বেলবাবুর শোচনীয় মৃত্যু, আর তার পরের মাস এপ্রিলে অকস্মাৎ ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন ষ্টারের কিরণবালা, যাকে বলা হতো দ্বিতীয় বিনোদিনী, একে বিনোদিনীর জায়গায় নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন গিরিশচন্দ্র। বিনোদিনীর থেকে বছর পাঁচেকের ছোট কিরণবালার জন্ম ১৮৬৮ সালে। মাত্র চার বছরের মঞ্চজীবন তার। পর পর দুটি মৃত্যুর আঘাতে ষ্টার বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রায় তিন মাস থিয়েটার বন্ধ থাকে। কিরণবালা মারা যায় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে। ষ্টারে সে বিনোদিনীর মতো নায়িকার অংশেই অবতরণ করতো। এ খবর শুনে বিনোদিনী চোখের জল সামলাতে পারে নি। বেলবাবুর মৃত্যুও তার কাছে বড়ো আঘাত, কিন্তু কিরণের প্রতি অদ্ভুত একটা টান অনুভব করতো বিনোদিনী। তার ভূমিকাগুলিই সে অভিনয় করতো, এবং তার ধারাতেই করতো। সেজন্যই বোধ হয় তার প্রতি বিনোদিনীর একটা টান ছিল। ওর কথায় রাঙাবাবুকে বলতো,—ও আমার বিষ্ণুপ্রিয়া!

'চৈতন্যলীলা'য় বিনোদিনীর পরে নিমাই-এর ভূমিকা কিরণবালাও করেছিল। এ-অভিনয় সম্পর্কে তখনকার রেইজ অ্যাণ্ড রায়ত পত্রিকা লিখেছিলেন "She had to interpret chaitanya, perhaps the most difficult of Bengalee dramatic characters, and in her delineation of it she proved herself thoroughly deserving of the exalted lift, if not equal to her glorious predecessor."

কিরণবালার অভিনীত 'সরলা'র নামভূমিকাটিও প্রচুর প্রশংসা অর্জন করে। কালীশবাবু এর সম্বন্ধে লিখে গেছেন, 'নামগোত্রহীন বংশেই কিরণবালার জন্ম। তের চৌদ্দ বছর বয়সের সময় মঞ্চে যোগদান করে ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয় করে। তখনকার Englishman কাগজ তার অভিনয়ের সৌকর্য দেখে তাকে Bengalee Siddons বলে অভিহিত করেছিল।'

তার এই অকালমৃত্যুর ঘটনা শোনবার পর বিনোদিনী কেমন যেন নিথর হয়ে গিয়েছিল। বাড়িটা যেন শোকে স্তব্ধ, রাঙাবাবুও আর নাটক নিয়ে আলোচনা করেন না, বিনোদিনীও ওর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে না কোনো কথা।

কিন্তু একদিন এবিষয়ের নীরবতা ভেঙে গেল। বিনোদিনী সেদিন বিশেষ রান্নার তদারকিতে ছিল, সে কী একটা কাজে ঘরে ঢুকতেই রাঙাবাবু তাকে ডেকে বললেন, ওগো, শোনো—শোনো।

—কী ?

টেবিলে একরাশ কাগজপত্র ছড়ানো। সেগুলির ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে রাঙাবাবু বলে উঠলেন, গিরিশবাবুর ছেলে যে শেষ পর্যন্ত স্টেজে নামলো !

—সে কী ! দানী ?—বলে, কাছে এসে দাঁড়ালো বিনোদিনী।

রাঙাবাবু বললেন, আসল নাম সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

—আমরা ওকে দানী বলেই জানি। আমার থেকে পাঁচ বছরের ছোট।

– হ্যাঁ, কাগজে তাই লিখেছে বটে—১৮৬৮ সালে জন্ম।

বিনোদিনী বললে, উনি শেষকালে ছেলেকে স্টেজে দিলেন ? বারে বারে বলতেন, আমার ছেলে যেন কখনো থিয়েটারের ধারে কাছে না আসে !

রাঙাবাবু বললেন, কিন্তু এলো তো ? গিরিশবাবুরই নতুন নাটক, 'চণ্ড'। ২৬ জুলাই স্টারে অভিনীত হয়েছে। ওর ভূমিকার নাম রঘুদেব। হ্যাঁ, নামও হয়েছে খুব।

বিনোদিনী বসে পড়লো, বললো—জানি তো সব। ছোটবেলায় মা মারা যায়। পিসিমার কাছে মানুষ। বড়ো হতে হতে লুকিয়ে চুরিয়ে সখের দলে অভিনয় করতো—বাপের কানে আসতো সে-সব, বাপ আবার থিয়েটারে এসে আমাদের বলতেন। কিন্তু ওঁর ঘোরতর অনিচ্ছা ছিল ছেলেকে এ লাইনে আনবার।

রাঙাবাবু বললেন, একটা কাগজে দানীবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী বেরিয়েছে। অমৃত মিত্রকে গিরিশচন্দ্র ভালোবাসেন খুব, তাঁর কথা এড়াতে পারেন নি। তাঁরই চেষ্টায় দানীবাবুর স্টারে অনুপ্রবেশ এবং তাঁরই শিক্ষায় সাধারণ মঞ্চে আত্মপ্রকাশ,—বয়স এখন মাত্র বাইশ।

—আর কে-কে আছেন এই নাটকে ?

রাঙাবাবু বললেন,—এসেছেন ষ্টারে তোমার গোলাপদি, করছেন 'বিজুরী'র ভূমিকা। অমৃত মিত্র, অমৃত বসু তো আছেনই, আছেন উপেন্দ্র মিত্র, নীলমাধব চক্রবর্তী, মহেন্দ্র চৌধুরী, এ-ছাড়া 'মুকুলজী'র চরিত্রে—তারাসুন্দরী।

— ছোট ছেলের পার্ট বুঝি ?

—হ্যাঁ। তা না হলে এগারো বছরের মেয়েকে এ-পার্ট দেবে কেন ?

এবারে ষ্টারে অভিনীত হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের গীতিনাটিকা,-'মলিনা-বিকাশ'। এতে ছিলেন সুকুমারী দত্ত (গোলাপসুন্দরী,) নীলমাধব চক্রবর্তী প্রভৃতি। এতে তারাসুন্দরীর কোনো ভূমিকা ছিল না, কিন্তু এক সখী অসুস্থ হওয়াতে তার জায়গায় নামতে হলো তারাসুন্দরীকে।

১৮৯০ সালের ২০ ডিসেম্বর ষ্টারে অভিনীত হলো অমৃতলাল বসুর 'তরুবালা।' ঐ মলিনা-বিকাশ চলবার সময়ই মিনার্ভা থিয়েটারের পত্তন হয়। তার ফলে ষ্টার থেকে কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী ওখানে চলে যায়। তরুবালার নাম-ভূমিকায় ছিল 'হেনা' বা হিঙ্গনবালা বলে একজন অভিনেত্রী। সে চলে যাওয়ায় ওর জায়গায় এলো তারাসুন্দরী। সে হেনাকে অনুসরণ না করে বহু জায়গায় নিজের মতো করে অভিনয় করতে লাগলো। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন :—ঠানদিদি-গঙ্গামণি, ঠাকুরদা-নীলমাধব চক্রবর্তী, অখিল-অমৃত মিত্র, বেহারী খুড়ো-অমৃতলাল বসু, শান্তা-নগেন্দ্রবালা। হীরালাল—অক্ষয়কালী কোঁয়ার প্রভৃতি। 'তরুবালা' নাটক জনপ্রিয় হয়েছিল। এই ডিসেম্বরেই গিরিশবাবুর আর একটি নাটক ষ্টারে অভিনীত হলো, তার নাম,—'মহাপূজা।' এতে অমৃত মিত্র প্রভৃতিদের সঙ্গে তারাসুন্দরী অভিনয় করলো 'সরস্বতী'র ভূমিকায়।

এই সময় বিনোদিনী একটু অসুস্থ হয়ে পড়ে। দিন কতক তাকে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকতে হয়। রাঙাবাবু অনেকটা সময় ওর পাশে বসেই কাটাতে লাগলেন। একদিনের কথা। বিনোদিনী অনেকটা ভালো, শুধু একটু দুর্বল মাত্র। রাঙাবাবু একসময় পরম স্নেহে ওর হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিলেন। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—তোমার হাতখানা আর একবার গুণে দেখি তো ?

কথাটা শুনে লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো বিনোদিনী, বললে,—যাও।

রাঙাবাবু অল্প একটু হেসে বললেন,—না গো, আমি তা মনে করে বলিনি! আমাদের ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক, আমার দুয়েতেই সমান আগ্রহ!

বিনোদিনী মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকায়। তারপরে ওর হাতখানা নিজের হাতের ওপর টেনে নিয়ে বলে,—ঠিক বলছো?

—ঠিক বলছি।

—তবে? হাত গুণে কী বলতে চাইছিলে?

—হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারের কথা।

বিনোদিনী বললে,—স্টার থিয়েটারের কী কথা গো? তুমি দেখতে গিয়েছিলে ওদের নাটক?

রাঙাবাবু ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—কখনো গেছি? পাঁচ বছর আমাদের বিয়ে হয়েছে, কখনো গেছি? না গো, নাটকের কোনো কথা নয়, ঘটেছে বড়ো দুঃখের ঘটনা। এটা না ঘটলেই হতো।

উদ্বিগ্ন হয়ে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলো,—কী হয়েছে গো?

রাঙাবাবু বলতে লাগলেন,—এটা তো ঠিক, ১৮৮৮ থেকে ১৮৯০—এই দুই বছরে গিরিশচন্দ্রের অবদানে স্টার জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছে! এই ১৮৯০ সালে অল্প কয়েক দিনের ব্যবধানে গিরিশবাবুর বাড়িতে পরপর অনেকগুলি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। মারা যায় পর পর দুই মেয়ে, আর দ্বিতীয়া স্ত্রী। আর এই স্ত্রীর গর্ভের একটি মাত্র পুত্র মরণাপন্ন হয়ে পড়ে ব্যাধিতে। তাই তাকে ভালো করে তোলবার আশায় তাকে নিয়ে চলে যান মধুপুর। এইরকম দুরবস্থার মধ্যে পড়ে তিনি নিয়ম মতো স্টারে যেতে পারছিলেন না বলে মধুপুরে তাঁর কাছে বরখাস্তের চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি পদচ্যুত। তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে!

—উঃ!

—আরও শোনো। তিনি দুখানি নাটক লিখেছিলেন স্টারের জন্য,—মুকুল মুঞ্জরা ও আবু হোসেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞতা আর কাকে বলে? স্টারের সত্ত্বাধিকারীরা, যাঁরা ওঁরই শিষ্য, ওঁর নাটক দুখানি অভিনয়ের অযোগ্য বলে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন! এবং এখানেই ঘটনার শেষ নয়, তাঁরা মামলা পর্যন্ত করতে ছাড়েন নি!

রাঙাবাবু নিজের ঝোঁকে কথা বলে যাচ্ছিলেন, বিনোদিনীর মুখের দিকে তেমন লক্ষ্য করেন নি, বিনোদিনী এবার আর্তনাদ করে ওঠায় তিনি সচেতন হলেন। বললেন, কী হলো! ওগো?

বিনোদিনী যন্ত্রণায় ততক্ষণে ছটফট করছে। বললে,—তুমি মালিনীকে ডাকো। মালিনীকে ডাকো! এখুনি দাইকে খবর দিক।

রাঙাবাবু এইবার বুঝতে পারেন। পেরেও খানিকক্ষণ হতচকিত হয়ে বসে থাকেন, তারপরে হঠাৎ উঠে ডাকতে থাকেন, মালিনী—মালিনী?

অদূরে থেকে সাড়া আসে—যাই বাবু।

পরমুহূর্তেই সে ঘরে এসে ঢোকে। তারপরে ছুটে যায় দাইয়ের খোঁজে। দাই আসে, অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় বিনোদিনীকে। রাঙাবাবু বড়ো এক ডাক্তারকেও নিয়ে আসেন।

যথাসময়ে বিনোদিনীর একটি কন্যাসন্তান জন্মলাভ করে।

এমারেল্ডে তখন আবার লেসী হয়েছেন মতিলাল সুর, মহেন্দ্র বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। তাঁদের আমলে প্রথমে পুরানো নাটকেরই অভিনয় চলতে থাকে কিছুদিন। তারপরে এঁরা অভিনয় করেন 'মণিপুর যুদ্ধ', 'নিতাই-লীলা', 'লালাগোলকচাঁদ' প্রভৃতি নাটক, কিন্তু কোনো নাটকই জমে না।

আর স্টার? গিরিশচন্দ্রের প্রতি অবিচারের প্রতিবাদে নীলমাধব চক্রবর্তী ও তাঁর কয়েকজন অনুগামী স্টার থেকে বেরিয়ে এসে সিটি থিয়েটার নামে একটি সম্প্রদায় তৈরি করে বাগবাজারের পশুপতি বসু ও নন্দলাল বসুর বাড়িতে গিরিশচন্দ্রের কয়েকখানি নাটক অভিনয় করতে থাকেন। ১৮৯১ সালের মে মাসে গিরিশচন্দ্র ও সিটি থিয়েটারের বিরুদ্ধে স্টার আদালতে মামলা করে। বিচারপতি এই আবেদন মঞ্জুর করলেন না। উলটে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আপোষ করার জন্য ওঁদেরকে নির্দেশ দিলেন। জুন মাসে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে স্টারের মিটমাট হয়ে যায়, কিন্তু তাঁরা সিটি থিয়েটারের বিরুদ্ধে মামলা চালিয়ে যেতে থাকেন, যদিও পরে এতেও তাঁরা হেরে যান।

গিরিশচন্দ্রের শিশু পুত্রটির এরই মধ্যে মৃত্যু হয়। অবর্ণনীয় হয়ে দাঁড়ায় গিরিশচন্দ্রের মানসিক অবস্থা। শান্তির আশায় তিনি জয়রামবাটি—কামার পুকুরে শ্রীসারদা মায়ের কাছে গিয়ে তাঁর শরণ নেন।

স্টার নাট্যকার হিসাবে বরণ করে নিয়ে এসেছিলেন রাজকৃষ্ণ রায়কে। তাঁর 'নরমেধ যজ্ঞ' এই সময় অভিনীত হয় (১৩ জুন ১৮৯১)—এতে অমৃত মিত্র, অমৃত বসু, উপেন্দ্র মিত্র ছাড়া অভিনয় করেন তারাসুন্দরী, গঙ্গামণি এবং নলিনী বলে একজন অভিনেত্রী, কালীশবাবুর মতে, ইনি পরবর্তীকালের যথাক্রমে মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের প্রখ্যাতা অভিনেত্রী কঙ্কাবতী ও চন্দ্রাবতীর মা।

॥ ৫ ॥

রাঙাবাবুর পুরানো যে বাড়ি, তাতে রাঙাবাবুর প্রথমা স্ত্রী 'গিন্নীঠাকুরাণী'র নিজস্ব ঘরে আয়েস করে ব'সে বাটা থেকে পান নিয়ে মুখে পুরে তাঁর পায়ের কাছে বসা খাস ঝিকে বললেন : কী বলিস লো! শেষ পর্যন্ত হলো একটা মেয়ে!

তারপরে ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে বললেন,—একেই বলে, ভগবানের মার দুনিয়ার বার! ছেলে! ছেলে হওয়া অতো সহজ!

বলতে বলতেই তিনি চকিত হয়ে উঠলেন, কই রে! আমার খোকা কোথায়! তারপরেই ঝিকে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন,—এই যা তো, খুঁজে আনতো আমার খোকাকে!

ঝি-টি সংগে সংগে উঠে দাঁড়ালো, তার পরে ছুটলো গিন্নীর খোকাকে খুঁজতে।

রাঙাবাবুর নতুন মহলের একটি ঘর। প্রদীপ জ্বলছে। মেঝেতে পাতা একটি বিছানায় শুয়ে আছে বিনোদিনী, তার পাশে তার সদ্যজাত কন্যা। শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে কতো কথাই না মনে পড়ছিল বিনোদিনীর! তার দিদিমা আর মা—দুজনেই বেঁচে। সংসার জীবনে প্রবেশ করার পর আর তাদের সে খোঁজখবর করে নি। তাঁরাও সংস্পর্শ রাখেন নি। রাখেন নি বিনোদিনীরই ভালোর জন্য। আজ এই ১৮৯১ সাল, ঘুরে ফিরে তাঁদেরই কথা মনে পড়ছিল বিনোদিনীর। কোনো রকমে কি তাদের কাছে খবর পেঁাছে দেওয়া যায়, তার মেয়ে হয়েছে! রাঙাবাবুকে বলতে সাহস হয় না, তাকে ভালবাসে মালিনী। সত্যিই ভালবাসে, তাকে দিয়ে কি কোনোরকমে খবর পাঠানো যায়? না—তাও যায় না! মালিনী টের পেয়ে যাবে তার পূর্বজীবনের স্বরূপ কী ছিল! হয়ত কানাঘুষায় কিছু শুনে থাকবে, কিন্তু নিজের চোখে তো কিছু দেখে নি। না—দরকার নেই। বরং শরীরে একটু বল পেয়ে নিক—সে একটা চিঠিই বরং লিখবে তার মাকে। সংগে সংগে এ-ও লিখবে, মা যেন চিঠির উত্তর না দেয়।

এই সব সাতপাঁচ সে ভাবছিল শুয়ে শুয়ে, এমন সময় ঘরের ভেজানো দরজাটা একটু ফাঁক হলো।

কে?

দরজার ফাঁক থেকে খোকা মুখ বাড়ালো। খোকার বয়স এখন দশ বছর। তাকে দেখে বিনোদিনীর মুখে ফুটলো হাসি, কণ্ঠস্বর হলো কোমল, বললে—গোপাল!

খোকা বললে, বোন হয়েছে, দেখবো মা?

এখন নয় বাবা—এখন ঘরে ঢুকতে নেই—পরে দেখো। কেমন?

খোকা বললে, তখন—একটু কোলে নেবো তো?

—নেবে বই কী বাবা! নিশ্চয়ই নেবে!

—আচ্ছা—বলে খোকা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ঘুম আসছিল না বিনোদিনীর। ঘুরে-ফিরে নানান কথা মনে আসছিল ভিড় করে, চোখের সামনে ভেসে উঠছিল নানান মুখ! কখনো কিরণবালার মুখ, কখনো বা সেই পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে—তারাসুন্দরীর মুখ। পাঁচ

বছরের সেই মেয়েটির বয়স আজ বারো। হয়ত তারা পরে কিরণবালার স্থান পূরণ করবে।

যাইহোক, দেখতে দেখতে ছ-মাস গেল কেটে। তার খুকিটি খুব সুন্দর হয়েছে দেখতে। বিছানায় অয়েল-ক্লথ আর কাঁথার ওপর শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করছে, বিনোদিনী তাকে এক সময় কোলে তুলে আদর করে নিজেরই লেখা কবিতা আবৃত্তি করে :

বুক ভরা, মুখ ভরা ঐ হাসি হেরে—
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা, কে শিখালো তোরে !

এই সময়ে খোকা এসে ঘরে ঢোকে পা টিপে টিপে। কাছে এসে আস্তে করে ডাকে : ছোট-মা ?

বিনোদিনী তার দিকে মুখ ফেরায়। বলে, এসো বাবা এসো। নাও।

খোকা বিছানায় বসে সন্তর্পণে খুকিকে কোলে নেয়। খুকি আবোল-তাবোল দু-একটি কথা বলে। খোকা তাকে জিজ্ঞাসা করে, ছোট-মা, বোন এখনো আমাকে দাদা বলে ডাকছে না কেন ?

বিনোদিনী হেসে বলে. ঠিক ডাকবে। 'দাদা' বলে ঠিক ডাকবে। একটু বড়ো হোক।

খোকা খুশি হয়ে খুকিকে আদর করতে লাগলো। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। একটু পরেই ও-বাড়ি থেকে হীরে এসে তাকে নিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ খেলা করবার পর বুকের দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো খুকি। ধীরে ধীরে উঠলো বিনোদিনী। তখনকার দিনে বাচ্চাদের জন্য শিক-বসানো একরকম কলের মশারীর আমদানী হয়েছিল, কারণ কল টিপে সেটাকে গুটিয়ে রাখা যায়, আবার বাড়ানোও যায়। সেটা খুলে—খুকিকে তাই দিয়ে ঢাকা দিয়ে বিনোদিনী তার টেবিলের কাছে এলো। ড্রয়ারে রয়েছে তার কবিতার খাতা। এ খাতা তার একান্ত নিভৃতির ফসল। খুকির বাবা এখনো জানে না। টেবিলে রয়েছে একখানা বই। রাঙাবাবু তাঁর লাইব্রেরীতে এ-বইখানা এনে অনেকদিন রেখেছেন। বিনোদিনী টেবিলে নিয়ে এসে রেখেছে পড়বার জন্য, তার গোলাপদি (সুকুমারী দত্ত)-র লেখা সেই নাটক—'অপূর্ব সতী।' চেয়ারে বসে বইখানা হাতে তুলে নিলো বিনোদিনী। তারপরে পাতা ওলটালো। প্রথম পৃষ্ঠার পাতাতেই লেখা রয়েছে রাঙাবাবুর নিজের হাতে, 'বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম মহিলা নাট্যকার।' এর অভিনয়ও হয়েছিল ১৮৭৫-এ। বইটি প্রকাশিতও হয়েছিল ঐ সালে। পাঁচ অঙ্কের নাটক। মেয়েকে একটু-আধটু লেখাপড়া শিখিয়ে লেখাপড়া জানা ছেলের হাতেই দিতে চেয়েছিল মা, কিন্তু টাকার লালসায় তাকে তাড়িয়ে এক বড়লোকের দিকে মেয়েকে ঠেলে দিতে লাগলো শেষ পর্যন্ত

শিউরে উঠলো বিনোদিনী, বইখানা রেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, ফিরে এলো আবার মেয়ের কাছে।

॥ ৬ ॥

তারাসুন্দরীর বয়স মাত্র তখন বারো। স্টারে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'নরমেধ যজ্ঞ'তে সে করলো মনিদত্ত, তারপরে ১৮৯১-এর ৫ই ডিসেম্বর রাজকৃষ্ণ বাবুর 'লয়লা-মজনু'তে করলো মন্নাবাদীর ভূমিকা। তিনকড়ি তখন সিটি থিয়েটারে বিভিন্ন পুরোনো নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় সে নামছে।

'নরমেধ যজ্ঞ'-এর আগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তি উপলক্ষে অমৃতলাল বসু একটি শোকনাটিকা লেখেন 'বিদ্যাসাগর-বিলাপ নামে। তাতে তারাসুন্দরী নেমেছিল 'বঙ্গভাষা' নামক চরিত্রের ভূমিকায়। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যা-ভূষণ এ-সম্পর্কে লিখে গেছেন, 'বঙ্গভাষার ভূমিকাটিই সর্বাপেক্ষা কঠিন ছিল, এবং সেই ভূমিকায় গানও অনেকগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছিল। এই ভূমিকাটি কাহাকে প্রদান করা যায় তাহা লইয়া থিয়াটারের কর্তৃপক্ষীয়দিগের ভিতর অনেক অলোচনা হয়। অমৃতবাবু এই ভূমিকাটি শ্রীমতী তারাসুন্দরীকেই দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু থিয়েটারের অন্যান্য সকলেই তাহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন। তখন সংগীতাচার্য রামতারনবাবু বলিলেন— তোমরা এত ভাবিতেছ কেন? বঙ্গভাষার ভূমিকায় যে কয়টি গান আছে, তাহাতে এমন আমি সুর দিব যে তারার গলায় বেশ সুন্দর থাপ খাইবে। রামতারনবাবুর এই কথায় এবং তাঁহার বিশেষ আগ্রহে শেষে বঙ্গভাষার ভূমিকাটি তারাসুন্দরীকেই প্রদান করা হইয়াছিল। এই ভূমিকাটি শ্রীমতী তারাসুন্দরী এত ভাবমধুর করিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন যে সকলেই একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।···শ্রীমতী তারাসুন্দরী যে এমন সুন্দর গান গাইতে পারিবে তাহা থিয়েটারের কেহ আশা করিতে পারেন নাই। অমৃতলাল মিত্র মহাশয় এমনই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি জেদ করিয়া গিরিশচন্দ্রের ধ্রুবচরিত্রের পুনরভিনয় করান এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে ধ্রুবর ভূমিকা প্রদান করিয়া নিজে তাহাকে দিনরাত পরিশ্রম করিয়া আগাগোড়া শিক্ষা প্রদান করেন। ধ্রুবের ভূমিকা অভিনয় করিয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সুখ্যাতি শতমুখে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।'

স্টারে যখন এই সব চলছিল, তখন এমারেল্ডের লেসী হলেন মহেন্দ্রলাল বসু (১৮৯২)। তিনি বিষবৃক্ষ মঞ্চস্থ করলেন। নিজে নিলেন নগেন্দ্রর

ভূমিকা, সূর্যমুখী সাজলেন গোলাপ সুন্দরী (সুকুমারী দত্ত), কুন্দনন্দিনী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকি), কমল-গুলফন হরি।

স্টারে ১৮৯২ এর ২৬শে নভেম্বর রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বনবীর' অভিনীত হলো। নাম ভূমিকায় অমৃতলাল মিত্র, ধাত্রীপান্না-গঙ্গামনি, আর উদয়সিংহ—তারাসুন্দরী।

এমারেল্ডে ঐ সালে বিষবৃক্ষের পর হলো কপালকুণ্ডলা, তারপরে ৭ই ডিসেম্বর অতুলকৃষ্ণ মিত্র নাট্যায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল মঞ্চস্থ হলো। গোবিন্দলাল—মহেন্দ্র বসু, কৃষ্ণকান্ত—পূর্ণ ঘোষ, হরলাল—মতিলাল সুর, রোহিণী—গোলাপসুন্দরী, ভ্রমর—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকি)

স্টারে ২৪শে ডিসেম্বর রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ঋষ্যশৃঙ্গ' নাটক মঞ্চস্থ হলো। এতে নামভূমিকায় নতুন এক অভিনেত্রী অবতীর্ণ হলো, তার নাম, নরীসুন্দরী। এই নাটকে সেই পুরানো এলোকেশীর নাম পাওয়া যায়। তিনি সেজেছিলেন চাচীঠাকুরাণী।

১৮৭৭ সালে গায়িকা অভিনেত্রী নরীসুন্দরীর জন্ম। পনেরো বছর বয়সে সে 'ঋষ্যশৃঙ্গ'-এর নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তার অভিনেত্রী জীবন শুরু করেছিল। সহজাত সুরেলা কণ্ঠ ছিল তার। উত্তরকালে তার গাওয়া নাটকের গানগুলি গ্রামোফোন রেকর্ড মারফৎ আরও ব্যাপক ভাবে জনমণ্ডলীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তাকে এনে দিয়েছিল অসামান্য জনপ্রিয়তা।

স্টারে ১৮৯২ এর ডিসেম্বরে অমৃতলাল বসুর 'কালাপানি' নাটকও অভিনীত হয়েছিল। এতে 'ন্যায়রত্ন' চরিত্রে পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য অভিনয়ে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। এছাড়া অভিনয় সম্পর্কে আর বলার কিছু নেই। অমৃতলাল বসুর পরের নাটক 'বিজয় বসন্ত' স্টারে মঞ্চস্থ হলো ২৬শে আগস্ট তারিখে। এতে বিজয়ের ভূমিকায় ছিল তারাসুন্দরী। বটুকচাঁদ-রাধামাধব কর, রাজা—উপেন্দ্র মিত্র, বসন্ত—অমৃতলাল মিত্র, দুর্জয়মণি—নগেন্দ্রবালা, শান্তা—গঙ্গামণি প্রভৃতি। এই সময় বেঙ্গলে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হলো তাঁতিয়া ভিল (১৮৯৩ এপ্রিল) তারপরে ২৫ ডিসেম্বর মুই হাঁদু (রচনা-বিহারীবাবু, মুখ্য ভূমিকায়=গোলাপ সুন্দরী)। এমারেল্ডে ১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায়। স্টারে ১৮৯৩ এর ২৫শে ডিসেম্বর অভিনীত হলো রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বদরেমণি।'

এরপরে আসে ১৮৯৪ সালের কথা। ১লা জানুয়ারী স্টারে অভিনীত হলো অমৃতলাল বসুর 'বাবু।' এতে 'তিনকড়ি মামা'র ভূমিকায় নিজেই নেমেছিলেন অমৃতবাবু। এই সালের ৫ই মার্চ রাজকৃষ্ণ রায় মারা যান। ৪টা আগস্ট স্টারে নৃত্য গোপাল কবিরাজের 'অন্নদামঙ্গল' নাটকে গৌরীর ভূমিকায় দেখা দিয়েছিল তারাসুন্দরী।

কিন্তু তার আগে পুরানো ন্যাশানালের জায়গায় গড়ে ওঠে নতুন মিনার্ভা থিয়েটার (৬ বিডন স্ট্রীট)—প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সত্ত্বাধিকারিত্বে। অধ্যক্ষ হয়ে আসেন গিরিশচন্দ্র। তিনি সেক্সপিয়রের 'ম্যাকবেথ' অনুবাদ করে তার অভিনয়ের পথে অগ্রসর হন। দীর্ঘ ন'মাস ধরে এর মহলা চলে। ১৮৯৩ সালের ২৮শে জানুয়ারি 'ম্যাকবেথ' প্রথম অভিনীত হয়েছিল। এই অভিনয় নানা কারণে স্মরণীয়। প্রথম হচ্ছে গিরিশ-অর্ধেন্দুর পুনর্মিলন ঘটেছিল এতে। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এতে পাঁচটি ছোট-ছোট পার্ট করেছিলেন। এছাড়া শিক্ষকতা তো ছিলই।

'ম্যাকবেথ'-এর অন্যতম আকর্ষণ ছিল—শ্রীমতী তিনকড়ি। তিনকড়ি আত্মমর্য্যাদা বজায় রেখে এমারেল্ড থেকে চলে এসেছিল। নীলমাধব চক্রবর্তীরা কয়েকজন মিলে 'সিটি' থিয়েটার সংগঠন করেছিলেন। এঁরা তিনকড়ির বাড়ি গিয়ে ওকে সসম্মানে নিয়ে এসেছিলেন 'সিটি'তে। এখানে পুরানো নাটকগুলির পুনরভিনয় হতো। তিনকড়ি যে ভূমিকাতেই নামতো, তাতে একটু নতুনত্ব দেখা যেতো। ১৮৯২-তে সিটিতে 'বিবাহ-বিভ্রাট' নতুন করে খোলা হলো। এতে সেই পুরানো অভিনেত্রী জগত্তারিণীকে দেওয়া হয়েছিল 'ঝি'-এর পার্ট। এই ঝির পার্ট'টি খুব শক্ত। ষ্টারে ঐ পার্ট যে অভিনয় করতো, তার পার্ট ভালো করে দেখে রেখেছিল তিনকড়ি যখন সে ষ্টারে ছিল। কিন্তু জগত্তারিণী তিনরাত্রি 'ঝি' করলো বটে কিন্তু সে-রকম করতে পারলো না। তিনকড়ি নীলমাধবকে ধ'রে একদিন তাঁর সামনে ঝির পার্ট অভিনয় করে দেখালো। নীলমাধববাবু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতেই পারেন নি যে নতুন এক অভিনেত্রী এই শক্ত পার্ট'টা অমন ভাবে অভিনয় করতে পারবে! সেজন্য, আর কোনো কথা নয়, 'ঝি'র পার্ট তিনকড়ি করতে লাগলো জগত্তারিণীর বদলে। পুজার সময় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়িতে 'সিটি'র বায়না হয়েছিল। সেখানে গিরিশচন্দ্র নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি 'বিবাহ-বিভ্রাট'-এ তিনকড়ির অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু কতো কষ্টে যে সে তার 'অভিনেত্রী' জীবন বজায় রাখছিল, গিরিশবাবু তা জানতেন না। দুই বড়োলোক বন্ধুর নজরে পড়ে গিয়েছিল সে। তারা ওর বাড়ি গিয়ে ওর মাকে প্রলুব্ধ করেছিল। তাদের সর্ত ছিল 'মেয়েকে থিয়েটার ছাড়তে হবে। কিন্তু তিনকড়ি ছাড়েনি, মায়ের বেদম প্রহারেও সে অবিচল ছিল। সে নিজেই লিখে গেছে এ-ঘটনার কথা। মন্তব্য করে গেছে,—'নটনাথের কৃপায় আমি যে কত গুরুতর প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছি, তাহা কেবল অন্তর্য্যামী জানেন, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে।'

গিরিশচন্দ্র 'লেডী ম্যাকবেথ'-এর জন্য প্রমদাসুন্দরীকে রিহার্স্যাল

দেওয়াচ্ছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তার মনোমত হচ্ছিল না। বিশেষ করে ভাবাভিব্যক্তিতে প্রমদা একেবারেই সুবিধা করতে পারছিল না। গিরিশবাবুর ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। তিনি লোক পাঠিয়ে তিনকড়িকে আনালেন। এই ঘটনার কথা তিনকড়ি নিজেই লিখে গেছে। সে লিখেছে,—'একদিন সন্ধ্যার পর হইতেই 'রিহার্স্যাল' আরম্ভ হইয়াছিল। প্রমদা তখন লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকা রিহার্স্যাল দিতেছিল। গিরিশবাবু বারবার তাহার ভুল সংশোধন করিয়া দিতেছিলেন। কিন্তু তিনি যেমনটি দেখাইয়া দিতেছিলেন, প্রমদা কিছুতেই আর তেমনি করতে পারিতেছিলনা। বহুবার ভুল সংশোধন করিয়া দিবার পরও প্রমদার যখন ভুল শোধরাইল না, তখন, গিরিশবাবু বেশ একটু বিরক্ত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, না, তোর দ্বারা এ পার্ট হবার কোনো আশা নেই! …মিনার্ভা থিয়েটারে তখন প্রমদাই শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। তাহার দ্বারা যদি এ-পার্ট না হয়তো কাহার দ্বারা হইবে? গিরিশবাবুর কথায় প্রমদাও ঠোঁট ফুলাইয়া গুম খাইয়া বসিয়াছিল। তাহার মুখের ওপর তখন যে-ভাবটা ফুটিয়াছিল তাহার ভাবটা হইতেছে এই যে—আমার দ্বারা তো হবে না, দেখি আমার চেয়ে আর কে ভালো করতে পারে!'

এর পর তিনকড়ি যে বর্ণনা দিয়েছে, তাতে দেখা যায়, গিরিশবাবু প্রমদার পার্টটা নিয়ে ওর হাতে দিয়ে ওকে একটু বলতে বললেন। উত্তরে তিনকড়ি বললে, আমি কালকে বলবো, আজ রাত্রে সমস্ত পার্টটা একবার ভালো করে পড়ে নেবো।

গিরিশবাবু অনুমতি দিয়েছিলেন। পরদিন যথাসময়ে পার্ট বলতে আরম্ভ করলো তিনকড়ি। দেখে, গিরিশবাবু—অর্ধেন্দুবাবু কেন, উপস্থিত সকলেই বুঝতে পারলেন, এ মেয়েটি প্রমদার থেকে 'লেডী ম্যাকবেথ' অনেক ভালো করবে।

তিনকড়ি লিখে গেছে,—আমার লেখাপড়া জ্ঞান অতি অল্পই ছিল। কিন্তু সেই অল্প বিদ্যাবুদ্ধি লইয়াই গিরিশবাবুর শিক্ষায় ও কৃপায় আমি লেডী ম্যাকবেথের জটিল ভূমিকা সুন্দররূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।… গিরিশবাবুর ন্যায় শিক্ষক পাইয়াছিলাম বলিয়া আজ আমি অভিনেত্রী। বঙ্গ-রঙ্গালয়ে আমি বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সহিত অভিনয় করিয়াছি ও করিতেছি, কিন্তু যথার্থ গুরু বলিবার উপযুক্ত লোক আমি গিরিশবাবু ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি নাই। মিষ্ট কথায় অতি সরল ভাবে এমন শিক্ষা প্রণালী কেবল গিরিশবাবুতেই সম্ভব। কেবল তাঁহার কৃপায় নিরক্ষর, নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞান শূন্য আমিও অভিনেত্রী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছি।…গিরিশবাবু স্বয়ং ম্যাকবেথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।…অভিনয় ভাঙিবার পর গিরিশবাবু আমায় আদরে পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, তোমার অভিনয় দেখে এখন আমার

মনে হচ্ছে আমার বই লেখা সার্থক হয়েছে। বাঙালী দেখুক যে বাংলা রঙ্গমঞ্চেও অভিনেত্রী আছে। এত সুন্দর এত নিখুঁত অভিনয় যে তুমি করতে পারবে এ-কথা আমি একবারে ধারণা করতে পারি নি। গিরিশবাবুর এই প্রশংসাবাদে আমার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, আমি একেবারে নটগুরুর পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম।'

উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, 'দর্শকগণ এই তরুণ অনভিজ্ঞা অভিনেত্রীর লেডী ম্যাকবেথের ন্যায় জটিলতাপূর্ণ সুকঠিন ভূমিকার আশ্চর্যজনক অভিনয় নৈপুণ্যে দর্শনে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। বঙ্গের শিক্ষিত সমাজ এই সামান্য অভিনেত্রীর দ্বারা যে এরূপ অভাবনীয় অভিনয় হইতে পারে তাহা কোনোদিন ধারণাও করিতে পারেন নাই।...লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকা অভিনয় করিবার পর হইতে নটগুরু গিরিশচন্দ্র শ্রীমতী তিনকড়িকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। সেই হইতে তিনকড়ি তাঁহার অনন্ত স্নেহের অধিকারিণী হইয়াছিল।'

লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকা-শিক্ষার ব্যাপারে তিনকড়ি গিরিশবাবু ছাড়া আর কারুর নাম করেনি। কিন্তু এ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র যা লিখে গেছেন, তা একটু ভিন্ন। (শঙ্কর ভট্টাচার্য-রচিত অর্ধেন্দুশেখর ও বাংলা থিয়েটার) তিনি লিখেছেন, 'তিনকড়ির লেডী ব্যাকবেথ ভূমিকার যে অতুলনীয় অভিনয়, তাহাও মুস্তফী মহাশয়ের শিক্ষার ফল। এ-বিষয় তিনি নিজে একদিন আমাকে বলেছিলেন।'

ললিতচন্দ্রের মতে, দুজনে দুজনকে আলাদাভাবে শেখাচ্ছিলেন। গিরিশবাবু প্রমদাকে, অর্ধেন্দুবাবু তিনকড়িকে। কিন্তু প্রমদা অপারগ হওয়ায় তিনকড়ির অভিনয় দেখতে লাগলেন গিরিশবাবু। দেখে, 'গিরিশবাবু বলিলেন, লেডী ম্যাকবেথ ম্যাকবেথকে উঁচিয়ে গেছে, আমি ও পর্দায় উঠতে পারবো না।'

বলে, তিনি নিজেই তিনকড়িকে নিজের মতো করে তৈরি করে নিতে লাগলেন। এর ফলে যা দাঁড়ালো, সে-সম্বন্ধে ললিতবাবু লিখে গেছেন, 'যেদিন ম্যাকবেথ অভিনয় দেখি, লেডী ম্যাকবেথের অভিনয় দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম, বঙ্গ রমনীর দ্বারা যে এরূপ অভিনয় হইতে পারে তাহা কল্পনার অতীত ছিল।'

বুদ্ধিজীবীদের কাছে আদৃত হলেও জনসাধারণ 'ম্যাকবেথ' বুঝলো না। দু-চার রাত অভিনয় হবার পরই প্রেক্ষাগৃহ দর্শকশূন্য হতে লাগলো। গিরিশবাবু তাই লিখলেন 'মুকুল মুঞ্জরা।'

কিন্তু ম্যাকবেথ-প্রসঙ্গে আর একটি অভিনেত্রীর নাম করা দরকার। সে.

হচ্ছে কুসুমকুমারী। কুসুমকুমারীর জন্ম ১৮৭৬ সালে, তারাসুন্দরীর থেকে তিন বছরের বড়ো। তার সতেরো বছর বয়সে সে প্রথম রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেছিল। মিনার্ভার 'ম্যাকবেথ'-এ তার আত্মপ্রকাশ ফ্লিয়েন্সের ভূমিকায়। তার অভিনয় ভালোই হয়েছিল। বস্তুতঃ কী স্ত্রী, কী পুরুষ, 'ম্যাকবেথ' এর সব ভূমিকাই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। 'মুকুল-মুঞ্জরা'তেও তার ভূমিকা ছিল। থিয়েটার করবার আগে কুসুমকুমারী নাচে-গানে পারদর্শিতা লাভ করেছিল। তখনকার দিনে সখীর ব্যাচে ঢুকেই মেয়েরা ধাপে ধাপে অভিনেত্রী হয়ে দাঁড়াতো। কুসুমকুমারীকে তা করতে হয় নি। সে মিনার্ভায় ঢুকেই অভিনেত্রী।

এবারে, 'মুকুল-মুঞ্জরা'র প্রসঙ্গে আসা যাক। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, 'এই নাটকের আখ্যানবস্তু ও সমুদায় ভাব বিলাতী, তবে বাঙালীর বুঝিবার মতো করিয়া লিখিত হইয়াছে। তাই মুকুল-মুঞ্জরা জমিল, ম্যাকবেথ গৃহীত হইল না। খাঁটি বিলেতী বাংলায় তখন চলিতনা, কিন্তু বিলেতীর বঙ্গীয় সংস্করণ সাদরে গৃহীত হইত।'

মুকুল-মুঞ্জরায় যে ভূমিকাটি তিনকড়িকে দেওয়া হয়েছিল, তার নাম তারা। বিদ্যাভূষণ মশাই লিখেছেন, 'এই নাটকে তারার ভূমিকাটিই সর্বাপেক্ষা আঙ্গিক অভিনয় অর্থাৎ কঠিন ভূমিকা। এই তারার ভূমিকার বক্তৃতা অতি অল্পই ছিল, ভাবভঙ্গির উপর দিয়াই এই ভূমিকার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।— আমাদের মনে হয়, শ্রীমতী তিনকড়ির এই ভাবভঙ্গির বিকাশে কিরূপ ক্ষমতা জন্মিয়াছে তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র মুকুল-মুঞ্জরা নাটকে এই তারার ভূমিকাটির অবতারণা করিয়াছিলেন।'

বলা বাহুল্য, তিনকড়ির অভিনয় এই নাটকেও চমৎকার হয়েছিল। গিরিশচন্দ্র খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'বঙ্গনাট্যশালায় শ্রীমতী তিনকড়িই এখন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী।'

এই নাটকে মুকুল সাজলেন দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ), মুঞ্জরা— কুসুমকুমারী, চামেলী—বিড়ালহরি, তারা—তিনকড়ি, আর বরুণচাঁদ— অর্ধেন্দুশেখর।

কিন্ত 'ম্যাকবেথ' নয়, 'মুকুলমুঞ্জরা'ও ততটা নয়, যতটা অর্থাগমে মিনার্ভাকে সাহায্য করেছিল গিরিশচন্দ্রেরই পরবর্তী নাচগানের বই আবুহোসেন। এই নাটকে নামভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর নিদারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তাঁর অভিনয়ের সাফল্যের জন্য। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর 'যাদের দেখেছি' বইতে লিখে গেছেন, 'অর্ধেন্দুশেখরের 'আবুহোসেন' যিনি দেখেননি, তাঁর নিতান্ত দুর্ভাগ্য। এই যুবকের ভূমিকায় বৃদ্ধ বয়সেও তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন

কৌতুকরসের পরাকাষ্ঠা। তেমন আবুহোসেন আজ পর্যন্ত কেউ দেখাতে পারলে না।'

এই বই মিনার্ভায় খুলেছিল ১৮৯৩ সালের ২৫ শে মার্চ। এতে আবুর মা—গুলফমহরি, রোসেনা—বিড়ালহরি, মশুর—শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রানুবাবু) আর দাইয়ের ভূমিকায়—তিনকড়ি। এই দাইয়ের ভূমিকায় নাচও ছিল, গানও ছিল। যে তিনকড়ি জটিল সুগভীর ভাবময় ভূমিকায় 'অদ্বিতীয়', সে এই নাচ গানের ভূমিকাতেও যে সমান পারদর্শিতা দেখাবে, তা ছিল কল্পনার অতীত।

মিনার্ভার পরের নাটক হলো গিরিশচন্দ্রের 'সপ্তমীতে বিসর্জন।' (১১ই অক্টোবর ১৮৯৩) এতে 'মামা'র ভূমিকা নিয়েছিলেন অর্ধেন্দুশেখর। বলরাম—দেবকণ্ঠ বাগচী, রাধিকা—ভূষণকুমারী, বিরাজের মা—গুলফনহরি, আর বিরাজ—তিনকড়ি।

এর পরেই অভিনীত হলো মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্রের বিখ্যাত নাটক, 'জনা'। প্রথম অভিনয়ের তারিখ: ১৮৯৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। এতে নাম ভূমিকায়—তিনকড়ি, বিদূষক—অর্ধেন্দুশেখর, প্রবীর—দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ), নীলধ্বজ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ—শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)। অর্জুন—কুমুদ সরকার, ব্রাহ্মণ—গুলফনহরি, নায়িকা—ভবতারিণী, মদনমঞ্জরী—কুসুমকুমারী ইত্যাদি।

এই বিদূষকের ভূমিকায় দু-চার রজনী অভিনয় করবার পর অর্ধেন্দুশেখর মিনার্ভা ছেড়ে এমারেল্ডে গেলেন নিজে মালিক হয়ে থিয়েটার চালাবেন বলে। তখন বিদূষক সাজতে লাগলেন গিরিশচন্দ্র নিজে।

এই 'জনা' নাটকের জনা তিনকড়ির এক অপরূপ সৃষ্টি। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন,—'তিনকড়ির পর অনেক অভিনেত্রীই জনার অভিনয় করিয়াছে, কিন্তু তিনকড়ির নিকটেও পেঁছাতে পারে নাই। প্রবীরের মৃত্যুর পর জনার সেই উন্মাদিনীর ভূমিকা তিনকড়ি যখন অভিনয় করিত তখন সত্যই মনে হইত মূর্তিমতী প্রতিহিংসা দেবী (Nemesis) উন্মাদিনী রণরঙ্গিনীবেশে রঙ্গমঞ্চে বাহির হইয়াছেন। সেই প্রতিপলকে অনলোদ্গারিণী দৃষ্টি, সেই বিশ্বসংহারী ভীষণ দীর্ঘশ্বাস, সেই সংহারকরাল মূর্তি প্রকৃতই বিশ্বভয়ঙ্করী! শেক্সপিয়রের তৃতীয় রিচার্ড নাটকের মার্গারেট চরিত্র উহার নিকটে ছায়ামাত্র। তিনকড়ি প্রকৃতই একটি নেমেসিস (কৃত্যা-দেবীর) চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিল। এরূপ অভিনয় এদেশে কখনো হয় নাই, হইবে বলিয়া আশাও নাই।'

জনার প্রথম অভিনয়ের পর দিন ২৪শে ডিসেম্বর মিনার্ভায় হলো গিরিশ

চন্দ্রের 'বড়দিনের বকশিস।' তখনো অর্ধেন্দু আছেন, সাজলেন থিয়েটার ম্যানেজার। গুলজার—তিনকড়ি। গয়ারাম—অঘোর পাঠক, মি·ডস—দানীবাবু, মিনিবাবা - হেনা বা হিংগন বালা।

এর আগে নভেম্বরে গিরিশবাবুর 'স্বপ্নের ফুল' মঞ্চস্থ হয়েছিল এই মিনার্ভায়। এতে মন্থরা হিংগনবালা (হেনা), মবহরা—তিনকড়ি, যুথি—কুসুম কুমারী, ধীর—শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু) ও অধীর - দানীবাবু অভিনয় করেছিলেন।

১৮৯৪ এর ২৭শে জানুয়ারী দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'বেজায় আওয়াজ' অভিনীত হয়েছিল মিনার্ভায়। এতে 'লবধন' সাজবার পরই অর্ধেন্দু চলে যান এমারেল্ডে। সেখানে গিয়ে পুরানো-পুরানো নাটক অভিনয় করতে থাকেন। মহেন্দ্র বসু তখন এমারেল্ড ছেড়ে বেঙ্গলে গেছেন। এমারেল্ড কিছুদিন বন্ধ ছিল নতুন ব্যবস্থার জন্য। ১৮৯৪-এর ২২শে সেপ্টেম্বর চণ্ডীকাব্য অবলম্বনে অতুলকৃষ্ণের 'মা' ও ৮ই ডিসেম্বর তাঁরই লেখা মান বা রাধাকৃষ্ণলীলার অভিনয় হয়। গোলাপসুন্দরী বেঙ্গল থেকে কিছুদিন এখানে এসে অভিনয় করেন। মান নাটকে তিনি ছিলেন বৃন্দা, আর বিষাদ কুসুম—রাধিকা।

বেঙ্গলে তখন এসেছেন মহেন্দ্র বসু, এসেছেন প্রমদাসুন্দরী আর শরৎচন্দ্র ঘোষের ভাইপো প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। পুরানো নাটকগুলিরই অভিনয় হতে থাকে। ১৮৯৪-এর ২৮শে জুলাই 'হরি অন্বেষণ'-এ গোলাপসুন্দরী 'মায়া' সাজেন। এখানে 'বিষবৃক্ষ'-এ গোলাপ ছিলেন সূর্যমুখী।

ষ্টারে তখন অমৃতলাল বসু নাট্যায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় শুরু হয়েছিল। প্রথম অভিনয়ের তারিখঃ ৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ সাল। চন্দ্রশেখর—অমৃতলাল মিত্র, শৈবলিনী—তারাসুন্দরী (বয়স তখন ১৫ বছর মাত্র) দলনী—নরীসুন্দরী। রামানন্দ—উপেন্দ্র মিত্র. নবাব—মহেন্দ্র চৌধুরী, প্রতাপ – অক্ষয়কালী কোঁয়ার, ফস্টর—রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়. বিশ্বাস-ঘনশ্যাম দে. গুরগন—সুরেন্দ্র মিত্র (ফটাই) প্রভৃতি। তারাসুন্দরীর অভিনয় সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখে গেছেন, 'শৈবলিনীর সুখ্যাতিতে সমস্ত বঙ্গদেশ ভরিয়া গেল। সকলের মুখেই এক কথা, এতদিন পরে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন্ত শৈবলিনী দেখিয়া আসিলাম। শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই শৈবলিনীর ভূমিকাটি এমন সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল যে তাহাতে দোষ ধরিবার আর কিছুই ছিল না। অনুতাপের অনুশোচনা ও প্রায়শ্চিত্তের নিখুঁত ভাষাভিনয় শ্রীমতী তারাসুন্দরী কল্পনা বলে এমনই সজীব দেখাইয়াছিল যে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষীয়গণকেও পর্যন্ত স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল।'

এই কথা বলেই 'বিদ্যাভূষণ, মন্তব্য করেছেন,—'পনেরো-ষোলো বৎসর বয়সই

অভিনেত্রীর জীবনের বড়ই বিষম কাল। এই সময় শত সহস্র প্রবল প্রলোভন চতুর্দিক হইতে আসিয়া যুবতী উদীয়মানা অভিনেত্রীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। অতি সামান্য অভিনেত্রীই এই প্রলোভনের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে। শ্রীমতী তারাসুন্দরীকেও এই প্রচণ্ড প্রলোভনে পড়িয়া হৃদয়ের দুর্বলতাবশত এই সময় হইতে কয়েক বৎসর থিয়েটারের সহিত সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।'

কিন্তু 'শৈবলিনী' রূপিণী তারাসুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে আরও এক জনের সাফল্যের কথা আসে। সে হচ্ছে দলনী বেগমের ভূমিকায় নরীসুন্দরী। গানে ও অভিনয়ে নরীসুন্দরীও এই নাটকে খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিল। রমাপতি দত্ত তাঁর 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ' বইতে লিখেছেন,—'সত্যকারের দলনী বেগমও বুঝি অমন মর্মস্পর্শী অভিনয় করিতে পারিত না। তাঁহার কণ্ঠ নিঃসৃত 'আজু কাঁহা মেরি' গান এখনো কর্ণে মধু বর্ষণ করিতেছে। শোনা যায়, বহু দর্শক নাকি মাত্র এই গানখানি শুনিবার জন্যই রংগালয়ে আসিতেন।'

রমাপতি দত্ত তাঁর বইতে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে বিশদভাবে লিখেছেন। শৈশব থেকেই তাঁর অভিনয়ে অনুরাগ ছিল। চোরবাগানের বিখ্যাত দত্ত পরিবারের মানুষ তিনি। তাঁর পিতা দ্বারকানাথ দত্ত হাতিবাগানে আলাদা প্রাসাদোপম বাড়ি করেন। মধ্যম ভ্রাতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পিতা) প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। চার ভাই তাঁরা। সেজো ভাই-ই হচ্ছেন অমরেন্দ্রনাথ। অভিজাত ও ধনী পরিবার থেকে থিয়েটার করতে এসে অমরেন্দ্রনাথ রীতিমত আলোড়ন তুলেছিলেন সে সময়। যে 'হৃদয়ের দুর্বলতা'র কথা তারাসুন্দরী সম্পর্কে বিদ্যাভূষণ মশাই বলেছিলেন, সেটি গড়ে ওঠে অমরেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। তারাসুন্দরীর বয়স তখন পনেরো আর অমরেন্দ্রনাথের মাত্র আঠারো। এই বয়সেই অমরেন্দ্রনাথ বিবাহিত ছিলেন। স্ত্রীর নাম হেমনলিনী। রমাপতি দত্ত লিখেছেন, 'পত্নী আসার পর অমরেন্দ্রনাথ কিছুদিন ভয়ে ভয়ে কাটাইতে-ছিলেন ও তাঁহার যথেচ্ছচারের বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়া, হেমনলিনীকে পুনরায় পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিবার ছল খুঁজিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে স্ত্রীকে কোনো উচ্চবাচ্য না করিতে দেখিয়া তাঁহার সাহস বাড়িয়া গেল, যথাপূর্ব থিয়েটার দেখিয়া রাত্রি কাটাইতে লাগিলেন। শেষে একদিন স্টার থিয়েটারে অভিনয় দেখিতে গিয়া তাঁহার জীবনে এক মহা বিপর্যয় উপস্থিত হইল। এইদিন থিয়েটারে যাওয়ার ফলে তাঁহার জীবনের ধারার পরিবর্তন ঘটিল।.. শৈবলিনীরূপী তারাসুন্দরীর অপূর্ব অভিনয় তাঁহার প্রাণে এক অননুভূত সাড়া জাগাইয়া দিল। এরূপ জাগরণের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যাহা, তাহা ঘটিতেও বিলম্ব হইল না।

অমরেন্দ্রনাথ ক্রমশ রাত্রে বাড়ি আসা বন্ধ করিলেন। ব্যাপারটা বেশি দিন চাপা রহিল না। অমরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর ধীরেন্দ্রনাথ ভ্রাতার কীর্তিকলাপ জানিতে পারিয়া একদিন তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিলেন। অমরেন্দ্রনাথের আত্মাভিমান গর্জিয়া উঠিল; তিনি স্থির করিলেন যে, বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়া পৃথক হইবেন। জ্যেষ্ঠকে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্য পত্র লিখিয়া তিনি ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর নাগাদ হাতীবাগান-বাড়ি ত্যাগ করিলেন। স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিয়া সহোদরদিগের সহিত একপ্রকার সম্বন্ধ উঠাইয়া দিয়া বৃদ্ধা মাতার বুকে বজ্রাঘাত করিয়া অমরেন্দ্রনাথ মাণিকতলা বাগমারী-রোডস্থিত পৈতৃক বাগানবাটিতে বাসা বাঁধিলেন। তিনি যে কতো বড়ো সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অগ্রজেরা যে সমাজের কিরূপ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন, এ সকল কথা একবারও তাঁহার মনে হইল না। তিনি পাপের মুখে গা ভাসাইয়া দিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।'

বাগানে অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গী ছিলেন দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ), চুনিলাল দেব, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু (নেপা বোস) নিখিলকৃষ্ণ দেব ও সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দানীবাবু অমরেন্দ্রনাথের থেকে আট বছরের বড় হলেও বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। বাগানে এদের নিয়ে 'খানাপিনা'ও হয়, গানবাজনাও হয়, আবার নাটকের মহলাও হয়। দলের নাম দেওয়া হয়েছিল ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব। অমরেন্দ্রনাথের ইচ্ছাক্রমে তারাসুন্দরী থিয়েটার ছেড়ে বাড়ি বসে রইলো। ঐ বাগানবাড়িতে তার কিছুদিন অধিষ্ঠানও ছিল। এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় গিরিশবাবুর 'রঙ্গালয়ে নেপেন' প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন, (নৃত্য সম্বন্ধে) নেপেন উত্তর করিল,—হ্যাঁ, তিনের পা, পাঁচের পা, সাতের পা সব জানি। আমি তারা'র নিকট বাগানে শিখিয়াছি।

এ-সম্পর্কে রমাপতি দত্ত-ও লিখেছেন। মাকে লেখা অমরেন্দ্রনাথের একটি চিঠি তিনি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে অমরেন্দ্র লিখেছেন, 'আপনি যে লিখিয়াছেন, আমি সুন্দরী স্ত্রী ফেলিয়া এখানে একটা বাজার মাগী নিয়া আছি! অবস্থা আমি বুঝিতেছি না। এটা আপনি বড়ই ভুল বুঝিতেছেন।'

আর একটি পত্রে অমরেন্দ্রনাথ মাকে লিখেছেন, তুমি কথায় কথায় বলো, মন্দ প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দাও। আমার মন্দ প্রবৃত্তি কী? না—আমি বাগানে মেয়েমানুষ লইয়া রহিয়াছি।...বোধহয় শুনিয়াছ, কারণ শুনিবার বড়ো বিশেষ কিছু অভাব নাই, মধ্যে যে যে ঘটনা হয়। দেখিয়া শুনিয়া কি ছল বোধ হয়? এ যদি ছল হয়, জীবনে বড়ো একটা উচ্চশিক্ষা পাইব। স্বর্গের সুখ চোখের উপর আসিলেও তখন তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিব।

যার সব গেল, মুখ চাহিবার কেহ রহিল না, রোগে পড়িলে মুখে জল দেয় এমন কেহ নাই। এমন সময় যদি তাকে পথে দাঁড় করাই, ধর্মে সহিবে কী? সত্যের প্রতিকৃতি তুমি, মিথ্যা বিচার করিয়ো না। যদি বলো, উহাদের ভাবনা কী? আজ এখান থেকে গেলে, কাল আর একজনের পেয়ারের জিনিস হইবে! আমি বলি যে,—বিষে জর্জরিয়া, কখনো যদি সে বিষ ছাড়াইয়া উঠিতে পারে, আর কি সে বিষে ডুবিতে চায়?

এই চিঠির মধ্য দিয়ে তারাসুন্দরীর বিষয়টি সম্যক ফুটে উঠেছে। অমরেন্দ্রনাথের লেখা 'অভিনেত্রীর রূপ' উপন্যাসে এই পরিচিতি আরও বিশদভাবে পাওয়া যায়। যদিও তাতে কল্পনাও কিছু কিছু এসে মিশে যাওয়া স্বাভাবিক। রমাপতি দত্ত এ-বিষয়ে লিখেছেন, 'অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং এই দিন হইতে শুরু করিয়া নট জীবনের সূচনা পর্যন্ত তাহার পারিবারিক জীবনের ইতিবৃত্ত গল্পচ্ছলে 'অভিনেত্রীর রূপ' নামক উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেন। ঐ গ্রন্থের বিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত যে যে ঘটনার উল্লেখ আছে অমরেন্দ্রনাথের জীবনে সেগুলি যথাযথভাবে ঘটিয়াছিল।'

অমরেন্দ্র বাগানে বসে কিছু কিছু কবিতাও লিখে ছিলেন। কিন্তু এই লেখার ব্যাপারে মগ্ন হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত একটি মাসিক পত্রিকা বার করতে মনস্থ করলেন। গিরিশবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সম্পাদক করলেন, নিজে রইলেন সত্ত্বাধিকারী, প্রকাশক ও সহকারী সম্পাদক। পত্রিকার নাম রাখা হলো 'সৌরভ।'

এই 'সৌরভ'-এর ব্যাপারে অনিবার্যভাবে বিনোদিনীর নাম আবার এসে পড়ে।

॥ ৭ ॥

বধূজীবনে দেখতে দেখতে ন-বছর কেটে গেল বিনোদিনীর। তার মেয়েটির বয়স তখন চার বছর! তার নিজের বয়স বত্রিশ। মেয়ে দেখতে অপরূপ সুন্দরী। তবু তার ডাকনাম সে রেখেছিল 'কালো।' এই কালো আর তার নিজের কবিতার খাতাখানি নিয়ে তার দিন কেটে যাচ্ছিল। রাঙাবাবু এখন মাঝে মাঝে থিয়েটারে যান, তাঁর আড্ডায় ত যানই,—থিয়েটারের সব খবরাখবর এনে দেন বিনোদিনীকে। তারাসুন্দরী হঠাৎ 'ষ্টার' ছেড়ে দেওয়ায় ষ্টার যে কী বিপদে পড়েছিল, সে সংবাদও পেয়েছিল বিনোদিনী। বিপদে

পড়েছিল মিনার্ভাও অর্ধেন্দুশেখর হঠাৎ এমারেল্ডে চলে যাওয়ায়। মিনার্ভায় এরপরে মঞ্চস্থ হলো গিরিশচন্দ্রের 'করমেতিবাঈ' (১০ই মে—১৮৯৫)। নাম-ভূমিকায়—তিনকড়ি। অলোক—দানীবাবু, কৃষ্ণ—কুসুমকুমারী, আগমবাগীশ হরিভূষণ, রাধিকা—ভূষণকুমারী, অম্বিকা—গুলফন হরি, টুকরো—অক্ষয় চক্রবর্তী প্রভৃতি। এই সময়কার মিনার্ভার অভিনয় প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাট্যকার ও নট অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' বইতে লিখে গেছেন,—'ম্যাকবেথ, মুকুল মুঞ্জরা, আবুহোসেন, জনা, করমেতিবাঈ রঙ্গালয়ে এক নবযুগ আনিয়াছিল।'

এই 'করমেতিবাঈ'-এর নাম-ভূমিকাভিনেত্রী তিনকড়িকে নিয়ে একটি কৌতুককর কাহিনী শোনা গিয়েছিল। করমেতি বিধবা, কিন্তু বিধবার সাজ প'রে তিনকড়ি কিছুতেই নামতে রাজী হলো না। গিরিশচন্দ্র রেগে গিয়ে বলে উঠলেন, নাপিত ডাক, আমি নিজেই করমেতি সাজবো।

মঞ্চমালিক নাগেন্দ্রভূষণ ছিলেন রসিক ব্যক্তি। তিনি একজনকে ডেকে বললেন,—ওহে, একবার বাইরে বেরিয়ে দেখে এসো দেখি বক্সগুলোয় কোনো বাধাবিঘ্ন আছে কিনা।

লোকটি দেখে এসে খবর দিলো,—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনকড়ি বিবির বাবু বক্সে রয়েছেন।

নাগেন্দ্রবাবু গোল মিটিয়ে দেবার জন্য নিজেই গেলেন সেই বক্সে, ভদ্রলোকটিকে বুঝিয়ে বললেন বিপদের কথা। তিনি উঠে পড়লেন। তারপরে জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন। মিটে গেল গোল। তিনকড়ি বিধবার বেশ পরে মঞ্চে নামলো।

এ নিয়ে হাসাহাসি কম হলো না। কিন্তু তিনকড়ির এই মনোভঙ্গি ও ভাবাবেগ তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই প্রমাণিত করে। প্রণয়ী হলেও যাকে সে পেয়েছে, তাকে মনে মনে স্বামীরূপে কল্পনা না করলে এ-আচরণ করতো না। এ তার ছেলেমানুষী, এ তার সারল্য। কিন্তু তলিয়ে বুঝলে এ-জন্য তাকে প্রশংসা না করে উপায় নেই। সাধারণ বারাঙ্গনা হলে এ-আচরণ সে করতো কী?

এরপরে ষ্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মিনার্ভা গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল অভিনয় করে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের 'যোগেশ'-এর ভূমিকা এক অসামান্য কীর্তি বলে কথিত হতো। ষ্টারে তিনিই অমৃতলাল মিত্রকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিজের হাতে তৈরি করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার নিজের অভিনয়ের কাছে অমৃতলালও ম্লান হয়ে গেল। লোকে দল বেঁধে একবার মিনার্ভায় একবার ষ্টারে গিয়ে ঐ একই 'প্রফুল্ল' দেখতে লাগলো। দর্শকদলের মধ্যে এবার রাঙাবাবুও ছিলেন।

যোগেশরূপী গিরিশচন্দ্র অতুলনীয়, অন্যান্য পার্টের মধ্যে 'রমেশ'-বেশী অমৃতলাল বসু, চুণীলাল দেবের থেকে অনেক ভালো। মিনার্ভার 'সুরেশ' দানীবাবুও কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের থেকে ঢের বেশি চিত্তাকর্ষক। জ্ঞানদার ভূমিকায় ষ্টা র ছিল প্রমদাসুন্দরী, কিন্তু মিনার্ভার 'জ্ঞানদা'—কুসুমকুমারীকে মানিয়েছে সুন্দর, অভিনয়ও প্রমদার থেকে ভালো।

এই সব কথাই রাঙাবাবু বলছিলেন বিনোদিনীকে। বিনোদিনী মেয়েকে আদর করতে করতে ওর কথা শুনছিল। রাঙাবাবু বললেন,—কিছু মনে করো না, এই অভিনয়ের অনেক আগেই আমি গিরিশবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম।

—বাড়িতে?

—হ্যাঁ।

—কেন?

রাঙাবাবু বললেন, কারণ আছে। আমাদের আড্ডায় খবর এসেছিল যে উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—সে কী! কেন?

রাঙাবাবু বললেন,—রাগ করবে না তো? তুমি যে কবিতা লেখো, একথা আমাদেরই কোনো বন্ধুর মারফৎ তাঁর কানে গিয়েছিল। তোমার কবিতা পড়বার জন্য তিনি খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাই তোমাকে লুকিয়ে আমি তোমার খাতা থেকে দুটি কবিতা তাঁকে দিয়ে এসেছিলাম।

—ছিঃ—ছিঃ! এ কী করলে তুমি!

—ঠিকই করেছি। তোমার লেখা পড়ে তিনি যে কী খুশি হয়েছেন তা বলার নয়।

—বলছো কী! তাঁর ভালো লেগেছে?

—শুধু ভালো লেগেছে নয়, তাঁর সম্পাদনায় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 'সৌরভ' বলে যে মাসিক পত্রিকা বার করেছেন, তাতে তোমার একটি কবিতা ছেপে দিয়েছেন।

কথাটা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল বিনোদিনী। রাঙাবাবু পত্রিকার একটি কপি সঙ্গেই এনেছিলেন। সেটি আড়াল থেকে নিয়ে এসে ওর হাতে দিলেন। তাতে ছাপা হয়েছে তার 'হৃদয় রত্ন', কবিতাটি আর তারাসুন্দরীর কবিতা, 'প্রবাহের রূপান্তর।' কবিতাদুটির মুখবন্ধ হিসাবে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন, 'সভ্য সমাজে আমার স্থান আছে কিনা জানি না, জানিতেও চাহিনা। কারণ থিয়েটারের প্রথম অবস্থা হইতে রঙ্গভূমির উন্নতি উদ্দেশ্যে দৃঢ়সংকল্প হইয়া জনসাধারণের উপেক্ষার পাত্র হইয়া আছি; সে যাহা হউক, অভিনেতৃবর্গ আমার চক্ষে, আমার পুত্র-কন্যার মতো সন্দেহ নাই! তাহাদের গুণগ্রাম অপ্রকাশিত থাকে

আমার ইচ্ছা নয়। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কবিতা দুইটি পত্রিকায় প্রকাশ করিলাম।

বিনোদিনী 'সৌরভ' এর কপিটি নিয়ে একছুটে তার শোবার ঘরে চলে এলো। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখে সে অবাক হয়ে গেল! তার 'হৃদয়-রত্ন' র প্রতিটি পংক্তি তাকে অবাক করতে লাগলো।

"এস হে হৃদয়ে এস হৃদয়রতন
অনন্ত শূন্যতে সদা করি অন্বেষণ।
বাসনা বিবরণ আজি খুঁজিয়া তোমায়।
তাইতে কাতর প্রাণ স্মরণ যে চায়।
জ্ঞানময় চিদানন্দ চৈতন্য স্বরূপ
বিরাজিত আছে যাঁর প্রতি লোমকূপ।
হেরিব কোথায় সেই বিশ্বের চেতন
পরমাত্মা জীবাত্মার কোথায় মিলন।"

তার শরীর যেন পুলকে কণ্টকিত হয়ে উঠলো, —সে সবটা পড়তে পারলো না। পত্রিকাটা টেবিলে রেখে সে তার কবিতার খাতা খানা খুঁজতে লাগলো। ইস্! কোথায় গেল তার সর্বস্ব ধন—তার কবিতার খাতা?

রাঙাবাবু ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন,—কী খুঁজছো?

—আমার খাতা?

—খাতা আছে।

—কোথায়?

রাঙাবাবু মুখ টিপে হাসছিলেন, বললেন, গিরিশবাবুর কাছে।

—বলছো কী!

—তিনি দেখে দিচ্ছেন। আমি ওটা বই করে ছাপিয়ে বার করবো!

বিনোদিনী বিস্ময়ে যেন মুহূর্তের জন্য নিথর হয়ে গেল!

তারপরে, বিস্ময়ের ঘোর কাটলে সে বলে উঠলো,—লোকে কী বলবে! ছি—ছি! কী করতে যাচ্ছো তুমি!

—ঠিকই করতে যাচ্ছি। গিরিশবাবুরও তাই ইচ্ছে। লক্ষ্মীটি '...' করো না।

খুকি তখন ছিল লাইব্রেরী ঘরে। সে আর থাকতে পারলো না, রাঙাবাবুর বুকে মুখ রাখলো, চোখ দুটি সজল হয়ে উঠলো, এতো ভালোবাসো তুমি আমায়!

তারপরে অনেক রাত্রে, বিশ্বচরাচর যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন আবার

উঠলো, সন্তর্পণে টেনে নিলো 'সৌরভ' এর কপিখানা। রাঙাবাবু বিছানায় ঘুমিয়ে আছেন, টেবিল ল্যাম্পটা একটু আড়াল করে রাখলো, যাতে আলোর ছটা তাঁর চোখে না গিয়ে লাগে, চেয়ারে বসে আবার সে পড়তে লাগলো হৃদয়রত্ন। পড়তে পড়তে বিনোদিনী ভাবতে লাগলো, উনি বেছে বেছে এই কবিতাটাই বা গিরিশবাবুর কাছে দিয়ে এসেছিলেন কেন? উনি কি জানেন তার 'হৃদয়রত্ন'-কে? এই অনুভূতি তার মধ্যে কী করে এসেছিল? সেই 'সীতা'র ভূমিকা অভিনয় করার সময়। রাবণের অশোক বনে কে এসে তাঁকে স্বপ্নে 'অমৃতান্ন' খাইয়ে চলে যায়! সে কি তার মাতা বসুমতী? সীতার মাতা বসুমতী হয়ত সবার অলক্ষে আবির্ভূত হতেন, কিন্তু তার নিজের জীবন? গিরিশবাবুর দেওয়া সংলাপ সীতার অভিনয়ে বলতে বলতে বহুবার মনে হয়েছে, তারও জীবনে কি অমন অশরীরী কেউ নেই, যে অলক্ষ্যে বসে তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে, এক কূল থেকে আর এক কূলে এমন করে ফেলেছে? তার স্বরূপ কী? 'হৃদয়রত্ন'-এর শেষের দিকে তাই সে লিখেছে:--

'কোথা সে অনন্ত যার অন্ত নাহি পাই
কোথা জ্ঞানরূপ যাতে আপন হারাই।
যাহাতে উৎপত্তি হয় তাহাতেই লয়—
কেমন আধার তাহা দেখি লয় হয়!'

বিনোদিনী ধীরে ধীরে পৃষ্ঠা উলটে গেল। চোখে পড়লো তারাসুন্দরীর কবিতাটি, 'প্রবাহের রূপান্তর।' কবিতাটির এক জায়গায় তারা লিখেছে:

'সহোদর সহোদরা প্রাণের সঙ্গিনী যারা—
স্বার্থের ছলনে ভুলি, করে আত্মবলি।
ভালোবাসি যদি কারে, নানা কথা কয় তারে,
কাতরে হৃদয়-ভারে, দিবানিশি জ্বলি।
একথা বুঝিবে কেরে? দুহিতায় ছুরি মেরে,
মাতা করে অন্বেষণ, সুখ আপনার?'

পড়তে পড়তে মনটা কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল।

পরের মাসে অর্থাৎ ভাদ্রে বেরুলো 'সৌরভ'-এর দ্বিতীয় সংখ্যা। তাতে ছাপা হলো তার নিজের 'অবসাদ' কবিতাটি। যাতে সে লিখেছিল:

'যার যে মাধুরী ছিল সব তারা নিয়ে গেল
ফেলে রেখে গেল শুধু অশ্রুমাখা হাসি।
অবশেষে যে বা ছিল হাসিটি কুড়ায়ে নিল
বিনিময়ে দিয়ে গেল বিষাদের রাশি।

হাসি কান্না করে শেষ   তারা গেছে কোন দেশ
আমারে রাখিয়া গেছে না দেখিতে পেয়ে—
পাব না তাদের দেখা   আমি শুধু আছি একা
কুটির দুয়ারে বসে অশ্রুপানে চেয়ে।'

তার অমন স্বামী, অতুল ঐশ্বর্য, সোনার পুতুলের মত মেয়ে,—তবু প্রাণের মধ্যে এতো বিষাদ এসে মাঝে মাঝে কী করে জমে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনোদিনী 'সৌরভ'-এর পৃষ্ঠা ওলটায়। এ সংখ্যাতেও তারাসুন্দরী কবিতা লিখেছে 'কুসুম ও ভ্রমর' নাম দিয়ে। লিখেছে :

'প্রেম আসে, আসে যায়, প্রেমিক ভ্রমর?
অনাদর নাহি করে, সমাদর যারে তারে—
মধু খায়, সুখে বসে—বুকের উপর।
বোঝা দায়, কে তোমার আপনার পর।'

'সৌরভ'-এর এই সংখ্যায় অমরেন্দ্রনাথও একটি নিবন্ধ লিখেছেন, 'স্বার্থ ও সংসার'। বিনোদিনী পড়তে লাগলো :

'দুর্ভাগ্যক্রমে পূজ্যপাদ পিতা ইহলীলা সম্বরণ করিলেন।...দিন কাটিতে লাগিল, সময়ে সকলই লয় পায়। পিতৃশোকের সমতা ক্রমে কমিয়া আসিল। বিষাদিনী জননী একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—দেখ বাবা, তোমার মাথার উপর এখন কেহ নাই। তুমি সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষের বড় আদরের পাত্র ছিলে, তোমার অবস্থান্তর হইলে আমি প্রাণে বাঁচিব না। বেশ করিয়া বোঝো, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই বলিয়া একটা কথা আছে! যতদিন না আপনার দিন কিনিতে পারো, জেষ্ঠের পদানত হইয়া চলিও, কাহারও উপর মান অভিমান করিও না. সকলকে আপনার মত করিয়া রাখিও।... মধ্যম আপনার লেখাপড়া লইয়া থাকে, উহার প্রতি ততটা লক্ষ্য রাখিও না, কারণ তোমায় পূর্বে বলিয়াছি, সংসারে সকলে আপনার কাজ করে। উহাদের প্রতিকুলাচরণ করিলে তোমার হেনস্থার শেষ থাকিবে না।...বিবাহ হইল, বন্ধনের উপর বন্ধন পড়িল। সম্মুখে নারায়ণ রাখিয়া ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া আপনার বলিয়া যাহাকে গ্রহণ করিলাম, সে আমার চিরজীবনের সঙ্গিনী হইতে চলিল। আমার সুখে সুখী, আমার দুঃখে দুঃখী, আমি হাসিলে হাসিবে, আমি কাঁদিলে কাঁদিবে! ভুল মনে করিলাম! আপনার সহোদর আপনার হয় না, অজানিত কুলশীলা,—সে আমার সর্বস্ব হইবে?...আমি তখন লেখাপড়া ছাড়িয়া কর্মে নিযুক্ত হইয়াছি। বলিতে লজ্জা করে, আমার প্রয়োজনীয় আমি পাইতাম না, আমার দুঃখ কেহ কানে তুলিত না, আমার সামান্য প্রার্থনাও পূর্ণ হইত না।...কোনো

উপায়ান্তর না দেখিয়া মর্মান্তিক যন্ত্রণা স্নেহময়ী জননীকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, বাবা, এসকল কথা লইয়া আমি কী কথা কহিব বল? উহারা উপযুক্ত হইয়াছে, আমি উপরপড়া হইয়া কিছু বলিলে, উহারা মনে করিবে আমি তোমার হইয়া কথা কহিতেছি! দেখ, যে যা বলে, যে যা করে, সব সহিয়া যাও!...আমার প্রাণে বড় বাজিল, চক্ষে জল আসিল, বলিলাম—কেন মা, যে যা করে, যে যা বলে, সব সহিব কেন? সত্যই কি আমি ভাসিয়া আসিয়াছি? আমায় কি পিতা তেজ্য করিয়া গিয়াছেন? সম্পত্তির উপর আমার কি কোনো স্বত্ব নাই?...সংকল্প বদ্ধমূল করিলাম, আর কিছুদিন দেখিয়া পিতৃ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়া এ স্থান পরিত্যাগ করিব।'

কথাগুলো বিনোদিনীর মনে কয়েকদিন ধরে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছিল, একদিন রাঙাবাবুকে বললে, দ্যাখো, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত আর তারাসুন্দরীকে নিয়ে তুমি কিছু কথা আমায় বলেছিলে। ওদের সব কথা তুমি জানো?

রাঙাবাবু বললেন, সারা কলকাতার লোক জানে, আর আমি জানবো না? আমাদের আড্ডায় এ নিয়ে কতো আলাপ—আলোচনা হয়ে গেছে!

—একটু শুনি?

রাঙাবাবু বললেন,—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ঐ অল্প বয়সে কিছু বদ বন্ধুর পাল্লায় পড়ে অস্থানে-কুস্থানে যেতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু স্টারে পনেরো বছর বয়সী 'শৈবলিনী'—রূপিণী তারাসুন্দরীকে দেখে আঠারো বছরের যুবক অমরেন্দ্রনাথ তার রূপে-গুণে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। একটি দৃশ্যে 'শৈবলিনী' যখন প্রতাপের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে, সেই সময় তার দীর্ঘ নিঃশ্বাসটুকুও যেন অনুভব করতে পারলেন অমরেন্দ্রনাথ। পাশে-বসা বন্ধুটিকে নিচু গলায় বললেন,—এ মেয়েটি বেশ্যা হোক—কিন্তু প্রাণশূন্য নয়। প্রাণ দিয়ে প্রাণ পাবার জন্য এখানে-ওখানে ছুটে বেড়াচ্ছি, কিন্তু সত্যিকার প্রতিদান কোথাও পাই নি। যদি ভালোবাসতে হয়, তবে এই আমার ভালবাসার উপযুক্ত আধার!

বিনোদিনী অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করলো রাঙাবাবুর দিকে, মুখ টিপে হেসে বললে,— এতো কথা তুমি জানলে কী করে?

—জানলুম।

—নিজের অভিজ্ঞতা আরোপ করে কী?

রাঙাবাবু ওকে কাছে টেনে নিলেন, অল্প একটু হেসে বললেন,—সেভাবে ভেবে দেখিনি। কথাগুলো একেবারে খাস সেই বন্ধুটির কাছে শোনা। মাঝে মাঝে সেও যে আমাদের আড্ডায় চলে আসে।

—তারপর?

—বন্ধুটি এর আগে ওঁকে অনেক বারবনিতার বাড়ি নিয়ে গেছে। দুই হাতে অমরেন্দ্রনাথ টাকা ছড়িয়েছেন, কিছুদিনের জন্য যশগুণও হয়েছেন, কিন্তু সামান্য চুটি পেয়ে অমরবাবু সরে এসেছেন সে সব জায়গা থেকে। সেদিন স্টারে অমরবাবুর অবস্থা দেখে ও কথা শুনে চতুর বন্ধুটি ভাবলো, এই তো সুযোগ! কিছু দিনের জন্য যদি ওকে এক জায়গায় স্থায়ী করতে পারি, তাহলে নানা উপায়ে বেশ দুটাকা মেরে নিতে পারবো।

'চন্দ্রশেখর' দেখতে দেখতে চতুর্থ অঙ্ক শেষ হলো, কনসার্ট বাজছে, বন্ধুটি উঠে দাঁড়ালো, বললে, তুমি বোসো, আমি একটু ভিতরে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে আসি। বলে বন্ধুটি চলে গেল, তারপরে ড্রপ যখন উঠি-উঠি করছে, তখন ফিরে এলো, বললে, সব ঠিক। ঠিকানা পেয়েছি। আজ রাতেই ওখানে শুভ-পদার্পণ করা যাবে।

—তারপর?

রাঙাবাবু বললেন,—ওঁরা একখানা গাড়ি ভাড়া করে সোজা চলে গেলেন তারাসুন্দরীর মায়ের বাড়ি। তারাসুন্দরীর এক বড়ো বোন ছিল তুমিত জানোই। তাদের সঙ্গে বন্ধুটি দিব্যি গল্প জমিয়ে ফেললো, সেই সঙ্গে অবশ্য অমরেন্দ্রনাথের বংশ ও বিত্তের পরিচয় দিতে ভুললো না। তারাসুন্দরীর মা কী বলেছিলেন জানো? আমি সব শুনেছি। তোমাকে একটু বিশদ করেই বলছি। তারাসুন্দরীর মা বলেছিলেন, আমার মেয়ে বরাবর একজনের কাছেই ছিল, তাকেই স্বামীর মতো ভালোবাসতো ও ভক্তি করতো। দ্বিতীয় পুরুষের মুখ আজ পর্যন্ত দেখে নি। অমরবাবু যদি আমার মেয়েকে বাঁধা রাখতে রাজী হন, তাহলে বাকি কথা কইতে পারি। নইলে দু-একদিন যাওয়া আসা করবেন শুনলে মেয়ে আমার এই ঘরেই ঢুকবে না। মা সঙ্গে সঙ্গে সর্তও জানালেন, দেড়শো টাকা করে তাকে মাইনে দিতে হবে, ছয় মাসের আগাম চাই। তাছাড়া তিরিশ ভরি গিনি সোনার এক ছড়া বিছে হার। অমরবাবু সর্ত মেনে তৎক্ষণাৎ তিনশো টাকা অগ্রিম দিয়েছিলেন। এই সব কথা বলার পরই থিয়েটারের গাড়ি এসে রাস্তায় দাঁড়ালো, তারাসুন্দরী এসে ঘরে ঢুকলো। এই হলো শুরু।

—তারপর?

রাঙাবাবু বললেন,—চারদিকে ঢি ঢি পড়ে গিয়েছিল। আমাদের আড্ডায় খবরের পর খবর আসতে লাগলো। তবে এটুকু শুনেছিলাম, তারাসুন্দরী অমরকে ভালবেসে ফেলেছিল। অমরবাবু স্ত্রী হেমনলিনীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এসে উঠলেন বাগানবাড়িতে। এ সব কথা আগেই তোমাকে বলেছিলাম, মনে করে দেখো।

—মনে আছে।

রাঙাবাবু বললেন,—অমরবাবু একদিন তারাকে বললেন, চলো মুঙ্গের বেড়িয়ে আসি। ওখানে আগে একবার গিয়েছিলাম, আমার খুব ভালো লেগেছিল। কষ্টহারিণীর ঘাটে স্নান করলে তুমি খুব তৃপ্তি পাবে। রাজী হলো তারাসুন্দরী। থিয়েটারে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলো। 'চন্দ্রশেখর' তখন স্টারে দারুণ জমে গেছে, তারারও খ্যাতির অন্ত ছিল না, সব ছেড়ে সে চলে গেল মুঙ্গের। অমরবাবু সঙ্গে সেই বন্ধুটিকেও নিতে ভুললেন না। মুঙ্গের ফোর্টের মধ্যে একটি ভালো বাড়ি ভাড়া করে সেখানে উঠলেন। গঙ্গার কষ্টহারিণী ঘাটে দুজনে স্নানও করলেন। সেই গঙ্গার জল স্পর্শ করিয়ে তারাসুন্দরী অমরবাবুকে শপথ করালো, আমাকে কখনো ত্যাগ করতে পারবে না। ও কী বিনোদিনী, তোমার চোখে জল?

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে চোখ মুছলো, অস্ফুট গলায় বললো,—না, ও কিছু নয়। কিন্তু মনে মনে সে জানতো, মুহূর্তে সে কোথায় চলে গিয়েছিল! সেই স্মৃতি! সেই কাশীর গঙ্গা! সেই গঙ্গা স্পর্শ করে পাগলের উক্তি!

কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো,—তারপরে?

রাঙাবাবু বললেন, তারার শপথ আরও ছিল। অমরবাবুকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলো, কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তারার সঙ্গে, কখনো তার মনে ব্যথাও দেবে না। অর্থাৎ যাতে সে ব্যথা পায়, এমন একটি কাজও করবে না। এমন কী, প্রতিজ্ঞাও করিয়ে নিলো, তারা আর নিজের স্ত্রীর মুখ ছাড়া আর কারও মুখ অমরবাবু দেখতে পারবেন না। যাই হোক, মাসখানেক তাঁরা মুঙ্গেরে কাটিয়ে ফিরে এলেন কলকাতার সেই বাগানবাড়িতে। সকালের দিকে তাঁরা পৌঁছেছিলেন, আর বিকালেই তারার দিদি কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হলো, বললে,—মাকে যদি শেষ দেখা দেখতে চাস তো এখ্খুনি চল, মা মৃত্যু-শয্যায়! সঙ্গে সঙ্গে কান্নার রোল উঠলো। অমরবাবু একটি গাড়ি ডাকিয়ে এনে সঙ্গে একটি লোক দিয়ে তখ্খুনি দুই বোনকে পাঠিয়ে দিলেন মায়ের কাছে।

—তারপর?

—মায়ের অসুখ-টসুখ সব বাজে। ওকে ভিতরে ঢুকিয়ে একেবারে দরজা বন্ধ করে দিলো মা আর বোন। যে দারোয়ানটি সঙ্গে গিয়েছিল, সে বাইরে থেকে শুনতে পেলো তারার চিৎকার,—বাবুকে গিয়ে খবর দাও আমাকে জোর করে এরা আটকে ফেলেছে। যেরকম করে হোক যেন এসে এখ্খুনি আমায় উদ্ধার করে। দারোয়ান ফিরে এসে এ-কথা জানালে অমরবাবু তাঁর সেই

বন্ধুটিকে ডাকিয়ে এনে ছুটলেন তারার মার বাড়ির দিকে। কিন্তু বন্ধুটি তা করতে দিলো না, বললে, তার থেকে আগে চলো থানায় যাই। থানার ইনস্পেক্টরটি অমরবাবুর চেনাশোনা লোক। তিনি সব শুনে অমরবাবুকে বললেন, আপনি যদি নিশ্চিত আমাকে বলতে পারেন যে তারাসুন্দরী আপনাকে চায়, তার মা আর দিদির কাছে থাকতে চায় না, তাহলে আমি এই মুহূর্তেই আপনার কাছে তাকে হাজির করে দিতে পারি। অমরবাবু উত্তরে বলেছিলেন বলে শুনেছি,—আমার যতদূর বিশ্বাস, সে আমাকেই চায়, আর কাউকে চায় না। এ-কথা শুনে ইন্সপেক্টর সাহেব আর দেরি করলেন না। তখ্খুনি ছুটলেন একদল কনস্টেবল নিয়ে। অমরবাবুরা থানাতেই বসে রইলেন। তারাসুন্দরীর মার বাড়ির দরজায় পুলিশের ধাক্কা পড়লো সেই রাত্রে। কিন্তু ভিতর থেকে কেউ সাড়া দেয় না। শেষপর্যন্ত দরজা ভাঙতে হয়েছিল। তখন ছুটে এলো তারার মা আর দিদি। ভয়ে তারা কাঁপছে! ধমকে উঠলেন ইন্সপেক্টর,—তারা কোথায়? ওরা আঙুল দিয়ে দেখালো,—ওপরে। সিঁড়ি বেয়ে ইনস্পেক্টর উঠলেন ওপরে। একটা ঘর তালাবন্ধ। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন,—কে আছো ভিতরে? তখ্খুনি সাড়া মিললো: আমাকে জোর করে আটকে রেখেছে। উদ্ধার করুন। মার কাছ থেকে চাবি নিয়ে দরজা খুললেন ইন্সপেক্টর। তারাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সোজা উত্তর দাও,—তুমি মার কাছে থাকতে চাও, না অমরবাবুর কাছে থাকতে চাও? তারা উত্তর দিলো,—আমি অমরবাবুর কাছেই থাকতে চাই। এ-কথা শুনে ইন্সপেক্টর তারাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে থানায় এলেন, অমরবাবুকে বললেন,—এই নিন আপনার হারানো মানিক! অমরবাবু তারাকে নিয়ে এলেন বাগানবাড়ি। বছরখানেক এই বাগানে তাদের কেটে গেছে। ওদিকে অমরবাবুর দেনা হয়েছে প্রায় লক্ষ টাকার। পিতৃ-সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা তখনো হয়নি। দেনার দায়ে অমরবাবু দিশাহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত তারাসুন্দরীকেই সব কথা খুলে বললেন। তারাসুন্দরী আন্দাজ করেছিল, কিন্তু এতোটা জানতো না। সব শুনে অমর-বাবুর দুঃখে ওর চক্ষে জল এলো। আমি একটু বাড়িয়ে বলছি না বিনোদিনী, যা শুনেছি, তাই বলছি। তারাসুন্দরী চোখের জল মুছে সেদিন বলেছিল,—আমার কথা তুমি সবই জানো। বাড়ি ছেড়ে যখন তোমার সঙ্গে বাগানে আসি, হাতের এই চুড়ি কগাছা ছাড়া মার কাছ থেকে আর কিছুই পাইনি। মার সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, আর সেখানে গিয়ে থাকবার মুখ আমার নেই। নইলে আমার সর্বস্ব আমি তোমার এই বিপদের দিনে তোমার পায়ে এনে দিতাম! এই বলে একটা গাড়ি ডাকিয়ে এনে তাতে

অমরবাবুকে জোর করে তুলে দিলো তারাসুন্দরী, বললে, তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে যাও। তাঁর কাছে তোমার কোনো সংকোচ নেই। এই বিপদে সতীলক্ষ্মী তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। হলোও তাই। তাঁর সমস্ত গয়না যে বাক্সে ছিল, সেই বাক্স স্বামীর হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি তাঁর স্ত্রী—হেমনলিনী। অমরবাবু সেই বাক্স নিয়ে আবার গাড়িতে উঠে বসলেন। সে যাত্রা বিপদ থেকে অমরবাবু উদ্ধার পেলেন বটে, কিন্তু অন্য এক বিপদ তাঁকে গ্রাস করলো। ঐ যে অমরবাবুর বন্ধুটি? তাঁর নাম আমরা জানি, কিন্তু সে নাম শুনে আর তোমার দরকার নেই বিনোদিনী, লোকটি ভদ্রঘরের একটি তরুণী বিধবাকে ফুসলে এনে ঐ বাগানবাড়িতেই তুলেছিল, তার নাম চন্দ্রা অথচ সে নিজে কিন্তু বিবাহিত, ও পক্ষে তার ছেলেপিলেও আছে। ও-সব লোকের মধ্যে স্নেহ, প্রীতি কিছু থাকে না, থাকে শুধু লোভ —টাকার ওপর প্রচণ্ড লোভ। সে করলো কী, ঐ চন্দ্রামেয়েটিকে অমরবাবুর কাছে ভিড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। তারাসুন্দরীকে ডেকে একদিন চুপিচুপি বললে, অমর চন্দ্রার প্রেমে একেবারে উন্মাদ হয়েছে। তারা তা বিশ্বাস করেনি। বন্ধুটি বললে কী জানো? বললে, আমি যদি তোমায় হাতেনাতে ধরিয়ে দিতে পারি? তারা উত্তর দিয়েছিল, তা যদি পারো তাহলে জানবো তুমি আমার সত্যিই শুভাকাংখী বন্ধু! বন্ধুটি বললে,—তা যদি না পারি, তাহলে পৈতে ছিঁড়ে পুকুরের জলে ফেলে দেবো! ওদের এই কথাবার্তার সময় অমরবাবু এসে হাজির হলেন। চোখের কোলে কালি, বিপর্যস্ত অবস্থা। গাড়ি থেকে নেমেই তিনি তারার কাছে এলেন, বললেন, আমার বড় বিপদ। আমার স্ত্রীর ভয়ঙ্কর জ্বর—একশো পাঁচ ডিগ্রির ওপর—আবোলতাবোল বকছে! জ্ঞান নেই, চৈতন্য নেই, আজ রাত্তিরটা কাটে কিনা সন্দেহ!—আর কোনো কথা না বলে অমরবাবু আবার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন, উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলে গেলেন। এই সুযোগে বন্ধুটি তারার কান ভারী করতে লাগলো। এরপরে তিনদিন অমরবাবু আর বাগানে আসেননি। তিনি ঐ তিনদিন সমানে স্ত্রীর বিছানার পাশে বসে তাঁর সেবাশুশ্রূষা করতে লাগলেন। চার দিনের দিন স্ত্রীর বিপদ কাটলো, একটু সুস্থ হলেন তিনি। তাঁকে সুস্থ দেখেই অমরবাবু বাগানে এলেন। কিন্তু তারার মুখখানা ভার-ভার—আগের মতো হাসি-হাসি ভাব আর নেই। দেখতে দেখতে রাত নামলো—অমাবস্যার রাত। বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সে রাত্রে অমরবাবু নাকি ব্র্যাণ্ডি একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছিলেন। খেয়ে পুকুরের ঘাটের বড়ো বাঁধানো চাতালটায় গিয়ে বসেছিলেন। বন্ধু এসে তারার কথা বললে। বললে যে, সে এক গেলাসেই ঢলে পড়েছে, বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে। ডাকবো? অমরবাবু বললেন,—না,

থাক। বলে আরও ব্র্যাণ্ডি খেতে লাগলেন। এই অবসরে ঐ বন্ধুটি চন্দ্রাকে টেনে এনে ওর দিকে ধমকে ধমকে এগিয়ে দিলো। অমরবাবুরও হলো দুর্মতি। মদের ঘোরে বুঝতে না পেরে চন্দ্রাকে তারাসুন্দরী ভেবে ওকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন। বন্ধুর চক্রান্ত সার্থক হলো। তারা ঘুমোয় নি, ওকে উঠিয়ে সময়মত জানালায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল বন্ধুটি। নিজের চোখে অমরবাবুর কাণ্ড দেখে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলো না তারাসুন্দরী। এই তোমার মুংগের ঘাটের শপথ? রাগের মাথায় তখ্খুনি গাড়ি ডাকিয়ে মায়ের কাছে চলে গেল সে। গিয়ে দেখে, তার দিদি নেই, সে তার প্রেমিকের সঙ্গে কোথাও ভেগে গেছে। চোখের জলে মা আর মেয়ের মিলন ঘটলো। পরদিন সকালে বন্ধুর সঙ্গে চন্দ্রার তুমুল ঝগড়া। ঝগড়ার মুখে সব কথা বেরিয়ে পড়েছিল, সে সব শুনে আর কিছু বুঝতে কি অমরবাবুর বাকি থাকে? চন্দ্রাকে নিজের বোন বলে ডেকে মাপ চাইলেন অমরবাবু, তারপরে চলে গেলেন নিজের বাড়ি, বিচ্ছেদ ঘটে গেল বন্ধুর সঙ্গে।

—তারপর?

রাঙাবাবু বলতে লাগলেন, বাড়িতে শিশুপুত্র আর স্ত্রীকে নিয়ে ভালোই দিন কাটছিল অমরবাবুর। তাঁর বাড়ির এক আত্মীয়ের ছেলে তখন রীতিমত মাতব্বর হয়ে উঠেছিল। বাড়ি ব'সে এক-একদিন মন কেঁদে উঠতো অমরবাবুর। স্ত্রী হেমনলিনী সব বুঝতে পারলেন। একদিন স্বামীকে বললেন,—সে অভিমান করে চলে গেছে! কদিন টিঁকবে এ অভিমান? তুমি ডাকলেই আবার আসবে। আমি বেশ জানি, সে তোমায় ভালবাসে। তা না হলে মাকে পর করে থিয়েটার ছেড়ে সে তোমার কাছে আসতো না! তুমি যাও, তাকে ডেকে এনে আবার সুখী হও! আমার জন্য ভেবো না। তোমার সুখেই আমার সুখ! তারা কথাবার্তা বলছে, এমন সময় বাইরে গোলমাল। অমরবাবুর আত্মীয়ের সেই মাতব্বর পুত্রটি মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে এসে দারোয়ানকে খুব মেরেছে। যাকে সামনে আসছে তাকেই ঘুঁসি মারছে—একটা হৈ-চৈ পড়ে গেছে! ওদিকে অমরবাবুর সেই বন্ধুটি চন্দ্রাকে নিয়ে হাড়কাটা গলিতে একটা ভাঙাচোরা একতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করছে। তার বিবাহিত স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা মরতে বসেছে না খেয়ে। সে সংসারও চলে না, এ সংসারও চলে না। এক ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে চন্দ্রা নার্সিং শিখে নার্স হলো। ডাক্তারের সংগে যখন তখন 'কল'-মাফিক বাইরে যায়। তাই নিয়ে দুজনে খুবই অশান্তি। অমরবাবুর জীবনেও আবার অশান্তি ঘনিয়ে এলো! এক জহুরীর কাছে তাঁর ধার ছিল দেড় হাজার টাকার। তার তাগাদার জ্বালায় অস্থির হয়ে তিনি তাকে একটি চেক লিখে দিলেন। কিন্তু চেক তো লিখলেন, ব্যাঙ্কে অথচ টাকা ছিল না।

এই সময় তাঁর এক উকিল বন্ধু অনেক দিন পরে তাঁর সংগে দেখা করতে এসেছিলেন। উপায়ান্তর না দেখে তাঁকেই সব খুলে বললেন অমরবাবু। একেই বলে বুদ্ধির ভ্রম। অন্ততঃ নিজের স্ত্রীকেও যদি কথাটা বলতেন! তা না করে উকিল বন্ধুর সঙ্গে বসলেন পরামর্শ করতে। উকিল বন্ধু একটা মতলব ঠাওরালেন। ঠাউরে, ওঁদের পরিচিত আর এক জহুরী—করমচাঁদ জহুরী, তাকে এক বাক্স জরোয়া গয়না সমেত নিয়ে এলেন বাড়ির ভিতরে। চেনাজানা বাড়ি—করমচাঁদ আর দ্বিমত করলো না—সেই জড়োয়া গয়না ৩৬৩৫ টাকায় কিনে নিয়ে একটা বিলে সই করে দিলেন অমরবাবু। করমচাঁদ শুধু বললে, দুমাসের মধ্যেই টাকাটা দিয়ে দেবেন কিন্তু। অমরবাবু বললেন,—নিশ্চয় দেবো। একথা শুনে নিশ্চিত হয়ে চলে গেলো করমচাঁদ। উকিল বন্ধুর পরামর্শে ঐ গয়না বাঁধা দিলেন অমরবাবু বাগবাজারের এক সুদখোর ব্রাহ্মণের কাছে, ১৮০০ টাকার বিনিময়ে। দুশো টাকা হাতে রেখে বাকি ষোলো শ টাকা ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা দিলেন। এই পর্যন্ত উকিলবাবুর পরিকল্পনা ঠিকই ছিল। ঐ টাকা হাতে নিয়ে দুই বন্ধুতে হোটেলে গিয়ে পানভোজন করলেন। তারপর উকিল বন্ধুর প্ররোচনায় চলে গেলেন তারাসুন্দরীর বাড়ি। আবার দেখা হলো। আবার ব্র্যাণ্ডির আয়োজন। উকিল-বন্ধু ওঁদের রেখে চলে গেলেন। এবার পুরোনো প্রেম ঝালিয়ে নেবার পালা হলো শুরু। এক পাত্র মদ্য পান করে অমরবাবু বিছানায় ঢলে পড়লেন। ঘুমে একেবারে অচৈতন্য। ওদিকে পরদিন কী হলো জানো? সেই সুদখোর বামুন? সে গয়নাগুলো যাচাই করতে বড় বাজার গেল। গেল কার কাছে? না, সেই করমচাঁদ জহুরীরই কাছে। সে তো জড়োয়া গয়নাগুলো দেখেই চিনতে পারলো। জিজ্ঞাসা করলো কোথায় পেলে? লোকটা অমরবাবুর নাম করলো। করমচাঁদ আর অপেক্ষা করলো না। চলে গেল পুলিশ-কোর্টে উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে। কেস করা যায় কি? উকিল বললে, 'বিল'-এর কথা একদম চেপে যাও যদি তাহলে কেস করা যায়। তুমি শুধু বলবে, গয়নাগুলো তুমি অমরবাবুকে দেখতে দিয়েছিলে, অমরবাবু সেগুলো নিয়ে বাঁধা দিয়েছেন। ব্যস! করমচাঁদ থানায় গিয়ে নালিশ করলো। অমরবাবু তখন সবে মাত্র তারার বাড়ি থেকে ফিরে নিজের বাড়িতে, নিজের ঘরে পা রেখেছেন, এমন সময় পুলিশ এলো, ওঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলে গেল। কিন্তু ঘটনা আরও জটিল। অমরবাবুর সেই আত্মীয়ের লায়েক পুত্রটি হীরাবাঈ বলে একজনের বাড়ি যেতো। এখন তার ঝোঁক চাপলো তারাসুন্দরীকে চাই। হীরাবাঈয়ের বাড়িতে একটা বড়ো ভোজের বন্দোবস্ত করলো সে। সেখানে হীরাবাঈকে দিয়ে নেমন্তন্ন করে আনালো তারাসুন্দরীকে। টাকার বদলে গানবাজনা। কায়দা করে খুব মদটদ খাওয়ানো হলো তারাকে। তারার

আর হুঁস ছিল না। এই অবস্থায়, তোমাকে কী বলবো, তারাকে নিয়ে বেলেল্লাপনা করতে তার একটুও বাধলো না! সকালে উঠে তারা সব বুঝতে পারলো। মুখে কিছু বললো না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, এর শোধ আমাকে তুলতেই হবে!

এইখানে বিনোদিনী একটু বাধা দিলো, বললে,—এসব কি সত্যিই ঘটেছিল?

রাঙাবাবু বললেন,—ঘটনার থেকে রটনা একটু বেশি হয়। সেটা হতেও পারে, তবে আমি যা শুনেছি তা-ই বলছি। এই সব ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে উঠে অভিনেত্রী হওয়া অত সহজ কথা নয়! যাইহোক, এবার হেমনলিনীর কথা শোনো। স্বামীকে পুলিশে নিয়ে গেছে শুনে তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। শাশুড়ির কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন। শাশুড়িও কাঁদলেন। কাঁদতে কাঁদতে গেলেন বড় ছেলের কাছে। তিনি সবই শুনেছিলেন। ছয় হাজার টাকার ব্যাপার! সোজা কথা নয়! ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলেন। গেলেন তাঁর এটর্নীর বাড়ি। এটর্নী থানায় গিয়ে একটা আলাদা ঘরে অমরবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর প্রস্তাব হলো এই: টাকার জোগাড় করতে হলে তোমাকে এই মর্মে লেখাপড়া করে দিতে হবে যে, তোমার মাতার মৃত্যু হবার পর তুমি যে সম্পত্তির অধিকারী হবে, তার স্বত্ব তুমি তোমার বড়দাদাকে বিক্রয় কওলা লিখে দিচ্ছো। তাতে করমচাঁদের দেনা শোধ হয়েও তোমার হাতে চার হাজার টাকা থাকবে। অমরবাবু রাজী না হয়ে করবেন কী? রাজী হলেন। আর এই চার হাজার টাকা হাতে নিয়ে আবার বাড়ি ছাড়লেন।

—তারপর?

এই তারপরের উত্তর ঠিক সেই মুহূর্তে দিতে পারেন নি রাঙাবাবু। অমরেন্দ্র দত্ত তখন তাঁদের পৈতৃক বাগানবাড়ির কাছে বাগমারী রোডের ওপরই আর একটি বাগানবাড়ি ভাড়া নিয়ে বাস করছিলেন। তখন তিনি একটি থিয়েটার খুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। রাঙাবাবু তখন কন্যাটিকে স্কুলে ভর্তি করতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু নটির কন্যা বলে কোনো স্কুলেই তাকে গ্রহণ করা হলো না। এ নিয়ে গিরিশবাবুর সঙ্গেও তিনি পরামর্শ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর চেষ্টাতেও কোনো পথ পাওয়া গেল না। অগত্যা রাঙাবাবু ঠিক করলেন, মেয়েকে তিনি বাড়িতে মাস্টার রেখেই পড়াবেন, আর কারুর তোয়াক্কা রাখবেন না। কিন্তু বিনোদিনীর একান্ত ইচ্ছা ছিল তার 'কালো' বা শকুন্তলা কোনো স্কুলে পড়ে। বড়ো আদরের তার এই কন্যা। ওকেও নিয়ে কবিতা লিখেছিল বিনোদিনী,—

'বল দেখি এত সুধা কোথা তুমি পাও !
ক্ষুদ্র হৃদয় খানি সুধারসে পূর্ণ জানি
দুঃখিনী মায়েরে কত যতনে বিলাও।
আমি কেন যেবা চায় তারে তুমি দাও !'

কিন্তু ওকে কেউ স্কুলে স্থান দিলো না। মেয়ের প্রায় আট বছর বয়স হলো। এই সময়ে অমরেন্দ্রনাথ অক্লান্ত চেষ্টায় এবং একক চেষ্টায় 'এমারেল্ড থিয়েটার' বাড়ি লিজ নিয়ে 'ক্লাসিক' নাম দিয়ে থিয়েটার খুললেন। তখন অমরবাবু মাত্র একুশ বছর বয়সের যুবক মাত্র। ১৮৯৭-এর ১৬ই এপ্রিল তারিখে 'বেল্লিক বাজার' নামক নক্সাটি সহ গিরিশবাবুরই 'নল-দময়ন্তী' দিয়ে ক্লাসিকের দ্বারোদঘাটন হলো। দলে তিনি তখন এনেছিলেন মহেন্দ্রলাল বসুকে। সঙ্গে ছিলেন অঘোরনাথ পাঠক আর স্টেজম্যানেজার হিসাবে ধর্মদাস সুর। মেয়েদের মধ্যে তারাসুন্দরী অবশ্যই ছিল। বিজ্ঞাপনে তাকে উল্লেখ করা হলো 'Star of the Star Theatre' হিসাবে। আর একজনকে আনা হলো মিনার্ভা থেকে। তিনি কুসুমকুমারী—তাকে আখ্যা দেওয়া হলো 'The Jewel of the Minerva Theatre.'-নল সাজলেন অমরেন্দ্রনাথ নিজে, দময়ন্তী—তারা সুন্দরী, কলি—অঘোরনাথ পাঠক। তারাসুন্দরী ইতিমধ্যে অল্প কয়েকদিনের জন্য সিটি থিয়েটারের হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরাণী' তে 'দেবী'র ভূমিকা অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছিল। যাইহোক, ক্লাসিকে পরদিন (১৭ই এপ্রিল) অভিনীত হলো পলাশীর যুদ্ধ ও লক্ষ্মণবর্জন। ১৮ই এপ্রিল দক্ষযজ্ঞ ও বেল্লিক বাজার। দক্ষযজ্ঞে তারাসুন্দরী সতী, কুসুমকুমারী—তপস্বিনী. অমরেন্দ্রনাথ—মহাদেব, অঘোরনাথ পাঠক—দক্ষ। এর পরে তরুবালা, তারপরে ১লা মে গিরিশচন্দ্রের হারানিধি। এতে অঘোর—অমরেন্দ্রনাথ হরিশ—মহেন্দ্রলাল বসু, সুশীলা—তারাসুন্দরী, কাদম্বিনী—কুসুমকুমারী। কুসুমকুমারীর জন্ম ১৮৭৬ সালে। তারার থেকে তিনবছরের বড়ো. অমরেন্দ্রনাথের সমবয়সী। এই সময় বিল্বমঙ্গলও মঞ্চস্থ হয় (২২শে মে)। নামভূমিকায়—অমরেন্দ্রনাথ, তারাসুন্দরী—চিন্তামণি। ২৯মে হলো অমরেন্দ্র নাট্যান্বিত 'দেবী চৌধুরাণী'। এতে ব্রজেশ্বর—অমরেন্দ্রনাথ, দেবী—তারাসুন্দরী, নিশি—কুসুমকুমারী. সাগর বৌ—নয়নতারা। এরপরে ঐ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দেই ২১শে জুন খোলা হলো নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী রচিত সেক্সপিয়রের হ্যামলেট অবলম্বনে 'হরিরাজ।' নামভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ। বিখ্যাত অভিনেত্রী ছোটরাণী এসে করলেন 'শ্রীলেখা'র ভূমিকা, তারাসুন্দরী—অরুণা। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, —'শ্রীমতী ছোটরাণী শ্রীলেখার ভূমিকা অভিনয় করিতেছিল। সহসা একদিন অভিনয়ের মাত্র দু দিন পূর্বে, সে ক্লাসিক থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করে। তখন

বাধ্য হইয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে এই ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীলেখার ভূমিকার অভিনয় শ্রীমতী তারাসুন্দরীর এক অদ্ভুত কীর্তি।' তারপরে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' (২৪ জুলাই) ও ৪ই সেপ্টেম্বর গিরিশবাবুর পূর্ণচন্দ্র। এ দুটি বইতে সম্ভবত তারাসুন্দরীর কোনো ভূমিকা ছিল না। রমাপতি দত্ত (হরীন্দ্রনাথ দত্ত) লিখেছেন, 'অমরেন্দ্রনাথের সহিত মনোমালিন্য বশত তারাসুন্দরী ক্লাসিক ছাড়িয়া স্টারে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে গেলেন অঘোরনাথ পাঠক।'

এই যে মনোমালিন্য, এর কথা কেউই খুলে লেখেন নি, তবে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। অথবা সেকালের লোকের মুখে মুখে ছিল এসব কথা। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, 'একটি অতিসামান্য কারণে শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সহিত অমরেন্দ্রনাথের মন-কষাকষি আরম্ভ হয়। শ্রীমতী তারাসুন্দরী ক্লাসিকের সংস্রব অবিলম্বে পরিত্যাগ করে।'

এই 'অতি সামান্য কারণ' আর কিছুই নয়, ইদানীং অমরেন্দ্রনাথ কুসুমে কুমারীর প্রতি কিছু পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করছিলেন। এবং এই পক্ষপাতিত্ব ক্রমশ আরও ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়াতে থাকে, যা তারাসুন্দরী সহ্য করতে পারে নি। মুখ ফুটে সে ঝগড়া করে নি বটে, কিন্তু কোনো একটি 'সামান্য কারণ' কে উপলক্ষ্য করে তার অন্তর্বেদনা উত্তাল হয়ে উঠেছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। সেদিন বিনোদিনীকে রাঙাবাবু এই সব কথা বলেছিলেন বলে মনে হয়। রাঙাবাবু বলেছিলেন,—তারাসুন্দরী অমরবাবুকে সত্যিই ভালোবেসেছিল সেদিন তার মনে তাই লেগেছিল প্রচণ্ড আঘাত। কষ্টহারিণী ঘাটের সেই গঙ্গাজল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা মনে পড়ে? একথা অমরবাবুকে সেদিন সে মনে করিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু বোধহয় তীব্র অভিমান বশেই সে তা করে নি। তাই না?

বিনোদিনী চুপ করে থাকে। বিনোদিনীর ফেলে-আসা জীবনের সব কথাই কি রাঙাবাবু জানে? জানে না। এমন ভদ্রমন, সে-সব নিয়ে কখনো আলোচনা করে নি। কিন্তু কোনো কোনো ঘুম-না-আসা রাত্রে সেই সব দিনকার স্মৃতি কি তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে না? তাই সে লিখেছিল—

'স্মৃতি লো বিষের জ্বালা দিও নাকো আর!
এ সংসারে চিরদিন কিছুই না রয়;
তবে কেন দুঃখ তুমি দাও অনিবার—
তুমি মনে হলে প্রাণে জ্বালা অতিশয়!'

ইতিমধ্যে তার প্রথম কবিতার বই 'বাসনা' বেরিয়ে গিয়েছিল। গিরিশবাবুকে এক কপি নিজে গিয়ে দিয়ে এসেছিলেন রাঙাবাবু। দিয়ে এসেছিলেন

বিনোদিনীর মাকে। দিদিমা তখন আর ইহজগতে ছিলেন না। থাকলে ছোট্ট, আদরের পুটি বই লিখেছে, দেখে আনন্দে-বিস্ময়ে বোধহয় কেঁদেই ফেলতেন তিনি! বিনোদিনী বইখানা উৎসর্গ করেছিল তার মাকে। লিখেছিল—

'মাগো মা জননি! তব প্রণমি চরণে—
কী লেখেছি মাতা তুমি বুঝে দেখ মনে।'

কিন্তু বিনোদিনী নিজের কথা তেমন ভাবতে চায় না, সে শুনতে চায় অন্যতর বিনোদিনীদের কথা। তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে বোধহয় নিজেকে মাঝে মাঝে মিলিয়ে দেখতে চায়।

ক্লাসিক যখন রংগজগত-মহলের শীর্ষে, তখন একটি ঘটনা ঘটে। হরীন্দ্রনাথ দত্ত মশাইয়ের বই থেকে একটু তুলে দেই ঃ—'এই সময়ে একদিন বসুমতীতে সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখিত 'ফটিকজল'-এর বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রকাশিত হয়। অমরেন্দ্রনাথ তাহার জবাবে হ্যাণ্ডবিলে লেখকের বিষয়ে বেশ একটু কটু মন্তব্য করিয়া লেখেন। তাহা পাঠে ভয়ঙ্কর ক্ষেপিয়া গিয়া হরিসাধনবাবু ও তাঁহার দুইজন বন্ধু (সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমর নাথ মুখোপাধ্যায়) মিলিয়া অমরেন্দ্রনাথকে খুব গালিগালাজ করিয়া একটি পদ্য লেখেন।…'এখন ট্যাঁপা-লুসী কুত্তা নিয়ে কাটাও দু-দশ রাত। ভয় কি তোমার শেষ দশাতে আছে ভায়ের ভাত।'

বলা বাহুল্য, 'ট্যাঁপা' বোধহয় তারাসুন্দরীরই ডাকনামের অপভ্রংশ, আর 'লুসী', অর্থাৎ 'কুসী',—কুসুমকুমারী। হরীন্দ্রনাথ (ছদ্মনাম রমাপতি দত্ত) লিখেছেন, পাছে অমরেন্দ্রনাথ লেখকের পরিচয় জানিতে পারেন, এই ভয়ে নবদ্বীপ হইতে কবিতাটি ছাপাইয়া আনিয়া তাহা থিয়েটারে বিতরণ করা হয়। বলা বাহুল্য মুদ্রিত কবিতায় লেখকের কোনো নামগন্ধ বা ছাপাখানার কোনো উল্লেখ ছিল না।…তিনি (অমরেন্দ্রনাথ) লেখকের বহু অনুসন্ধান করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়া শেষে ৩১ শে অক্টোবরের থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে লেখেন,— Go on Tommy! Once, twice, thrice and so forthwith your blatant anonymous weapon!'

কিন্তু এসব যাই হোক, তারাসুন্দরীর প্রস্থানের পর কুসুমকুমারীও অমরেন্দ্রনাথকে নিয়ে লোকের কানাকানির অন্ত ছিল না। হরীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'শনিবার ২০শে নভেম্বর (১৮৯৭) নূতন সাজে, নূতন ধাঁচে আলিবাবার প্রথম অভিনয় হইল।' ভূমিকালিপিও তিনি দিয়েছেন। কাসিম হরিভূষণ ভট্টাচার্য, আলিবাবা—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হুসেন—অমরেন্দ্রনাথ, আবদালা—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, মুস্তাফা—অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী, দস্যুসর্দার—অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সাকিনা—ভূষণকুমারী, ফাতিমা—রাণীসুন্দরী, মর্জিনা—

কুসুমকুমারী। উনি লিখেছেন, 'এই গীতিনাট্যের অভিনয় হইতে ক্লাসিক থিয়েটারের তথা অমরেন্দ্রনাথের ভাগ্য পরিবর্তন হইয়া গেল। এক আলিবাবা হইতে তিনি লক্ষাধিক মুদ্রায় লাভবান হইলেন। তাহাছাড়া হুসেনের অংশে তিনি যে ছবি দেখাইলেন, তা অকল্পনীয়। 'আলিবাবা'র নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। এর আগে তাঁর 'ফুলশয্যা' (১৮৯৪ সালে) অভিনীত হয়েছিল এমারেল্ড।' আলিবাবা তাঁর দ্বিতীয় উদ্যম। শোনা যায় তিনি প্রথমে বইখানি স্টার থিয়েটারে অভিনয়ার্থে আনেন, কিন্তু স্টারের তৎকালীন ম্যানেজার অমৃতলাল বসু পাঠান্তে বইখানি অভিনয়ের অযোগ্য বলিয়া ক্ষীরোদবাবুকে ফেরৎ দেন। তাহার পর বইখানি অমরেন্দ্রনাথের হাতে পড়ে।' তিনি কিছু অদলবদল করে কয়েকটি গান লিখে পাণ্ডুলিপি গিরিশবাবুকে দেখিয়েছিলেন। তিনিও কিছু সংশোধন করলেন আর প্রস্তাবনার গানখানি (বাজে কাজে মিনসেকে আর যেতে দেবো না) লিখে দিয়েছিলেন। এই বই তখনকার দিনের অভিনয় জগতের বিক্রির দিক দিয়ে, অভিনয়ের দিক দিয়ে, পোষাক-পরিচ্ছদ আর সেট-সেটিং এর দিক দিয়ে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। এতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু আর কুসুমকুমারী খ্যাতির একেবারে শীর্ষে উঠে যান বলা চলে, বিশেষ করে কুসুমকুমারী। নাচে, গানে, অভিনয়ে,—এ ভূমিকায় তিনি ছিলেন সত্যিই অতুলনীয়া। অপরেশ মুখোপাধ্যায় এই নাটকের জনপ্রিয়তা-বিষয়ে লিখে গেছেন,—ক্লাসিকে যখন বাদুড় ঝোলে, স্টারের বেঞ্চ তখন শূন্য! স্টারের এই অবস্থার পরিবর্তন হয় প্রতাপাদিত্য খোলার পর। গিরিশচন্দ্র এ সময়ে এক থিয়েটারে স্থায়ী হইতে পারেন নাই; তিনি কখনো মিনার্ভায়, কখনো স্টারে, কখনো ক্লাসিকে—এই রূপ ভাবেই দিন কাটাইতেছিলেন।......হ্যাণ্ডবিল লেখার ভঙ্গিও বদলাইল। গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের সরস ও সংযত ভাষার পরিবর্তে—হৈ-হৈ রৈ রৈ ব্যাপার, নাট্যজগত স্তম্ভিত!···ষোড়শী রূপসীর যৌবন তরঙ্গে সন্তরণ —ইত্যাদি ঘটোৎকচী ভাষায় বাজার সরগরম হইয়া উঠিল।'

কিন্তু তা সে 'ঘটোৎকচী'—ভাষাই হোক আর যাই হোক থিয়েটার কিন্তু জমিয়ে দিলেন অমরেন্দ্রনাথ। আর তাছাড়া, থিয়েটার-পরিচালনায় অনেক নতুনত্ব আনলেন তিনি, শিল্পীদের মাইনেও দিলেন অনেক বাড়িয়ে। 'আলিবাবা' সগৌরবে চলতে লাগলো, বড়দিনের আসরে অমরেন্দ্রনাথ নিজের লেখা একটি 'পঞ্চরং—'কাজের খতম' মঞ্চস্থ করলেন। এরপরে এলো ১৮৯৮ সাল। ৮ই জানুয়ারি অমর বাবু করলেন পুরানো নাটক পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস—নিজে সাজলেন 'বৃহন্নলা'। তারপরে করলেন আর একটি পুরানো নাটক 'ধ্রুবচরিত্র।' এই সময় মিনার্ভা উঠে গেল, ফেব্রুয়ারিতে অমরবাবুর পুরানো

বন্ধু চুনিলাল দেব মিনার্ভা থেকে এসে যোগ দিলেন ক্লাসিকে। দোলের দিনে অমরবাবু নিজের লেখা 'দোললীলা' খুললেন। এতে নতুন একটি মেয়েকে দেখা গেল, তার নাম নীরদাসুন্দরী। মাত্র ন'বছর বয়স। বিনোদিনীর মেয়ে কালো বা শকুন্তলার থেকে মাত্র দু-বছরের বড়ো। নীরদার জন্ম ১৮৮৯ সালে উত্তর কলকাতার এক কুখ্যাত বস্তিতে। এই বস্তিতেই মেয়েকে নিয়ে ওর মা তরঙ্গিনী থাকতো। এই তরঙ্গিনীকে কুসুমকুমারী ডাকতো দিদিমা বলে। তা এই দিদিমা একদিন ধরলো কুসুমকুমারীকে। বললে, পরের বাড়িতে ঝি-গিরি করে পেট চালাই, মেয়েটাকে পালতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি ওকে নাও না দিদি। তোমার কাছে বাবুকে বলে থিয়েটার শেখাও।

কুসুমকুমারী বললে—দিদিমা, তুমি ওর বিয়ে দিয়েছিলে না?

—আমাদের ঘরে আবার বিয়ে!—তরঙ্গিনী বললেন—নিয়মমাফিক তো একটি দিতেই হয়। ওর পাঁচবছরে দিয়েছিলুম বিয়ে। বিয়ে যে কী, তা বোঝবার মতো বয়সই ওর হয়নি। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ওকে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু অত বাচ্চা মেয়েকে মা হয়ে পাঠাই কী করে? আমিও পাঠাইনি, তারাও আর খোঁজ খবর নেয় নি।

কুসুমকুমারী আর দ্বিরুক্তি করে নি। মেয়েটিকে নিয়ে এসে রেখেছিলো নিজের কাছে। কুসুমকুমারী তখন থাকতেন অমরবাবুর কাছে তাঁরই বাগমারী রোডের বাগান বাড়িতে। অমরবাবুর মনটা ছিল নরম, তিনি কুসুমকুমারীর কাছ থেকে সব শুনে ওকে রাখলেন নিজেদের কাছে। আর মাসিক দশটাকা করে তরঙ্গিনীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। অমরবাবু ও কুসুমকুমারী থিয়েটারে আসতেন গাড়ি করে, আর সেই গাড়িতে থাকতো সবসময় ঐ ছোট্ট মেয়ে নীরদাসুন্দরী। নাচ, গান, অভিনয় শিখতে লাগলো সে। তার পড়াশোনার দিকে ঝোঁকও ছিল। সেটা লক্ষ্য করে ওঁরা ওর লেখাপড়া শেখারও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তখনকার লোকেদের অনেকেরই ধারণা ছিল, নীরদা বুঝি কুসুমকুমারীরই মেয়ে। 'দোললীলা'তে সখী সাজতো নীরদা। এই সময় অমরেন্দ্রনাথের আর এক কীর্তি থিয়েটারের সঙ্গে 'বায়োস্কোপ'-এর প্রবর্তন হীরালাল সেন বলে এক ভদ্রলোকের সহযোগিতায়। ১৮৯৮-এর ৪ঠা এপ্রিল রবিবার দেখানো হলো স্টেজে প্রথম বায়োস্কোপ 'আলিবাবা'র সঙ্গে। এই সালের মার্চের গোড়ায় কলকাতায় প্লেগ দেখা দেয় মহামারী রূপে। কলকাতা থেকে দলে দলে লোক পালাতে আরম্ভ করে। এর কিছুদিন আগে গিরিশবাবুর সঙ্গে স্টারের 'মন-কষা-কষি' শুরু হয়েছিল। তাঁর 'কালাপাহাড়' আর 'মায়াবসান' চললো না। স্টারের কর্তাদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে গিরিশবাবু স্টার ছেড়ে দেন, আর ক্লাসিক থেকে দু-একজন অভিনেতা-অভিনেত্রী ভাঙিয়ে

নিয়ে নতুন দল করে চলে গেলেন একেবারে রামপুর-বোয়ালিয়া—সেখানে নতুন থিয়েটার খোলার আমন্ত্রণ পেয়ে। প্লেগের ভয়ে ষ্টার প্রায় দেড় মাস অভিনয় স্থগিত রেখেছিল, কিন্তু ক্লাসিকের দরজা বন্ধ হয়নি, অমরবাবু ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর 'ক্লাসিক।' রামপুর-বোয়ালিয়া থেকে গিরিশবাবু ফিরে আসা মাত্রই তাঁকে সসম্মানে নাট্যকার ও শিক্ষক রূপে ক্লাসিকে নিয়ে এলেন অমরবাবু। গিরিশবাবুর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ঘোষও (দানীবাবু) যোগ দিলেন। হরীন্দ্রনাথ দত্ত (রমাপতি দত্ত) লিখেছেন, 'গিরিশচন্দ্র আসিলে তিনি স্থির করিলেন যে, প্রসিদ্ধ নাটকগুলির পুনরভিনয় করিবেন। কিন্তু তারাসুন্দরী চলিয়া যাইবার পর ক্লাসিকে নায়িকার উপযুক্ত অভিনেত্রীর অভাব। কুসুমকুমারীকে দিয়া তিনি বেশির ভাগ কাজ চালাইয়া লইতেন বটে, কিন্তু তখন কুসুমকুমারীর গীতিনাট্যে খুবই সুনাম। তাহা ছাড়া একা একজন কতদিক সামলাইতে পারে! সে সময় তিনকড়ি ও প্রমদাসুন্দরী উভয়ে থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া বাড়িতে বসিয়া ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের পূর্ব বেতন বর্ধিত করিয়া দিয়া উভয়কেই নিজের থিয়েটারে আনিলেন। ধরিলেন 'মেঘনাদবধ',—অমরবাবু নিজে সাজিলেন মেঘনাদ, গিরিশবাবু—রাম, মহেন্দ্রলাল বসু—লক্ষ্মণ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য—রাবণ, প্রমদাসুন্দরী—প্রমীলা, পান্নারানী—নৃমুণ্ডমালিনী। কিন্তু 'মেঘনাদ বধ' চলতে চলতেই কী হলো, মহেন্দ্রবাবু হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে মিনার্ভায় গিয়ে অর্ধেন্দুবাবুর সঙ্গে মিলে অভিনয় করতে লাগলেন। তাঁর জায়গায় 'লক্ষ্মণ' রূপে দেখা দিলেন দানীবাবু। আর তার পরে ধরলেন মুকুল-মুঞ্জরা (৩০ জুলাই ১৮৯৮) অমরবাবু সাজলেন বরুণচাঁদ। দানীবাবু—মুকুল চুনিলাল দেব—চন্দ্রধবজ, তিনকড়ি-তারা, সুকুমারী-মুঞ্জরা। তারপরে ২৭শে আগষ্ট ধরলেন 'প্রফুল্ল'। যোগেশ অবশ্যই গিরিশবাবু, সুরেশ-দানীবাবু, রমেশ—চুণি লাল দেব (পরে হরিভূষণ ভট্টাচার্য), ভজহরি—অমরেন্দ্রনাথ। ইণ্ডিয়ান মিরার-এর মতে গিরিশবাবুর পরেই অভিনয়ে নাম করতে হয় অমরবাবুর। ভজহরি-রূপে তিনি অসামান্য যশ অর্জন করেছিলেন। মেয়েদের মধ্যে উমাসুন্দরী—গুলফন হরি, জ্ঞানদা—তিনকড়ি, প্রফুল্ল—কুসুমকুমারী, জগমণি—জগত্তারিণী। ২৩ শে সেপ্টেম্বর অমরেন্দ্রনাথ নাট্যায়িত বঙ্কিমচন্দ্রর 'ইন্দিরা'-র অভিনয় হলো। নাম ভূমিকায়—কুসুমকুমারী, সুভাষিণী—রাণীসুন্দরী, উপেন্দ্র—অমরেন্দ্রনাথ, কালুসর্দার—চুণিলাল দেব, ইত্যাদি। এরপরে ক্লাসিকে অভিনীত হলো বড় দিনের আসরে (২৫ শে ডিসেম্বর ১৮৯৮) অমরবাবুর নতুন গীতিনাট্য 'নির্মলা।' এতে কুষ্মাণ্ড সাজলেন দানীবাবু, কিশোর- অমরবাবু, নির্মলা—প্রমদা

সুন্দরী, শ্রীকৃষ্ণ—কুসুমকুমারী, রাধা - রাণীসুন্দরী, জটিলের মা—গুলফন হরি, আর বাঁশরীর ভূমিকায় নামলো সেই ছোট্টমেয়ে—নীরদাসুন্দরী।

এই সময়ে আর এক বিভ্রাট বাঁধে। অর্ধেন্দুবাবু আর মহেন্দ্রলাল বসু থিয়েটার জমাতে না পারায় মিনার্ভা বন্ধ হয়ে গেল। নতুন লেসী হলেন এইচ-এল-মল্লিক নামে এক ভদ্রলোক। চুনিবাবু বন্ধুকে ছেড়ে হঠাৎ-ই চলে গেলেন ওখানে সহকারী ম্যানেজার হয়ে। তাঁরা গিরিশবাবুকেও নিয়ে গেলেন ম্যানেজার করে। হরীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'নির্মলার প্রথম অভিনয়-রজনীর দিন, গিরিশচন্দ্র ২/৪ জন অভিনেতা-অভিনেত্রী লইয়া ক্লাসিক থিয়েটার ছাড়িয়া চলিয়া যান।' মহেন্দ্রলাল বসু আবার ফিরে আসেন ক্লাসিকে। 'নির্মলা' চলেছিল ভালো। ১৮৯৯ তে অমরবাবু খুললেন 'প্রফুল্ল' মিনার্ভার দেখাদেখি। ১১ই মার্চ (১৮৯৯) প্রফুল্ল দিয়েই মিনার্ভা আবার দ্বারোদ্‌ঘাটন করেছিল। গিরিশবাবুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অমরবাবু সাজলেন 'যোগেশ।' ২৫ শে মার্চ ক্লাসিকে হলো রামকৃষ্ণ রায়ের 'সিন্ধুবধ।' দশরথ—অমরবাবু, সিন্ধু—কুসুমকুমারী। সিন্ধুর গানগুলি দর্শকদের খুবই ভালো লেগেছিল। ওদিকে 'এক পক্ষের মধ্যেই গিরিশচন্দ্রের মিনার্ভার অভিনয়লীলা শেষ হইয়া গেল। মিনার্ভার কঙ্কালে প্রাণ সঞ্চারে অসমর্থ হইয়া তিনি মার্চের শেষে আবার ক্লাসিকে ফিরিয়া আসিলেন।' এবার সর্ত হলো বছরে অন্তত চারটি নাটক গিরিশবাবুকে লিখে দিতে হবে। সে-অনুসারে তিনি 'দেলদার' লিখতে লাগলেন। ইতিমধ্যে অমরবাবু ধরলেন গিরিশবাবুর 'জনা' (২৯ শে এপ্রিল ১৮৯৯) নামভূমিকায়—তিনকড়ি। অমরেন্দ্রনাথ 'প্রবীর' ও কুসুমকুমারী—মদন-মঞ্জরী। গিরিশবাবু—বিদূষক। ২০শে জুন হলো 'দেলদার।' এতে দানীবাবু সাজলেন সরল, অমরেন্দ্রনাথ—গহন, নামভূমিকায়—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, পিয়াসা—কুসুমকুমারী। এর মধ্যে 'করমেতিবাঈ'-ও ধরা হয়েছিল। তখন আবার তিনকড়ি ছিল না। করমেতিবাঈ সাজলো কুসুমকুমারী। এরপরে ২৬শে আগষ্ট মঞ্চস্থ হলো অমরেন্দ্রনাথের নতুন গীতিনাট্য—শ্রীকৃষ্ণ। নামভূমিকায় কুসুমকুমারী। রাধিকা—ভূষণকুমারী, কুটিলা—গুলফনহরি। হরীন্দ্রনাথ দত্তের মতে 'আলিবাবার পর এমন জমজমাট কোনো অপেরা ক্লাসিকে আর অভিনীত হয় নাই।' রাধিকার রূপে ভূষণকুমারীর দুখানি গান দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল, 'কাঁহা জীবনধন, বৃন্দাবন প্রাণ, কাঁহা মেরি হৃদয়াক রাজা',-ও 'নিপট কপট তুঁহু শ্যাম।'

এই সময় স্টারে চলছে নতুন নাটক মৃচ্ছকটিক, বসন্তসেনা নাম দিয়ে। বেঙ্গলে 'বভ্রুবাহন'। মিনার্ভায় মদালসা। তবু ক্লাসিক জনপ্রিয়তায় সবাইকে ছাড়িয়ে

গেল। 'শ্রীকৃষ্ণ' ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট বই। তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হতো অন্য বই। 'সীতার বনবাস' (৯ই সেপ্টেম্বর)-এ দেখি,—সীতা—তিনকড়ি, রাম—গিরিশবাবু, লক্ষ্মণ—অমরবাবু। কিন্তু ১৬ই সেপ্টেম্বর অমরেন্দ্রনাথ নাট্যায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'ভ্রমর' নাম দিয়ে অভিনীত হলো, তার ভূমিকালিপিতে তিনকড়ির নাম নেই। 'ভ্রমর'—কুসুমকুমারী রোহিনী সাজতো প্রমদা সুন্দরী। এতে গোবিন্দলাল সেজে ঘোড়ায় চড়ে অমরবাবু স্টেজে আসতেন বলে হ্যাণ্ডবিলে ছবি দিয়ে লেখা হতো 'অশ্বপৃষ্ঠে গোবিন্দলাল।' এতে নিশাচর সাজতেন দানীবাবু। কৃষ্ণকান্ত—মহেন্দ্রলাল বসু। ক্লাসিকে নানান পুরানো নাটক অভিনীত হচ্ছিল, তালিকায় 'ম্যাকবেথ' পর্যন্ত দেখা যায়। অমরেন্দ্রনাথ নিজে সাজেন ম্যাকবেথ, লেডি ম্যাকবেথ—কুসুমকুমারী (পরে তিনকড়ি)। অবশ্য তিনরাত্রি অভিনয় হয়েই ম্যাকবেথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপরে ১৯০০ সালের ১লা জানুয়ারি মঞ্চস্থ হলো অমরেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ নক্সা 'মজা।' হরিহর সাজতেন অমরবাবু নিজে, ফুলকুমারী—কুসুমকুমারী। মোহিনী—প্রমাদাসুন্দরী। গণক—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।

এই সময় বিনোদিনীর মেয়েটির বয়স ন'বছর হয়েছে। বাড়িতেই সে মাস্টারের কাছে পড়ে। রাঙাবাবু যথারীতি তার আড্ডায় যান, মাঝে মাঝে দেখে আসেন থিয়েটার, বিনোদিনীকে সব খবরই এনে দেন। বিনোদিনী অবসর সময়ে কবিতা লেখে। রাঙাবাবু অমরবাবুর ক্লাসিক থিয়েটারের কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে পিছিয়ে যান, বলেন ১৮৯৬ আর ১৮৯৭ সালের স্টারের কথা, যখন গিরিশবাবুর যথাক্রমে 'কালাপাহাড়' আর 'মায়াবসান' অভিনীত হয়েছিল। রাঙাবাবু বলেন, দুটি নাটকই দর্শক নেয়নি, কিন্তু কালাপাহাড়ে দোলেনার রূপে একদিকে নরীসুন্দরীর গান, অন্যদিকে তোমার সই গঙ্গামনীর ধ্রুপদাঙ্গের গান! সে এক শোনবার মতো জিনিস।

বিনোদিনী বলে, গঙ্গামণি আমার সই তো বটেই, বয়সে ঢের ছোট হলেও আমি তার সঙ্গে 'গোলাপফুল' পাতিয়ে ছিলুম, তা সে স্টারেই আছে তাহলে?

রাঙাবাবু বললেন, তিনি তো আছেনই, ফিরে এসেছে তারাসুন্দরী 'মায়াবসান'-এ করছে অন্নপূর্ণা। এখানেও 'রঙ্গিনী'র ভূমিকায় গানে একেবারে মাত করে দিয়েছে নরীসুন্দরী। অথচ দেখো, নাটক দুটি দর্শক নিলো না। গিরিশচন্দ্র স্টার ছাড়লেন ১৮৯৮ সালের মেমাসে। ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (১০ তারিখে) অভিনয় হয়েছিল অমৃতলাল বসুর 'হরিশ্চন্দ্র নাটক'। অমৃত মিত্রের হরিশ্চন্দ্র আর তারাসুন্দরীর শৈব্যা খুব ভালো হয়েছিল।

বিনোদিনী বললে,—তখন মিনার্ভায় কী হচ্ছিল?

রাঙাবাবু বললেন,—চুনীবাবুর পরিচালনায় দুর্গাদাস দে-র লেখা 'জুবিলি বজ্র' ১৮৯৭-এর জুলাই মাস (৩রা জুলাই) খোলা হয়। এতে নতুন একটি মেয়েকে দেখা যায়, যেমন নাকি অভিনয়, তেমনি গান।

—নাম কী?

—সুশীলাবালা।

—গলা খুব ভালো? তুমি শুনেছো?

রাঙাবাবু বললেন,—না, আমি নিজে যাই নি। বন্ধুদের মুখে শুনলাম।

বিনোদিনী চুপ করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলো, তারপরে বললে,—আর একজনের সঙ্গে আমার একবার আলাপ হয়েছিল, তাঁর গানের গলা অদ্ভুত। আমার থেকে বয়েসে বড়ো ছিলেন, প্রায় আট বছরের বড়ো। ঐ যে গ্রেট ন্যাশানাল বেঙ্গলের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে শেষ পর্যন্ত অভিনেত্রী নিতে বাধ্য হয়? তাদের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি, যাদুমনি। কী গানের গলা! আর কী কারুকাজ! শুনেছি ওঁর মা রাজা শৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়িতে কাজ করতেন। ছোট মেয়ে যাদুর গানের গলা দেখে রাজা বাহাদুর ওঁকে বড়ো বড়ো ওস্তাদের কাছে তালিম নেবার ব্যবস্থা করে দেন। এইভাবে গান শিখতে শিখতে তিনি গ্রেট ন্যাশানালে যোগ দেন, 'সতী কি কলঙ্কিনী' নাটকে। তখন তাঁর বয়েস হয়ে ছিল কুড়ি-বাইশ বছর। পরের বছর, বোধহয়, সেটি ১৯৭৫ সাল হবে, তিনি শেষ অভিনয় করলেন 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে। আর অভিনয় করেন নি, গান নিয়েই থাকতেন।

রাঙাবাবু মন দিয়েই শুনছিলেন, বললেন, এবার বুঝতে পেরেছি তুমি কার কথা বলছো। খুব নামডাক। যাদুবাঈ। অনেক রাজারাজড়ার বাড়িতে তাঁর ডাক পড়ে গানের জন্য। গান যেমন, নাচেও নাকি ভালো।

—তা হবে। শিখেছেন হয় তো।

রাঙাবাবু পূর্বেকার জের টেনে বলতে লাগলেন,—তোমার গোলাপসুন্দরী অর্থাৎ সুকুমারী কিন্তু এখনো বেঙ্গলে। প্রহ্লাদ—চরিত্রে 'প্রহ্লাদ' সেজে দারুণ গান নাকি গাইছেন লোকে বলছে। এর আগে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মশায়ের 'প্রতিমা' নাটকেও খুব ভালো অভিনয় করেছেন।

বিনোদিনী একটুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপরে বললো,—ঐ আরেক মেয়ে গোলাপদি। জীবনে কী লড়াইটাই না করলো!

রাঙাবাবু বললেন,—তা করলেন। মেয়ের বিয়েও দিয়েছেন ভালো জায়গায়।

—হ্যাঁ, এখন সে ঝাড়া হাত-পা,—বিনোদিনী বললে,—কালো বড়ো হোক, ওরও খুব ভালো বিয়ে দিতে হবে।

—তা আর বলতে। তবে এখনি ওসব ভেবো না। মাত্র ন' বছরের মেয়ে।

ক্লাসিকে তখন একটু কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল। গিরিশবাবু লাভের বখরা চাইলেন, অমরবাবু দিতে অস্বীকার করলেন, উল্টে বললেন,—ক্লাসিকে আপনি এসেছেন প্রায় বছরখানেক হতে চললো, অথচ এক 'দেলদার' ছাড়া আর বই দেন নি।

কথা হচ্ছিল গিরিশবাবুর বাড়িতে বসেই। অমরবাবু চলে গেলে গিরিশবাবুর তখনকার নিত্য সহচর অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে ডেকে বললেন,—অমরকে বই দেওয়া হয় নি, না? বেশ, কালিকলম নিয়ে বসো, আজই বই লেখা শুরু করবো।'

সেইদিন থেকে শুরু করে পাঁচদিনের মধ্যে পাঁচটি অঙ্ক লিখে ছয় দিনের দিন নাটকটির পাণ্ডুলিপি অমরেন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দিলেন গিরিশবাবু। এই নাটকটিই ওঁর যুগান্তকারী রচনা,—পাণ্ডব গৌরব! এ বইতে 'ভীম'ই নায়ক। গিরিশবাবু দানীবাবুকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু অমরবাবু তা হতে দিলেন না, বললেন,—বেশ, আমিও ভীমের পার্ট বলছি, দানীও বলুক, যার ভালো হবে, সে করবে।

এইভাবে পরীক্ষা দিয়ে পার্টটি গ্রহণ করেছিলেন অমরবাবু। গিরিশবাবুর ইচ্ছা ছিল 'শ্রীকৃষ্ণ'-এর ভূমিকা অমরবাবু করবেন। কিন্তু তা যখন হলো না, তখন 'শ্রীকৃষ্ণ' দানীবাবুরই করা উচিত! দানীবাবু ছিলেন সরল প্রকৃতির মানুষ। তিনি 'কৃষ্ণ' সাজতে অরাজী ছিলেন না, কিন্তু এ-ব্যাপারে গিরিশবাবু মনে মনে ভীষণ চটে গিয়েছিলেন। তিনি দানীবাবুকে ক্লাসিক ছাড়তে উপদেশ দিলেন। সে অনুযায়ী দানীবাবু চলে গেলেন স্টারে। ঐ সময় অর্থাৎ ১৯০০ সাল নাগাদ দানীবাবু গুরুগম্ভীর ভূমিকার খুব উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতেন না, বরং অমৃতলাল বসুর ভাষায়, 'কমিক পার্টেই দানীর বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যায়।' যদিও পরে দানীবাবু গুরুগম্ভীর ভূমিকায় অসাধারণ নৈপুণ্য ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু 'পাণ্ডব-গৌরব'-এর সময় কাল পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতার সে রকম স্ফুরণ হয় নি। গিরিশবাবুর মনোগত ইচ্ছা ছিল, এই বই থেকেই দানীবাবুকে তিনি গুরুগম্ভীর ভূমিকায় তৈরী করে নেবেন। কিন্তু তা সম্ভবপর হলো না। অমরবাবু শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় নামালেন প্রমদাসুন্দরীকে। এই ঘটনার ছয় বৎসর পরে মিনার্ভায় গিরিশবাবু যখন 'পাণ্ডব-গৌরব'-এর পুনরভিনয় করিয়েছিলেন, ততদিনে 'সিরাজউদ্দৌলা'র ভূমিকায় অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে দানীবাবু বিশেষ যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। সেবার তাই অমরবাবুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দানীবাবু 'ভীম'-এর অংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। হরীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'যে গিরিশচন্দ্র এই ভীমের পার্ট পুত্রকে না দেওয়াতে রাগ

করিয়া ক্লাসিক ছাড়িয়া দেন, সেই গিরিশচন্দ্রই একদিন দানীবাবুকে এই অংশে অভিনয় করিতে দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন,—হ্যাঁরে দানী, কাল তুই কী অ্যাক্টো করছিলি—ভীমের, না সিরাজদ্দৌলার ? দানীবাবু অপ্রতিভভাবে উত্তর দেন,—'সব পার্টই কি আর একজনের হয় ?'

'পাণ্ডব-গৌরব'-এর 'ভীম' কিন্তু সত্যিই অমরেন্দ্রনাথের একটি সাফল্য মণ্ডিত ভূমিকা। যেমন গিরিশবাবুর নাটক, তেমন এর অভিনয়। গিরিশবাবু নিজে সেজেছিলেন কঞ্চুকী। অভিনয়ের অসামান্য খ্যাতি শুনে রাঙাবাবু দেখতে গিয়েছিলেন নাটক। বিভিন্ন দৃশ্যে বিভিন্ন রস পরিবেশন করেছিলেন গিরিশচন্দ্র 'কঞ্চুকী' রূপে। তাছাড়া, সুভদ্রার ভূমিকায় তিনকড়ির অভূতপূর্ব অভিনয়! পত্র-পত্রিকাগুলি 'ভীম' ও 'সুভদ্রা'র অভিনয়-সুখ্যাতিতে উচ্ছ্বসিত।

ভীমের সেই বিখ্যাত উক্তি—রাঙাবাবু বাড়ি ফিরে এসে বিনোদিনীকে বললেন, —'না জানি কী গুরু অপরাধে বহু লজ্জা দিয়াছ শ্রীহরি!' কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে তাঁর বাণী,—'অতি ছল অতি খল, অতীব কুটিল, তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল!' এ যেন এখনো কানে বাজছে! চলো না একদিন দেখে আসবে ?

'না'—বলে বিনোদিনী মুখ নামিয়ে অন্য ঘরে খুকুর কাছে চলে যায়।

ক্লাসিকে 'পাণ্ডবগৌরব'-এর প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৯০০ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন,-ভীষ্ম—মহেন্দ্রলাল বসু (পরে দানীবাবুও ফিরে এসে করেছিলেন) ঘেসেড়া—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু। কুন্তী-গুলফন হরি, উর্বশী—কুসুমকুমারী, দণ্ডী—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, ঘেসেড়াণী —লক্ষ্মীমণি, রুক্মিণী—ভূষণকুমারী, দ্রৌপদী—গোলাপসুন্দরী (এ অন্য গোলাপ, সুকুমারী দত্ত নন)। এই নাটকে অভিনয় ছাড়া গানেও তিনকড়ি অসম্ভব সাফল্য অর্জন করেছিল। উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন,— "পাণ্ডবগৌরবে যখন সুভদ্রার বেশে পুত্রবধূটির হস্ত ধরিয়া শ্রীমতী তিনকড়ি প্রথম রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন সকলেরই মনে হইত যেন সত্যই শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাদেবী আসিয়া রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়াছেন। তাহার সেই মহিমাময় দাঁড়াইবার ভঙ্গিমাটুকুই যে কত সুন্দর তাহা যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহাকে লিখিয়া বোঝানো অসম্ভব।' গান সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,—'নিম্নলিখিত গানখানি শ্রীমতী তিনকড়ি এমন বিচিত্র অভিনয় ভঙ্গিমার সহিত এত সুন্দর গাহিত যে দর্শকগণ পুনঃ পুনঃ—ইনকোর দিয়াও পরিতৃপ্ত লাভ করিতে পারিত না।'

গানটির আরম্ভ হলো—থিয়া তাথিয়া নরমালী। ঘোরাননা রক্তদশনা রণাঙ্গনা করালী!' এরপরে ক্লাসিকে গিরিশবাবুর সীতার বনবাসও পুনরভিনীত হয়েছিল। এতে সীতাও চমৎকার করতো তিনকড়ি। বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, 'সেই বনমাঝে একাকিনী পরিত্যক্তা সীতার—চমকে চপলা চমকে প্রাণ চাহ মা

চপলা-হাসিনী—এই গানখানি শ্রীমতী তিনকড়ির মুখে যে শুনিয়াছে সে জীবনে কখনো তাহা ভুলিতে পারিবে না।'

ক্লাসিকে 'বিল্বমঙ্গল'ও আবার অভিনীত হয়েছিল। তিনকড়ি এতে পাগলিনী সেজেছিল। বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, 'শ্রীমতী তিনকড়ি এই ভূমিকা অভিনয় করিয়া একেবারে জ্বালাইয়া দিয়াছে'।

এই ভূমিকা বিনোদিনীর সময়ে গঙ্গামণি করে খুবই নাম করেছিল, কিন্তু বিদ্যাভূষণ যা লিখেছেন, তাতে মনে হয়, সে-অভিনয়কেও ছাড়িয়ে গেছে তিনকড়ি। তিনকড়ি ক্লাসিকে পরে গিরিশবাবুর 'অভিমন্যু-বধ'-এ 'অভিমন্যু'র ভূমিকা করেও দারুণ নাম করেছিল। এরপরে ১৯০২ সালে ক্লাসিকে গিরিশবাবুর নতুন নাটক 'ভ্রান্তি' অভিনীত হয়। এতে অন্নদার জটিল ও সুকঠিন ভূমিকায় তিনকড়ির অভিনয়-প্রতিভার যে স্ফুরণ ঘটেছিল, তা অসামান্য।

কিন্তু পাণ্ডবগৌরবের পর ক্লাসিকের সঙ্গে গিরিশবাবুর মনোমালিন্য ঘটেছিল। ঐ পাণ্ডবগৌরব নিয়েই গিরিশবাবুর ক্ষোভ ছিল। তিনি ক্লাসিক ছাড়বার সুযোগ খুঁজছিলেন। এইখানে সুশীলাবালার কথা একটু আসে। থিয়েটার-জগতে ইনিই 'বড়ো সুশীলা' বলে পরিচিত ছিলেন। কারণ পরে আরও একজন সুশীলা দেখা দিয়েছিল। যাই হোক, বড় সুশীলা বা সুশীলা বালার জন্ম ১৮৮৪ সালে এক অজ্ঞাতকুলশীল ঘরে। ছোটবেলা থেকেই গানের গলা ছিল মিষ্টি, স্কুলেও পড়তো বলে দেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁর 'বাংলার নটনটী' গ্রন্থে জানিয়েছেন। দশ বৎসর পরে আর পড়তে পারে নি অর্থের অভাবে। ১৮৯৭ সালের জুলাইতে 'জুবিলি যজ্ঞ'-এ মিনার্ভায় শিল্পী-রূপে সুশীলার যথার্থ আত্মপ্রকাশ হলেও এর আগে সে কোনো 'প্রাইভেট থিয়েটার'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। আগে ছিল বীণা থিয়েটারের বাড়িতে নবপ্রতিষ্ঠিত গেইটি থিয়েটারে। সেটি উঠে গেলে এখানে আসে। অর্ধেন্দু-শেখর ছিলেন এখানকার নাট্যশিক্ষক। তাঁর হাতে পড়েই সুশীলা অভিনয়ে পারদর্শিনী হয়ে উঠেছিল। এখানে থাকবার সময় সে তিনকড়ির সংস্পর্শে এসেছিল। তিনকড়িই তাকে গিরিশবাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। গিরিশবাবু যখন সদলবলে রামপুর-বোয়ালিয়া যান, তখন সুশীলাকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন বলে দেবনারায়ণবাবু জানিয়েছেন।

যাই হোক, মিনার্ভা থিয়েটারের মালিকানা ১৮৯৯ সালে যাঁর হাতে যায়, তিনি শ্রীপুরের নাবালক জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকার। কালিশ মুখোপাধ্যায় তাঁর বইতে লিখেছেন, 'নরেন্দ্রনাথ সরকার তখনো নাবালক বলে তাঁর আইনজ্ঞ মুখ্য কর্মচারী মহেন্দ্র মিত্রের নামে মিনার্ভা থিয়েটার নীলাম থেকে তিনি ক্রয়

করেন। সুশীলাবালা তখন গিরিশবাবুদের সংগে ক্লাসিকে যোগদান করে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা পায় না। দেবনারায়ণ গুপ্ত লিখেছেন, 'নরেন্দ্রনাথকে অল্প বয়সে থিয়েটারের নেশা যেমন পেয়ে বসেছিল, তেমনি সুশীলাবালার মধুর কণ্ঠের প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সুশীলাবালাকে কাছে পাবারও তাঁর কম আগ্রহ ছিল না। তাই সুশীলাবালাকে প্রধান অভিনেত্রী করে তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়ে এলেন।' দুর্গাদাস দে-র লেখা 'শ্রী'তে নায়িকা হলো সুশীলাবালা। পরের নাটক নরেন্দ্রনাথ সরকারের লেখা 'মদালসা' তেও তাই। ১৯00 সালের ১০ই মার্চ রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবী কংকণ।' এই নাটকে 'জেলেখা'র ভূমিকায় গানে ও অভিনয়ে সুশীলাবালা দারুণ নাম করে। এই নাটকে 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল, সকলি ফুরায়ে যায় মা'—গানটি যখন মঞ্চে সুশীলাবালা গাইতো, তখন দর্শকেরা চোখের জল সামলাতে পারতো না। এ নাটকও রাঙাবাবু দেখে এসেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, বিনোদিনীও যায়। কিন্তু সে কিছুতেই রাজী হলো না। এমনি এক দিনে রাঙাবাবু এসে বিনোদিনীকে বললেন,—খুকুকে নিয়ে চলো, তোমার মা একবার ওকে দেখতে চেয়েছেন।'

—আমার মা!

—হ্যাঁ।

বিনোদিনী খানিকক্ষণ কথা বলতে পারলো না। মা কখনো এবাড়িতে আসেন নি। মাও না, দিদিমাও না। তাঁরা এলে পাছে কোনো কথা ওঠে, তাই কখনো আসতেন না। বাইরে থেকে লোক মারফৎ খবর নিতেন কখনো কখনো। আজ দিদিমা নেই। মা তো আছেন? বহুদিন আগে একবার মাত্র এসেছিলেন মা ও দিদিমা, তা-ও রাঙাবাবুর আগ্রহে। কালো তখন ছ-মাসের মেয়ে, তার মুখে ভাতের দিন, ফটক থেকেই তাকে দেখে তাঁরা আবার চলে গিয়েছিলেন। সেই মা এত বছর পরে কী ভেবে খবর পাঠালেন যে, কালোকে তিনি দেখতে চান? একবার তার ধ্বক্ করে উঠলো ভিতরটা,—মার অসুখ-বিসুখ করে নি তো? নইলে এমন করে, নিজে না এসে দেখতে চাই বলে খবর পাঠাবে কেন? মুহূর্তে কেমন যেন হয়ে গেল বিনোদিনী, ভয়ে কথাটা উচ্চারণ করতে পারলো না, কালোর হাত ধরে ধীরে ধীরে গাড়িতে গিয়ে বসলো, রাঙাবাবুও সঙ্গে সঙ্গে এসে বসলেন।

সেই ওদের পুরোনো বাড়ি। আগে দোতলা ছিল না, ছিল একতলা, তাও গোড়ায় পাকা ঘর ছিল মাত্র একখানা, যাতে গঙ্গামণি এসে উঠেছিল। পরে চেহারা বদলাতে লাগলো, সবটা মিলে হয়ে গেল দোতলা পাকা বাড়ি।

দোতলায় মায়ের সেই ঘরখানা। কত বছর পরে সে আজ এখানে

এসে পা দিলো। কিন্তু চমকে উঠলো বিনোদিনী. তার মা নয়, যেন একটা কঙ্কাল শুয়ে আছে বিছানার ওপরে। মা কালোকে তাঁর কাছে টেনে নিতে বারণ করলেন; দূর থেকে দেখতে লাগলেন। বাকরোধ হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে শুধু গড়িয়ে পড়তে লাগলো জল। ডুকরে উঠলো বিনোদিনী,—মা! একী হয়েছে তোমার! কী করে হলো?

বাড়ির ভাড়াটে বউ-ঝিরা কয়েকজন দাঁড়িয়েছিল। একজন বললে, মুখে গংগা জল দাও, তোমার আর তোমার মেয়ের জন্যই যেন প্রাণটা বেরুচ্ছিল না!

কে যেন তার হাতে জলের ঘটিটা এগিয়ে দিলো. সে মার মুখে জল দিলো তখনো হুঁস দিল, কয়েক ঢোক জল খেলো। গিন্নীমতন একটি মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন. তিনি বললেন,—ডবল নিমোনিয়া। ডাক্তার-বদ্যির কোনো অভাব রাখেন নি তোমার কর্তা! দু-দুজন সাহেব-ডাক্তার এনেছিলেন! দু-দুজন নার্স!

জলভরা চোখ মেলে রাঙাবাবুর দিকে তাকালো বিনোদিনী। এতো কাণ্ড তুমি করেছো. আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দাও নি!

ওদিকে কালো তখন অবাক হয়ে সিঁটিয়ে গেছে। মৃত্যু সে আগে দেখে নি। জ্ঞান হয়ে দেখে নি তার দিদিমাকে। তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে গেলেন রাঙাবাবু। আর তার পরেই কান্নার রোল উঠলো।

রাঙাবাবু দাঁড়িয়ে থেকে সব করালেন। সৎকার থেকে শ্রাদ্ধশান্তি কিছুই বাদ গেল না! তারপরে বাড়িটার একটা বন্দোবস্ত করে ফিরে এলেন নিজের বাড়িতে। চুপ করে বসেছিল বিনোদিনী নিজের 'বাসনা' বইখানি টেবিলের ওপর রেখে। মাকে সে উৎসর্গ করেছিল এই বই। লিখেছিল,— 'ভালমন্দ সমভাব নিকটে তোমার / স্নেহের তুলনা মাতা কিবা আছে আর! জননি! হইলে মাতা এমন কি হয় কিবা / আমার মায়ের মত আর কেহ নয়!'

দিন কাটতে থাকে। মেয়ের পড়াশুনায় খুব ঝোঁক, আবার অল্পসল্প গানও গায়। বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করে,—কীরে! ভালো করে শিখবি? মাস্টার রাখবো?

কালো দুহাত বাড়িয়ে সেই বাচ্চা বয়সের মতোই মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে,—মাস্টার তো আমার ঘরেই আছে। এই যে তুমি?

সুখেদুঃখে এইভাবেই দিন যায়। ওদিকে মিনার্ভায় মাধবীকঙ্কন তেমন পয়সা দিলো না। নরেন্দ্রনাথ সরকার ক্লাসিক থেকে নিয়ে এলেন গিরিশচন্দ্রকে অধ্যক্ষ হিসাবে। ১৯০৩ সালের ২৩ শে জুন গিরিশচন্দ্র-নাট্যায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের

'সীতারাম' মঞ্চস্থ হলো। নামভূমিকায় গিরিশচন্দ্র নিজে, শ্রী—তিনকড়ি, গঙ্গারাম—দানীবাবু, জয়ন্তী—সুশীলাবালা, চাঁদশাল—চুণিলাল দেব। ধাত্রী—হিংগনবালা, রমা—পুঁটুরাণী, ইত্যাদি।

ওঁদের দেখাদেখি ক্লাসিকেও অমরেন্দ্রনাথ খুললেন সীতারাম ৩০ শে জুন তারিখে। অমরেন্দ্রনাথ 'সীতারাম' সেজে অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চে এসে দেখা দিলেন। বিজ্ঞাপনে লিখলেন, (ক্লাসিকের) সীতারাম বলদৃপ্ত যুবা, স্থবির নহে। কিন্তু সে যাই হোক, জয়ন্তীর বেশে অভিনয়ে ও গানে সুশীলাবালা একেবারে মাত করে দিলো। সুপ্রতিষ্ঠ হলো রঙ্গজগতে। সুশীলাবালার একটি গান ছিল, 'উদার অম্বর শূন্য সাগর শূন্যে মিলাও প্রাণ!'—এই গান শুনে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে যেতেন। ১৫ জুলাই আনন্দমঠ অভিনীত হলো, শান্তি সাজলো পুঁটুরাণী। ২২ শে জুলাই গিরিশবাবুর গীতিনাট্য 'মণিহরণ' হলো। ১৫ই আগষ্ট হলো গিরিশবাবুরই 'নন্দদুলাল।' আয়ান—দানীবাবু, বলরাম-পুঁটুরাণী, দেবকী ও শ্রীকৃষ্ণ—তিনকড়ি। রাধিকা—সুশীলাবালা। ২৯ শে আগষ্ট দেবেন্দ্রনাথ বসু—নাট্যায়িত বঙ্কিমচন্দ্রের 'সুবর্ণ গোলক'ও মঞ্চস্থ হয়েছিল। ওদিকে অমরেন্দ্রনাথ করেছিলেন কী, নরেন সরকার, গিরিশচন্দ্র ও তাঁদের সাঙ্গপাঙ্গদের ব্যঙ্গ করে 'থিয়েটার' নামে এক রঙ্গনাট্য লিখে ক্লাসিকে অভিনয় করালেন। এতে খুবই আঘাত পেয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র। মিনার্ভায় নরেন্দ্রনাথ সরকারের লেখা আর একখানি নাটক খোলা হলো ১লা ডিসেম্বরে, 'জেরিনা।' নামভূমিকায় সুশীলাবালা ও অন্বেষণ চরিত্রে—তিনকড়ি। এ-ছাড়া আরও কয়েকটি পুরানো নাটকের অভিনয় হতে লাগলো এখানে। কিন্তু, দেবনারায়ণবাবুর ভাষায়,—'নরেন্দ্রনাথ কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিনার্ভা থিয়েটারের মালিকানা বজায় রাখতে পারলেন না। ১৯০১ সালে দেনার দায়ে নরেন্দ্রনাথ ইন্‌সলভেন্সি ফাইল করলেন। নরেন্দ্রনাথ সুশীলাবালাকে নিয়ে তখন ঘর বেঁধেছেন।'

দেবনারায়ণবাবুর লেখা থেকেই জানা যায়,—ওঁরা তখন থিয়েটার-জগত ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি সংসার জীবনে আত্মনিয়োগ করেছেন। নরেন্দ্রনাথ জমিদার-পুত্র ছিলেন বটে, কিন্তু তখন তিনি সর্বস্বান্ত। সুশীলাবালার তখন প্রচণ্ড খ্যাতি, থিয়েটার—মালিকরা একের পর এক এসে দেখা করতে লাগলেন সুশীলার সংগে। কিন্তু এখানেই এ মেয়েটির চরিত্রের বিশেষত্ব, সে নরেন্দ্রনাথ ছাড়া একা কোনো দলে যেতে কিছুতেই রাজী হলো না। এই ভাবে দু-দুটি বছর সে ও নরেন্দ্রনাথ অভিনয়-জগৎ থেকে দূরে সরে রইলো। দারিদ্র্যের অসহ্য প্রহার সহ্য করেও সুশীলা নরেন্দ্রনাথকে ছেড়ে কোনো থিয়েটারে গেলনা, বা, শূন্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করলো না। নরেন্দ্র তখন ঋণের দায়ে মাথার চুল

পর্যন্ত বিক্রি। সংসার ক্রমে ক্রমে অচল হয়ে পড়লো। হাঁড়ি চড়ে না। তখন বাধ্য হলো সুশীলা অস্থায়ী বা স্বল্পস্থায়ী ইউনিক থিয়েটারে যোগ দিতে। ১৯০৩ সালের ৬ই জুন সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'রত্নমালা'য় সে নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। এতে মন্দারমালা ছিলো, তারাসুন্দরী।

কিন্তু সুশীলাবালার কথা বলতে বলতে আমরা অনেকদূরে এসে পড়েছি। তবুও পুরানো কথায় ফিরে যাবার আগে সুশীলা সম্পর্কে দু একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। এ-ও ওদের জীবনের প্রভূত সংগ্রামের দিক। বারাঙ্গনাকুল থেকে আসা সাধারণ অভিনেত্রী, কিন্তু তার চারিত্রিক দৃঢ়তার কথা শুনলে অবাক হতে হয়। কতো প্রলোভন এসেছে তার জীবনে, কিন্তু সে একটুও টলে নি, নরেন্দ্রনাথকে জীবন-সংগী করে বরাবর সে একনিষ্ঠ থেকে গেছে। তার এই ভালোবাসার কথা মঞ্চ-জগতে কিম্বদন্তী হয়ে গেছে। তাছাড়া বড়ো মার্জিত রুচি ছিল তার, কথাবার্তায়, আকারে ইংগিতে কোনোরকম অশালীন ব্যবহার একদম সইতে পারতো না। এজন্য থিয়েটারের সবাই তাকে সম্ভ্রম করে চলতো। শোনা যায়, তার ঐকান্তিক ভালোবাসা আর চরিত্র-মাধুর্যের কথা শুনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর 'পরপারে' নাটকে 'শান্তা'র চরিত্র গ'ড়ে তুলেছিলেন। প্রসংগত এই দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা এইখানে বলে নেই। এ-কথা লিখে গেছেন তাঁর জীবনী-লেখক দেবকুমার রায় চৌধুরী। ঘটনাটি ১৯০২ সালের। ১৮ই জানুয়ারি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসনটিকে 'বহুৎ আচ্ছা' নাম দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিকে অভিনয় করান। এতে মিঃ চমপটি সাজতেন অমরবাবু নিজে, মেয়েদের মধ্যে রেবেকা—কুসুমকুমারী, সুকেশিনী-প্রমদাসুন্দরী, সুভাষিনী—বিনোদিনী বলে আর একটি মেয়ে যার ডাক নাম ছিল হাঁদি। এই বইয়ে চমপটি—বেশে মঞ্চে নেমে কুসুমকুমারীর সংগে ডুয়েট-গানে অমরবাবু দর্শকদের মাতিয়ে তুলতেন, 'এংকোর' ধ্বনিতে বাড়ি ফেটে যেতো বলা চলে। যাইহোক, 'বহুৎ আচ্ছা' অভিনীত হবার আগে যখন তার রিহার্স্যাল চলছিল, তখনকার ঘটনা। তখনকার দিনের প্রখ্যাত লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অমরেন্দ্র-প্রবর্তিত 'রঙ্গালয় পত্রিকা'র সম্পাদক। পাঁচকড়িবাবুর বলা ঘটনা দেবকুমারবাবু তাঁর বইতে তুলে দিয়েছেন। পাঁচকড়িবাবু বলেছেন,—'তখন আমি রংগালয়ে কাজ করি এবং রংগালয়-পত্র সম্পাদন করি, ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সহচর। দ্বিজু (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়) বাসায় আসিয়াছেন। তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত 'বহুৎ আচ্ছা' নামে ক্লাসিকে অভিনীত হইবার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। রিহার্স্যালের বা মহলার সময় দ্বিজেন্দ্রলালের উপস্থিত থাকা আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়। এই কথাটি অমরেন্দ্র আমাকে বহুবার বলিয়া পাঠাইতেছিল। দ্বিজেন্দ্র কিন্তু ঘোর গররাজী।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, দ্বিজেন্দ্র থিয়েটারে একটা ঘরে বসিয়া গান করিবেন, দেবকণ্ঠ সেই গান শুনিয়া স্বরলিপি লিখিয়া লইবেন। অভিনেত্রীরা যেখানে বসে, দ্বিজু সেখানে যাইবেন না।'

এই কথা অভিনেত্রীদের কানে গিয়েছিল। সেদিন যে গানটি তোলাবার কথা, সেটি ছিল ডুয়েট, গাইবার কথা নগেন্দ্রবালা (বুঁচি) ও ভুবনেশ্বরী বলে দুটি মেয়ের। ওদের সঙ্গে বসেছিল কুসুমকুমারী। কথাটা ওদের সবারই মনে লেগেছিল, বিশেষ করে তখনকার নায়িকাপ্রধান কুসুমকুমারীর সে ওদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলো যে, দ্বিজেন্দ্রলালকে কোনরকমে একবার রিহার্স্যালে নামাইতে হইবে। দ্বিজেন্দ্র যখন থিয়েটারের একটা ঘরে অতি সংকোচের সহিত অপরাধীর মতো শুষ্ক মুখে গিয়া বসিল, তখন ঐ মেয়েরা 'সখি ধর ধর' গানটির সুর আরম্ভ করছিল। 'সখি ধর ধর। কেন কেন সখি এভাব নিরখি, কেন কেন তুমি এমন কর? বসন্ত আসিল শীত অন্ত করি। সে যে ছিল ভালো, এ যে ঘেমে মরি।' পাঁচকড়িবাবুর বর্ণনা ক্রমে,—'মনে হইল অভিনেত্রীরা যেন ইচ্ছা করিয়াই, দুষ্টুমী করিয়াই, বেহাগের সঙ্গে অন্য সুর মিলাইয়া সে-গানটাকে অশ্রাব্য করিতেছিল। দ্বিজুর তাহা ক্রমে অসহ্য বোধ হইল, আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিল না। সে আমার পিঠে হাত দিয়া বলিল,—শুনছ? গানটাকে কিরকম murder (নষ্ট) করছে, দেখছ? আমি হাসিয়া বলিলাম,—যাও না, সামলাও না। দ্বিজু সত্য সত্যই আর স্থির থাকিতে পারিল না, উঠিয়া গিয়া টেবিল হার্মোনিয়ামের সম্মুখে বসিয়া গানটি ঠিকমত গাহিতে আরম্ভ করিল। সে তখন গানেই মশগুল! সম্মুখে নর আছে, না নারী আছে, তাহা লক্ষ্যই করে নাই। রাত্রি প্রায় ১২টা পর্যন্ত যখন গান শিখাইয়া ওঠে তখন তাঁহার হুঁস হইল যে, সে সত্যই রিহার্স্যালে নামিয়াছিল, পণ-ভঙ্গ হইয়াছে।'

পরে অবশ্য দ্বিজুবাবুর এ-সংকোচ ছিল না। এ-সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের সুযোগ্য পুত্র শ্রদ্ধেয় কণ্ঠশিল্পী দিলীপকুমার রায় লিখে গেছেন তাঁর 'গীতি সুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল'—নিবন্ধে,—'সুর শুনতে না শুনতে তাঁর গান এসে যেত। একবার একটি মেঘমল্লার গান শোনেন—কোথায় মনে পড়ছে না—তবে গানটির প্রথম চরণ ও সুর আজও মনে আছে: ঘনঘটা ঘোরি আই কারী কারী ঘনঘটা! অমনি তিনি বাঁধলেন, সেটি পরে তাঁর দুর্গাদাস নাটকে গেয়ে অভিনেত্রী সুশীলা-সুন্দরী (সুশীলাবালা) খ্যাতনামা হয়ে উঠেছিলেন রাতারাতি,—ঘন ঘোর মেঘ আই ঘেরি গগন / বহে শীকর স্নিগ্ধ চঞ্চসিত পবন!'

কিন্তু সুশীলাবালার কথা পরে হবে, এবার আমরা আমাদের পূর্বকথায় ফিরে যাই। ১৯০১ সালের ২৪শে এপ্রিল বেঙ্গল থিয়েটারের প্রাণ পুরুষ

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমণ করলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একষট্টি। সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। পাথুরিয়াঘাটার জয়রাম বসাকের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্নের কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক অভিনীত হয়, তাতে একটি স্ত্রী চরিত্রে বিহারীলাল আত্মপ্রকাশ করেন। তখন তাঁর বয়স সতেরো বছর মাত্র। পুরুষ-চরিত্রে প্রথম নামেন ১৮৬৭ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে মাইকেল মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকে ভীমসিংহের ভূমিকায়। ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎচন্দ্র ঘোষের সংগে তাঁর সম্ভাব ছিল। তাঁদের বেংগল থিয়েটার যখন ১৮৭৩-এ প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন ওঁদের সংগে ছিলেন বিহারীবাবু। সেই থেকে কোথাও না গিয়ে ঐ বেংগলেই পড়ে রইলেন বিহারীবাবু আমৃত্যু। গিরিশবাবু তাঁর সম্বন্ধে লিখে গেছেন, 'তিনি ব্যক্তিগত হিসেবে আমার অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, আমায় ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন।'

বিহারীবাবুর মহাপ্রয়াণের সংগে সংগে বেংগল থিয়েটারও উঠে গেল। অন্য লোকে মঞ্চ লিজ নিয়ে অন্য থিয়েটার চালাতে লাগলেন। গুরুপ্রসাদ মৈত্র নীলমাধব চক্রবর্তীর সাহায্যে এখানে 'অরোরা থিয়েটার' স্থাপিত করলেন। ১৯০১-এর ১৭ই আগস্ট ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'দক্ষিণা' অভিনীত হলো এখানে। ৫ই অক্টোবর 'সাধনা' বলে একটি নাটক মঞ্চস্থ হলো অতুলকৃষ্ণ মিত্রের লেখা। তারপর ১৬ই নভেম্বর হলো 'দেবী চৌধুরাণী'। এতে দেবী —গোলাপসুন্দরী, (দেবী গোলাপ নামে যিনি প্রখ্যাতা হয়েছিলেন) নিশি— বিষাদ কুসুম, ভবানী পাঠক-নীলমাধব চক্রবর্তী, ব্রজেশ্বর-প্রবোধ ঘোষ। ১৪ই ডিসেম্বর—শরৎসুন্দরী। এতে একটি চরিত্রে তারাসুন্দরী খুব নাম করে। ২৫শে ডিসেম্বর—অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'মাধবী'। ১৯০২ সালের ১৫ই মার্চ রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'কালপরিচয়।' এতে মোক্ষদা— তারাসুন্দরী, শম্ভু-অক্ষয় চক্রবর্তী, জগদীশ—নীলমাধব চক্রবর্তী। মনীন্দ্র-প্রিয়নাথ ঘোষ, কিশোরী—হরিমতী অভিনয় করেন। তবে এখানে যে নাটক সব থেকে নাম করে, সে হচ্ছে মনোমোহন রায়ের 'রিজিয়া'। নাম ভূমিকায় তারাসুন্দরী অনবদ্য অভিনয় করে। এ-বিষয়ে উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, —'অর্ধেন্দুবাবু যখন আরোরা থিয়েটারে যোগদান করেন, তখন আরোরা থিয়েটারে রিজিয়া নাটকের পুরাদস্তুর মহলা চলিতেছিল। শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই নাটকে রিজিয়ার ভূমিকায় মহলা দিতেছিল। সংগীতসমাজের নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী রিজিয়ার শিক্ষাপ্রদান করিতেছিলেন। কিন্তু মুস্তাফী সাহেব আসিয়া সে শিক্ষা ইংরাজী ভাবাপন্ন বলিয়া শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে তাহা একেবারে ভুলিয়া যাইতে উপদেশ দেন এবং স্বয়ং আগাগোড়া নূতন করিয়া শিক্ষাপ্রদান করেন। রিজিয়া সম্বন্ধে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর'

বইটিতে লিখে গেছেন,—'স্কটের প্রসিদ্ধ নভেল (Kenil worth) কেনিলওয়ার্থ' অবলম্বনে ইহা রচিত। অরোরা থিয়েটারে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়।··· এই থিয়েটারে যতগুলি নাটক অভিনীত হইয়াছিল, তম্মধ্যে একমাত্র 'রিজিয়া'ই উল্লেখযোগ্য আর বাংলা রঙ্গমঞ্চের গৌরবাস্পদা অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরীর যশোমুকুটে অভিনয়-সাফল্যের যতগুলি রত্ন আছে, এই রিজিয়ার ভূমিকায় অভিনয়-নৈপুণ্য তম্মধ্যে মধ্যমণি-স্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তখন এবং এখনও রিজিয়া বলিতে তারাসুন্দরীকেই বুঝায়।'
অর্ধেন্দুশেখরের ঘাতক-ও দেখবার মতো হতো। হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর 'যাদের দেখেছি' বইতে লিখে গেছেন, 'তাঁর অভিনয় গুণে সেই ক্ষুদ্র ভূমিকাই (ঘাতকের) এতটা বিখ্যাত হয়ে উঠলো যে, পরে শ্রেষ্ঠ নট ছাড়া আর কেউ সেই ভূমিকাটি গ্রহণ করতে সাহসী হতো না।'

রিজিয়ায় বক্তিয়ার রূপে প্রবোধ ঘোষও সবিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিলেন।

১৯০২ সালের শেষাশেষি 'অরোরা' উঠে গেল. অর্ধেন্দু গেলেন ষ্টারে। এই বেঙ্গল—মঞ্চে এবার এলেন ইউনিক থিয়েটার। 'রত্নমালা'র অভিনয় হলো এখানে ১৯০৩ সালের ৬ই জুন, তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। ইউনিকের মালিক ছিলেন গিরিমোহন মল্লিক। ইনি সতীশ চট্টোপাধ্যায়কে ম্যানেজার করেন। সতীশবাবু আর এক সম্ভাব্য মালিকের সংগে ষড়যন্ত্র করে গিরিবাবুকে হটাতে চাইলেন। শিল্পীদের মধ্য থেকে ক্ষেত্রমোহন মিত্র গিরিবাবুর পাশে দাঁড়ালেন। ক্ষেত্রবাবু চুনীলাল দেব, দানীবাবু প্রভৃতিদের এখানে নিয়ে আসেন। দানীবাবু 'বুদ্ধদেব' মঞ্চস্থ করলেন। ২১শে নভেম্বর করলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক 'তারাবাঈ।' এই তারাবাঈ খুব জমে গিয়েছিল। নাম ভূমিকায় তারাসুন্দরী, পৃথিরাজ—দানীবাবু, সূর্যমল-চুনিবাবু, জয়মল ক্ষেত্র মিত্র, সুলতানা—সুধীরাবালা, প্রভৃতি। এ নাটক জমলেও নানান ঝঞ্ঝাটে গিরিবাবু আর থিয়েটার চালাতে পারলেন না, চুনীবাবু আর দানীবাবু চলে গেলেন মিনার্ভায়। মিনার্ভার মালিক তখন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

'ক্লাসিক' তখন নাট্যজগতের শীর্ষে। ক্লাসিকের সংগে সংগে মিনার্ভাও চালাচ্ছিলেন অমরবাবু। কিন্তু কীভাবে এটা হয়েছিল, তার বৃত্তান্ত একটু দেওয়া দরকার। ১৯০০ সালের ২৫শে আগষ্ট 'সোনার স্বপন' বলে একটি নাটক ক্লাসিকে খোলা হয়েছিল। সংগে থাকতো তাঁর ব্যঙ্গনাট্য 'থিয়েটার।' হরীন্দ্রনাথ দত্ত লিখে গেছেন, 'অমরেন্দ্রনাথ প্রায়ই বলিতেন, সোনার স্বপন ও থিয়েটারের মতো বিক্রয় আমি অন্য কোনো বই হইতে পাই নাই।'

ওদিকে নরেন্দ্রনাথ সরকারের সংগে গিরিশবাবুর মনোমালিন্য হওয়ায় গিরিশবাবু মিনার্ভা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে বসে রইলেন। তখন ষ্টারের অবস্থাও

ভালো নয়, শিল্পীদের বেতন দিতে পর্যন্ত অপারগ হচ্ছে। অমৃতলাল কর্তৃক হঠাৎ কিছু টাকার দরকার হওয়ার তিনি তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'র তাঁর দেওয়া নাট্যরূপ 'সরলা' অমরেন্দ্রনাথের কাছে 'বিক্রয়ার্থ' পাঠিয়ে দিলেন। ১১ই নভেম্বর (১৯০০ সাল) ক্লাসিকে 'সরলা' প্রথম অভিনীত হলো। অমরবাবু-বিধুভূষণ, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ—শশীভূষণ, দানীবাবু-গদাধর, অক্ষয় চক্রবর্তী—নীলকমল, সরলা—কুসুমকুমারী, প্রমদা-প্রমদাসুন্দরী (পরে) তারাসুন্দরী। শ্যামা-গুলফম হরি। বলা বাহুল্য, স্টারের মতো ক্লাসিকের সরলাও দারুণ জমে গিয়েছিল। বিশেষ করে দানীবাবুর 'গদাধর'-এর নাম হয়েছিল খুব। এই সময় অমরবাবু গিরিশবাবুকেও ক্লাসিকে নিয়ে এলেন। তারাসুন্দরীকেও। তারাসুন্দরী তখন স্টার ছেড়ে ঘরে বসেছিলেন। তারাসুন্দরী ক্লাসিকে এসে ১৫ ডিসেম্বর অমরবাবুর 'নির্মলা' গীতিনাট্যে প্রথম অবতরণ করেন। ১৯০১ সালের নববর্ষে অমরেন্দ্রনাথের নতুন কৌতুকনাট্য 'চাবুক' অভিনীত হলো। কিন্তু নানাকারণে ছয় রাত্রি অভিনয়ের পর এ নাটক অমরবাবু বন্ধ করে দেন। ১৯০১-সালে তাঁর আর এক কীর্তি—'রঙ্গালয়' নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করা। প্রায় চার বছর চালিয়েছিলেন তিনি এই পত্রিকা। আর এক কীর্তি—হীরালাল সেনের সাহায্যে নাটকের সঙ্গে বায়োস্কোপ প্রদর্শন। এই ১৯০১ সালের ৮ই মার্চ এই ক্লাসিকেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মহেন্দ্রলাল বসু। ১৬ই মার্চ গিরিশবাবুর 'রামনির্বাসন'-এর পুনরভিনয় হলো। প্রবোধ ঘোষ—দশরথ, অমরেন্দ্রনাথ—রাম, দানীবাবু—লক্ষ্মণ, কুসুমকুমারী-সীতা, তারাসুন্দরী-কৈকেয়ী। ১৩ই এপ্রিল 'সধবার একাদশী'। নিমচাঁদের ভূমিকায় বহুদিন পরে আবার নামলেন গিরিশবাবু। ২০শে এপ্রিল গিরিশবাবুর 'মনের মতন' মঞ্চস্থ হলো। মিজান-দানীবাবু, কাউলফ-অমরবাবু, গোলেন্দাম-তারাসুন্দরী, দেলেরা-কুসুমকুমারী। মনিয়া-কিরণবালা (এ আর এক কিরণবালা)। পরিয়া—রাণীসুন্দরী, সানিয়া—গুলফম হরি। ১লা জুন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'। গিরিশবাবুর দেওয়া নাট্যরূপ। অধিকারী ও চরিত্রক—গিরিশবাবু নিজে। নবকুমার-অমরবাবু। কাপালিক—অঘোরনাথ পাঠক, বালকভৃত্য-দানীবাবু, জাহাঙ্গীর-প্রবোধ ঘোষ, কপালকুণ্ডলা—কুসুমকুমারী, মতিবিবি—তারাসুন্দরী। মতিবিবির ভূমিকা থিয়েটারী ভাষায় তারাসুন্দরী একেবারে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। যেটিকে 'প্রত্যাখ্যান-দৃশ্য' বলা হয়, সে-দৃশ্যে অমরেন্দ্রনাথ ও তারাসুন্দরীর অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চে আগুন জ্বলিয়া উঠিত।' তারাসুন্দরী যখন অমরেন্দ্রনাথকে বলতেন, —'নির্দয়, আমি তোমার জন্য আগ্রার সিংহাসন পরিত্যাগ করে এসেছি, তুমি আমায় ত্যাগ করো না'—তখন তাঁর অভিব্যক্তি অবাক হয়ে দেখতেন দর্শক।

অমরেন্দ্রনাথ বলতেন,—তুমি আবার আগ্রায় ফিরে যাও আমার আশা ত্যাগ করো।'

তারাসুন্দরী বলতো,—'তোমায় ত্যাগ করবো—এ জনমে নয়। তুমি আমারই হবে।'

কুসুমকুমারী একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। মতিবিবি তাকে না দিয়ে তারাসুন্দরীকে দেওয়াতে। পরবর্তীকালে স্টারে এ-ভূমিকায় কুসুমকুমারী নেমেও ছিলো, কিন্তু তারাসুন্দরীকে পরাস্ত করতে পারে নি। এখানে বলা দরকার ওঁদের দেখাদেখি মিনার্ভাও অতুলকৃষ্ণ মিত্র নাট্যায়িত কপালকুণ্ডলা খুলেছিল. তাতে. তিনকড়ি মতিবিবি সেজেছিল, তবু সে নাটক সব মিলিয়ে ক্লাসিকের মতো হয় নি। ২৭শে জুলাই ক্লাসিকে হলো মৃণালিনী। পশুপতি—গিরিশবাবু হেমচন্দ্র—অমরবাবু. গিরিজায়া—কুসুমকুমারী. মনোরমা—প্রমদাসুন্দরী। প্রথম অভিনয়ের দিন গিরিশবাবু একটি দুর্ঘটনায় আহত হবার দরুণ দ্বিতীয় রাত্রি থেকে পশুপতি করতে থাকেন দানীবাবু। ক্লাসিকে এর পর 'জনা' 'রাবণ-বধ' 'গুপ্তকথা' 'দক্ষযজ্ঞ', এমনকি 'চৈতন্যলীলা'ও অভিনীত হয়। ৭ই ডিসেম্বর অভিনীত হলো 'সোনার স্বপন'-প্রণেতা প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'তোমারি।' এতে আমীরুদ্দিন—অমরবাবু, গোলেনা – তারাসুন্দরী, আমিনী—কুসুমকুমারী।' 'তোমারি'র জবাবে মিনার্ভা করলো 'আমারি।' এরপর খোলা হয় ১৯০২ সালের ১৮ই জানুয়ারি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বহুৎ আচ্ছা' যার কথা আমরা আগেই বলেছি। এই সময় তরোরা থিয়েটার ক্লাসিক থেকে, তারাসুন্দরীকে ভাগিয়ে নিয়ে যায়। তারাসুন্দরীর যাবার ইচ্ছে ছিল না যদি সে সময় অমরবাবু তার মাইনে একটু বাড়িয়ে দিতেন, তাহলে সে থেকে যেতো। অমরবাবু সেদিন তার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেননি, পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি খুবই অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

যাই হোক, ঐ ১৯০২ সালেরই ২২শে মার্চ ক্লাসিকে হলো 'শিবজী' (অর্থাৎ শিবাজী)। মনোমোহন গোস্বামী এই নাটকটি লিখেছিলেন 'রোসিনারা' নামে অমর দত্ত মশাই নাম বদলে করলেন শিবজী। রোসিনারা—কুসুমকুমারী, নামভূমিকায় অমরবাবু নিজে, আওরঙ্গজেব—দানীবাবু, সদাসুখ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। ১২ এপ্রিল হলো অমরবাবুর 'ফটিক জল', ১৯ এপ্রিল থেকে এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলো বৈকুণ্ঠনাথ বসুর প্রহসন 'ঘোর বিকার'। ফটিক জল এর জুমেলী-চরিত্রে ছিল রাণীসুন্দরী, পরে কুসুমকুমারী। ১৮ই মে গিরিশবাবুর 'হারানিধি'। হরিশ সাজেন গিরিশবাবু, নীলমাধব—দানীবাবু, অঘোর—অমরবাবু, কাদম্বিনী—কুসুমকুমারী। এর পরের নতুন নাটক গিরিশচন্দ্রের 'ভ্রান্তি' (১৯শে জুলাই)—রঙ্গলাল—গিরিশবাবু, নিরঞ্জন—অমরবাবু, পুরঞ্জন

—দানীবাবু, অন্নদা—প্রমদাসুন্দরী (পরে তিনকড়ি), গঙ্গা—কুসুমকুমারী।
এ-সময় মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষকে কী কারণে যেন থিয়েটার-জগৎ রুষ্ট হয়ে ব্যঙ্গ করে নাটক—অভিনয় করতে লাগলো। অমৃতলাল বসু-র লেখা 'অবতার'ই এই উদ্দেশে প্রথম তীর নিক্ষেপ 'ষ্টার' মঞ্চ থেকে। দ্বিতীয়টি করলেন অমরবাবু 'লাট গৌরাঙ্গ' নাম দিয়ে। দ্বিতীয় অভিনয়ে এর নাম বদলে করলেন 'ভক্তবিটেল' পরে অবশ্য অমরবাবু এ-অভিনয় বন্ধ করে দেন। ক্লাসিকে এর পরের নতুন নাটক গিরিশবাবুর 'আয়না।' অমরবাবু এতে 'সৃষ্টিধর' করছিলেন, কিন্তু দুই রাত্রি করার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাই গিরিশচন্দ্র নিজে নামতে লাগলেন এই ভূমিকায়। ১৯০৫ সালে ১৭ই জানুয়ারি অমরবাবু সুস্থ হয়ে থিয়েটারে এলেন। সেদিন হচ্ছিল 'সীতার বনবাস', সীতার ভূমিকায় তিনকড়ি, রাম—গিরিশবাবু, অমরবাবু—লক্ষ্মণ, কুসুমকুমারী—লব, ভূষণকুমারী—কুশ। এই নাটক জনপ্রিয় হওয়ায় বেশ কিছুদিন ধরে চলতে থাকে। অমরবাবু পুরানো নাটকও মাঝে মাঝে অভিনয় করাতে লাগলেন। এই তালিকায় বিল্বমঙ্গল ছিল, এতে গিরিশচন্দ্র প্রথমে নামলেন সাধক চরিত্রে। চিন্তামণি—কুসুমকুমারী, পাগলিনী—তিনকড়ি, নামভূমিকায় অমরবাবু। 'অভিমন্যুবধ'-এ তিনকড়ি অভিমন্যু। সে-ও এক দেখবার মতো অভিনয় হয়েছিল। অমরবাবু 'নীলদর্পণ'ও করেছিলেন, নিজে সেজেছিলেন নবীনমাধব। মিঃ উড—গিরিশচন্দ্র, মিঃ রোগ—দানীবাবু, তোরাপ—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, সাবিত্রী—তিনকড়ি, ক্ষেত্রমণি—কিরণবালা। (এ অন্য কিরণবালা)। সৈরিন্ধ্রী—কুসুমকুমারী।

প্রসঙ্গত এইখানে একটা কথা বলা যেতে পারে। বেশ কিছুদিন ধরে নাট্য জগতে গিরিশচন্দ্র ও তিনকড়িকে জড়িয়ে নানারকম প্রণয়-কাহিনীর গুঞ্জরণ শোনা যেতো। আমাদের রাঙাবাবুর কানেও সে কথা গিয়েছিল। তাঁর মাধ্যমে এ-কথা শুনে বিনোদিনী হেসে ফেলেছিল।

ঃ বুড়োবয়সে এ হলো কী ?

—ঠাকুরের কথাঃ ও ভৈরব। দেবকন্যাও নেবে, নাগকন্যাও নেবে। কিন্তু—

বিনোদিনী বললে,—এই 'কিন্তু' টাই সব। ও সব বাইরের রটনায় কান দিয়ো না।

অথচ একটা ঘটনার কথা তখন মুখে মুখে প্রচার হয়ে গিয়েছিল। উত্তর কলকাতারই কোনো এক ধনী ব্যক্তির নজরে পড়েছিল তিনকড়ি। তিনি জানতেন তাঁর পথের কাঁটা গিরিশবাবু। গিরিশবাবুর সঙ্গেও সে-ব্যক্তির ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি এক অভিসন্ধি এঁটে তাঁর সিঁথির বাগানবাড়িতে এক মাইফেল বসালেন। এ-রকম মাইফেল ওঁর ঐ বাগানে প্রায়ই বসতো। যেতেন গিরিশবাবু।

গিরিশবাবু আর ঐ বাবুটির বন্ধু রাজেন চট্টোপাধ্যায় বলে ভদ্রলোক। আর থাকতো তিনকড়ি। এবারেও সেই রকম আমন্ত্রণ হলো। ঐ ধনী ব্যক্তিটি ইতিমধ্যে তিনকড়িকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন—থিয়েটার ছেড়ে সে যদি তাঁর কাছে থাকে, তাহলে তাঁকে সোনা-দানার হীরে জহরতে মুড়ে দেবেন। বাড়ি-গাড়ি তো দেবেনই, তার কোনো অভাবই রাখবেন না। তিনকড়ি বলেছিল,—একটু ভেবে দেখি। বাবুটি জানতেন, তিনকড়ি নিশ্চয়ই পরামর্শ নেবে গিরিশবাবুর। তাই ই-হলো! গিরিশবাবু বললেন তিনকড়িকে, খবরদার থিয়েটার ছেড়ো না। আজ তুমি যশের সর্বোচ্চ চূড়ায়। হেলায় একে হারিয়ো না। উঠেছিল বিনোদিনীর কথা। গিরিশবাবু বলেছিলেন, তার কথা আলাদা। সে বিবাহ করেছে। সে বিবাহিতা। এ মর্য্যাদা কে তোমায় দেবে? তিনকড়ি তাই বাবুটিকে 'না' বলে দিয়েছিল। বাবুটি প্রত্যাখ্যাত হয়ে যে ক্ষেপে গেছেন, সেটা তিনি কাউকে জানতে দেননি। আয়োজন করলেন মাইফেলের। কথা হলো, বারোটার মধ্যে সবাইকে চলে যেতে হবে। থাকবেন শুধু গিরিশবাবু, সঙ্গে তাঁর সঙ্গিনী তিনকড়িও থাকতে পারে। সেদিন গিরিশবাবুকে খুন করার পরিকল্পনা হয়েছিল। পুকুরের পাড়ে মাটি খুঁড়ে রাখা হয়েছিল। ওখানে লাস পুঁতে রাতারাতি ঘাসের চাপড়া বসিয়ে দিতে হবে। এজন্য ভাড়া-করা গুণ্ডা আনা হয়েছিল। ঘটনাচক্রে ঐ গুণ্ডার সর্দারটি ছিল রাজেনবাবুর খুব চেনা আর অনুগত। বাগানে ঢুকেই তার কাছ থেকে সব জানতে পারেন রাজেন বাবু। তখন শীতকাল। গিরিশবাবু যেখানে যেতেন, সঙ্গে তার চাকর ফকিরও যেতো। এই ফকিরকে খুঁজে বার করলেন রাজেনবাবু, তাকে বললেন, একটা গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে সিঁথির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, বুঝলে? বাড়ির মধ্যে আর ঢুকবে না। তোমার বাবুর বড়ো বিপদ। কোনো—কিছু কিনে আনবার অছিলা করে ফকির তো বাগানবাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। রাজেনবাবু পালোয়ান-ব্যক্তি ছিলেন। দেখে নিয়েছিলেন, গোসলখানার জানালার রড ভাঙা। তার বাইরে ঝাঁকড়া আমগাছের ডাল নেমে এসেছে। সেই ডাল ধরে পাঁচিলে নামা যায়। গিরিশবাবু তখনো সবার সঙ্গে হলঘরে এসে বসেন নি। আলাদা একটা ঘরে তিনকড়িকে কাছে বসিয়ে সুরাপান করছিলেন। রাজেনবাবু হলঘরে তাঁর বন্ধু সেই ধনী ব্যক্তিটির কাছে নিজের শালখানা ফেলে এসেছিলেন ইচ্ছে করে। যাতে কেউ কিছু না সন্দেহ করে। তারপরে খুঁজতে খুঁজতে এলেন গিরিশবাবুর কাছে। সব খুলে বললেন। তারপরে তিনকড়িকে বললেন, কেমন অভিনেত্রী এইবার বোঝা যাবে। হলঘরে গিয়ে বাবুটির পাশে বোসো। গান শুনতে শুনতে 'যেন শীত করছে' এই ভাব করে আমার শালখানা গায়ে জড়িয়ে নেবে। তারপরে খানিকক্ষণ পরে যেন গোসলখানায় যাচ্ছো, এমনি

করে গোসলখানায় এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। তারপরে যা করবার আমি করবো।

তিনকড়িকে এইভাবে হলঘরে পাঠিয়ে তিনি গিরিশবাবুকে গোসলখানায় এনে জানালার রড সরিয়ে গিরিশবাবুকে পিঠে নিয়ে ঐ আমগাছের ডাল ধরে কোনোরকমে পাঁচিলে নামলেন। তারপরে গিরিশবাবুকে বললেন লাফ দিয়ে রাস্তায় নামতে। এদিকটা হচ্ছে ফটকের উলটো দিক। পাঁচিলের এই অংশটা বাড়ি আর গাছের আড়ালে পড়েছে। কেউ দেখবে না, ছুটে চলে যান সিঁথির মোড়ে। সেখানে ফকির থাকবে গাড়ি নিয়ে। গাড়িতে উঠে বসে থাকুন, আমি তিনকড়িকে নিয়ে আসছি।

এই একই কায়দায় তিনকড়িকে নিয়ে এলেন রাজেনবাবু। তারপরে তিনজনে গাড়িতে উঠে তখুখুনি রওনা হয়ে গেলেন বাড়ির দিকে।

বিনোদিনী অবাক হয়ে রাঙাবাবুর মুখ থেকে এ-ঘটনাও শুনলো। ওদিকে ষ্টারের তখন কপাল ফিরে গেল একটি নাটক করে। সেটি হচ্ছে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য।' এতে দুটি ভিন্নমুখী চরিত্রে অভিনয় করলেন অর্ধেন্দুশেখর, বিক্রমাদিত্য ও রডা। বসন্ত রায়-অক্ষয়কালী কোঙার, প্রতাপাদিত্য— অমৃতলাল মিত্র, গোবিন্দদাস—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়া— নরীসুন্দরী, গয়লাবৌ-ক্ষেত্রমণি। যেমন 'বিজয়া' তেমন 'গয়লা বৌ।' ক্ষেত্রমণির গয়লা-বৌ একটি সৃষ্টি। আর রডারূপী অর্ধেন্দুশেখর? অপরেশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখে গেছেন, 'অর্ধেন্দু রডা সাজিলেন, সহস্র সহস্র দর্শক প্রতাপাদিত্যের অন্যান্য অভিনেতার অভিনয় ভুলিয়া গেলেন, কিন্তু রডার সেই একটি কথা, 'ভেরি সরি রাজা' কেহ ভুলিবেন না। আমার বিশ্বাস যিনি একবার তাহা শুনিয়াছেন, বার্ধক্যের ক্ষীণ স্মৃতি আশ্রয় করিয়াও সেই মর্মভেদী করুণ স্বর তাঁহার কর্ণে চিরদিন ঝঙ্কার করিবে।'

অমরেন্দ্রনাথও ক্লাসিকে ষ্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 'প্রতাপাদিত্য' নামালেন ২৯শে আগস্ট তারিখে ; হারানচন্দ্র রক্ষিতের উপন্যাসকে নাটকাকারে পরিণত করে। প্রতাপাদিত্য-অমরবাবু, শঙ্কর-দানীবাবু, বিক্রমাদিত্য-নীলমাধব চক্রবর্তী, বসন্ত রায়-পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গোবিন্দ রায় ও রডা-অতীন্দ্র ভট্টাচার্য, রাঘব—ফিরোজাবালা (নেনী), যশোহর রাজলক্ষ্মী-তিনকড়ি, ছোটরাণী—হরি সুন্দরী (ব্ল্যাকি) ফুলজানি-কুসুমকুমারী। দানীবাবু 'শঙ্কর' করছিলেন, কিন্তু পাঁচরাত্রি অভিনয় করবার পর তিনি ক্লাসিক ছেড়ে দিলেন। তার বদলে শঙ্কর করতে লাগলেন মনোমোহন গোস্বামী। দানীবাবু গেলেন ইউনিকে, চুণীবাবুও ছিলেন সেখানে। ওদিকে মিনার্ভার সত্ত্বাধিকারী তখন প্রিয়নাথ দাস। তাছাড়া মিনার্ভা তখন রিসিভারের হাতে। ১৯০৩ সালের ১০ই মে

অমরেন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের কাছ থেকে তিন বছরের জন্য মাসিক পাঁচশ' টাকা ভাড়ার চুক্তিতে মিনার্ভার লিজ নিয়ে একসঙ্গে ক্লাসিক ও মিনার্ভা চালাতে বদ্ধপরিকর হলেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'রঘুবীর' দিয়ে এই মিনার্ভার তিনি উদ্বোধন করলেন ১৯০৩ সালের নভেম্বর মাসে। রঘুবীর—অমরবাবু, অনন্তরাও—রাধামাধব কর, দেবল—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), শ্যামলী—পুঁটুরাণী, পরিবাণু—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকি), সখার মা—গুলফন হরি। মিনার্ভায় অমরবাবুর আর একটি উল্লেখযোগ্য অভিনয় ১৫ই নভেম্বর তারিখে 'আনন্দমঠ'-এর জীবানন্দের ভূমিকা। ওদিকে ক্লাসিক চলছিল প্রবল প্রতাপে। ২১শে নভেম্বর ক্লাসিকে তিনি খুললেন একটি গীতিনাট্য, অতুলকৃষ্ণ মিত্রের লেখা 'হিরন্ময়ী।' এতে চপল—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, আনন্দ স্বামী—হরিভূষণ ভট্টাচার্য, অমলা—কুসুমকুমারী, হাসি—রাণীসুন্দরী, পুরন্দর—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (পঞ্চম রজনী থেকে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)। এই হিরন্ময়ী খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। হরীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'আলিবাবার পর হিরন্ময়ীর মতো জমজমাট অপেরা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আর দ্বিতীয় অভিনীত হয় নাই।'

কিন্তু সে যাক, দুটো থিয়েটার এক সঙ্গে চালানো মহা ঝঞ্ঝাটের। মিনার্ভা নিয়ে চক্রান্ত শুরু হলো, সেটা গিয়ে দাঁড়ালো মামলায়। মামলায় অবশ্য তখন জিতলেন অমরবাবু। ওদিকে ইউনিক ছেড়ে চুণিবাবু ও দানীবাবু অমরবাবুর কাছে এসে যোগ দিতে চাইলে, তিনি তাঁদের মিনার্ভায় নিয়ে আসেন, আর ২৪শে ডিসেম্বর থেকে গিরিশচন্দ্রকে অধ্যক্ষ করে মিনার্ভা চালাতে লাগলেন। ১৯০৪ সালের ৯ই জানুয়ারি মিনার্ভায় জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের প্রহসন 'হিতে বিপরীত' মঞ্চস্থ হলো। এই সময় ১লা ফেব্রুয়ারি অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভা-সম্প্রদায় নিয়ে ঢাকায় যান অভিনয় করতে। এইখানে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ব্যক্তির প্ররোচনায় চুণিবাবু তাঁর দলবল নিয়ে অমরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধাচারণ করতে লাগলেন। তাঁরা অভিনয়ের পর আর ফিরতে চাইলেন না। অমরবাবু তখন পুঁটুরাণীর গয়না বাঁধা রেখে দলের সকলের মাইনে মিটিয়ে দিলেন। তারপরে অনেক কাণ্ডকারখানা করে নিজে একা ফিরে এলেন কলকাতায়। এসে ঢাকায় চুণিবাবুর কাছে দলের সব অভিনেতৃবৃন্দের পদচ্যুতি পাঠিয়ে দিলেন; 'এ-ঘটনার দিন পনেরো পরে',—লিখেছেন হরীন্দ্রনাথ দত্ত, 'পুনরায় অমরেন্দ্রনাথ ঢাকা যান —এবার সঙ্গে ক্লাসিক সম্প্রদায়। সেখানে খুব সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিবার পর কলিকাতায় প্রত্যাগমনকালে তিনি পুঁটুরাণীর গহনা ছাড়াইয়া লইয়া, তাহা মালিককে ফিরাইয়া দেন।'

এসব ঘটনা নিয়ে কলকাতার নাট্যজগৎ তখন তোলপাড়। রাঙাবাবুর কানেও সব আসতো, আলোচনা করতেন বিনোদিনীর সঙ্গে। বিনোদিনীর মেয়ে

শকুন্তলা বা কালো তখন আরও একটু বড়ো হয়েছে, তেরো বছর তার বয়স। সে পড়াশুনা করে, গান গেয়ে হেসে খেলে কাটাচ্ছে, আর বিনোদিনী অবসর সময়ে লিখছে কবিতা। রাঙাবাবু একদিন ওর খাতা উলটে দেখলেন, বিনোদিনী লিখেছে,—'এখনো কি সেইরূপ ভালবাসো মোরে ? এখনো কি দয়া হয়, এখনো মমতাময়,/ আছে কি হৃদয় তব এ দাসীর তরে !'

ওকে কাছে ডেকে নিয়ে রাঙাবাবু বলেন,—আমি তো কবিতা লিখতে পারি না তোমার মতো, কিন্তু একটা জিনিস জানি—ভালোবাসতে। সেখানে আমার কোনো খাদ নেই জানবে।

বিনোদিনী পরম সুখে ওর বুকে মাথা রাখে পুরানো দিনের মতো। রাঙাবাবু সেই পুরনো মতোই ওকে আদর করেন, বলেন,—আজকাল মনে বড়ো একটা ইচ্ছে জাগে।

—কী গো ?

রাঙাবাবু বললেন,—ইচ্ছে জাগে, গিরিশবাবুকে, ভুনিবাবুকে একদিন নিয়ে আসি। তোমার কবিতাগুলো ওঁদের দেখাই।

বিনোদিনী চুপ করে থাকে। এ ধরণের প্রস্তাব আগে আরও করেছেন রাঙাবাবু, কিন্তু বিনোদিনী রাজী হয়নি। আজ সে অবশ্য মুখ ফুটে 'না' বললো না। রাঙাবাবু বললেন,—দেখা হলেই তোমার কথা ওঁরা জিজ্ঞাসা করেন। বড়ো ভালো লাগে। তোমাকে ওঁরা ভোলেন নি।

ওঁরা কথা বলছিল শোবার ঘরে বসে, লাইব্রেরী ঘরে কালো পড়ছিল বুড়ো মাস্টারের কাছে ; হঠাৎ এক সময় ভেজানো কপাট খুলে সে এ ঘরে এলো, ডাকলো,—মা !

ডাকের মধ্যে অদ্ভুত এক কাতরতা ! মায়ের প্রাণ অমনি কেঁদে উঠলো, বিনোদিনী বললে,—কীরে ?

কালো বললে,—মাস্টার মশাই চলে গেলেন। বললেন,—আজ পড়া থাক। তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো। তোমার জ্বর হয়েছে।

বিনোদিনী ব্যস্ত হয়ে ওর কাছে এলো, বললে, ওমা ! সে কী কথা ! জ্বর হয়েছে কী রে !

রাঙাবাবুও এগিয়ে আসেন তাড়াতাড়ি, ওর কপালে হাত দেন, তারপরে চমকে উঠে বলেন,—ঈস্ ! এ যে ধুম জ্বর !

কালো বললে,—সকাল থেকেই মাথা টিপ টিপ করছিল। শুয়ে পড়বো মা ?

বিনোদিনী বলে উঠলো,—শুয়ে পড়—শীগ্‌গির শুয়ে পড় !

বলে নিজের হাতে জড়িয়ে ধরে ওকে বিছানায় শুইয়ে দেয়, তারপরে রাঙাবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে,—ওগো !

রাঙাবাবু বললেন,—ঘাবড়িয়ো না! আমি কবিরাজ মশাইকে খবর পাঠাচ্ছি।

—ওর তো কখনো জ্বর জ্বারি হয় না—বলতে বলতে একটা চাদর নিয়ে এসে মেয়ের গায়ের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে একখানা পাখা হাতে ওর শিয়রে বসে বিনোদিনী. রাঙাবাবু বেরিয়ে যান।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও জ্বর বাড়তে লাগলো। কপালে জলপট্টি দিতে হয়েছে। মালিনী হাওয়া করছে। উদ্বিগ্ন মুখে বসে আছে বিনোদিনী। রাঙাবাবু কাছে দাঁড়িয়ে। কবিরাজ মশাই ওর পাশে বসে অনেকক্ষণ ধরে নাড়ি দেখলেন। তখনকার দিনে মানুষের কবিরাজদের ওপর খুব আস্থা ছিল। তাঁরা খুব ভালো নাড়ি দেখতে পারতেন বলে প্রবল জ্বরটর হলে আগেই ওঁদের ডাক পড়তো। রাঙাবাবুদের বন্ধু এই কবিরাজের নাড়ি-দেখার ক্ষমতা ছিল। তিনি নাড়ি দেখে গম্ভীর হলেন, বললেন,—ওষুধ দিচ্ছি, দিন দুই দেখুন। যদি না সারে, তাহলে ডাক্তার ডাকতে হবে, বড়ো ডাক্তার—সাহেব ডাক্তার হলেই ভালো হয়। এত চড়া জ্বর—সান্নিপাতিকে না দাঁড়ায়!

তখনকার দিনে সান্নিপাতিক জ্বর ছিল বড়ো মারাত্মক। শুনলে যে কোনো লোকের বুক ভয়ে কেঁপে উঠতো। এক্ষেত্রেও হলো তাই। ভয় হোলো বিনোদিনীর। অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে উঠলো, ঠাকুর—ঠাকুর!

রাঙাবাবু স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

রাত বাড়তে লাগলো। ঘড়িতে রাত তখন দুটো, বিনোদিনী বা রাঙাবাবু—কারুর চোখে ঘুম নেই। বিকারের ঘোরে কালো বলছে,—মা!

—কী মা!

—দাদা আজকাল আমার সঙ্গে কথা বলে না কেন! দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় কেন!

রাঙাবাবু মুখ নিচু করে বসেছিলেন, কালোর কথা শুনে মুখ তুলে ওর দিকে তাকালেন। এ সব খবর তাঁর জানা নেই! সত্যিই কি তাঁর ছেলে তার বোনের সঙ্গে আজকাল কথা বলে না?

রাত ভোর হয়। দিন আবার গড়ায় রাতের দিকে। ওষুধে কোনো কাজ হয় না। কবিরাজ মশায় ডাক্তার ডাকবারই পরামর্শ দেন। পরদিন একে একে চারজন ডাক্তার আসেন—তার মধ্যে একজন খুব বড়ো ডাক্তার—সাহেব ডাক্তার। অন্য ডাক্তাররা জুড়ি গাড়িতে এসেছেন, ইনি এসেছেন ফোর্ড-মটোর গাড়িতে। কলকাতায় মটোর গাড়ি তখন খুব কম। কালোকে ডাক্তাররা খুব ভালো করে দেখে একে একে নিচে নেমে আসেন। তাঁদের সবারই মুখ গম্ভীর। আলোচনার পর তাঁদের হয়ে সাহেব ডাক্তারই প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছেন, লোক চলেও গেছে

গাড়ি হাঁকিয়ে সেই সব ওষুধ নিয়ে আসতে। সাহেব-ডাক্তার রাঙাবাবুকে বললেন,—We are sure it is typhoid. We shall be trying our best. I shall come again this night. Don't worry babu, don't worry.

বলে তিনি চলে গেলেন। কিন্তু সত্যিই আবার এলেন তিনি রাত্রিবেলায়। কালোকে দেখতে লাগলেন, ওষুধগুলো ঠিকমতো খাওয়ানো হচ্ছে কিনা তার তদারক করলেন।

ওদিকে—পাশের পুরানো বাড়িতে—মায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে খোকা। খোকা তখন যুবক, তার বয়স তেইশ। সে বোনকে দেখতে যেতে চাইছিল, কিন্তু তার মা রাশ টেনে ধরলো, বললো,—ওদের মেয়ের অসুখের বাড়াবাড়ি, তা তোর কী? নিজের আখের একটু বুঝতে শেখ খোকা! এরপর শক্ত হাতে তোকেই ধরতে হবে সংসারের হাল! তোর বাবার বিচ্ছিরী হাঁপানী রোগ! কবে টেঁসে যায় কে জানে! তুই কি বলতে চাস, তোর বিষয়-আশয় বাইরের ভূতেরা এসে লুটে পুটে খাবে!

খোকা চুপ করে শোনে, কিছু বলে না।

কালোর অবস্থা যেমন ছিল তেমনি আছে। দিন সাতেক ধরে চললো যাকে বলে যমে-মানুষে লড়াই। সাহেব-ডাক্তার, তাঁর সহকারী রোজ দুবেলা আসেন, কবিরাজ মশাইও খোঁজখবর নিতে আসেন। সবাই উদ্বিগ্ন তখনকার দিনে টাইফয়েড সত্যিই উদ্বেগের বিষয় ছিল। সেদিন দিনের বেলা। সকালের দিকে সাহেব ডাক্তারটি যেমন তাঁর সহকারীকে নিয়ে আসেন, তেমনি এসেছেন। এগিয়ে গিয়ে আগেই নেড়েচেড়ে দেখলেন ওষুধের শিশিগুলো, একজন মেম-নার্স রাখা হয়েছিল। সুতরাং শুশ্রূষার কোনো ত্রুটি হচ্ছিল না। সাহেব রোগীর দিকে তাকালেন। আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছে। ডাক্তার নার্সকে জিজ্ঞাসা করলেন,—Medicine served rightly?

—O Yes.

ডাক্তার বিড়বিড় করে বললেন,—Then why this coma stage?

নার্সের মুখ গম্ভীর। সে মুখ নিচু করলো। তার ভাবভঙ্গি দেখেই ডাক্তারের কেমন সন্দেহ হলো। কাছে গিয়ে কালোর গায়ে হাত দিলেন তিনি, তার পরে নাড়ি দেখলেন, চোখ দেখলেন, তার পরে অস্ফুট আর্তনাদে বলে উঠলেন,—Oh God!

রাঙাবাবু চমকে উঠলেন, বললেন,—What happened Doctor, what happened?

ডাক্তার নিজের বুকে ক্রুশ করলেন, তারপরে মাথা নিচু করলেন, নার্সটির

মুখও নিচু। রাঙাবাবু তখন পাগলের মতো কালোর ওপর ঝুঁকে পড়ে ডেকে উঠলেন,—খুকি। খুকি!

বিনোদিনীর মুখখানা শক্ত। সে সোজা হয়ে বসলো। তার চোখে জল নেই। সে উঠে দাঁড়ালো। তারপরে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার কানে বাজছে রাঙাবাবুর হাহাকার—খুকি—খুকি!

ডাক্তাররা চলে যায়। মালিনীরা ছুটে আসে।

বিনোদিনী চলে গেল ঠাকুর ঘরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ছবি। সেই দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে বিনোদিনী। চোখ সজল, ঠোঁট কাঁপছে। সে যেন বলতে চায়,—এ কী করলে ঠাকুর—এ কী করলে!

ঠাকুরের ছবির দিকে তাকাতে তাকাতে তার কী রকম বিভ্রম ঘটে যায়। সে যেন দেখতে পাচ্ছে রক্তমাংসের ঠাকুরকে সেই স্টার থিয়েটার। বক্সে বসে আছেন ঠাকুর, আর সে চৈতন্যের ভূমিকায় ভাবাবেশে গাইছে, হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়!

পিছন থেকে উদভ্রান্তের মতো ছুটে আসেন রাঙাবাবু, চিৎকার করে ওঠেন, বিনোদিনী!

এবার সম্বিত ফিরে পায় বিনোদিনী। কান্নায় ভেঙে সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে—এ কী করলে ঠাকুর! ও কচি মেয়ে! ওর বদলে আমাকে নিলে না কেন—আমাকে নিলে না কেন!

দিন চলে যায়। রাত আসে। নিঃঝুম রাত। গংগার বুকে—আলো আঁধারিতে ছোট ছোট ঢেউ উদ্বেল হয়ে উঠছে! সেই ঢেউ কেটে এক পানসী চলে যায়। দাঁড়ের শব্দ শোনা যায়,—অনেকটা ঘড়ির পেন্ডুলামের ছন্দে,—ছপ্-ছপ্! ছপ্-ছপ্!

কালোর মৃত্যু যেন শেলের মতো ওদের দুজনের বুকে বেজেছিল। একটি অলৌকিক ঘটনাও ঘটে। সে-কথা বিনোদিনী নিজেই লিখে গেছে তার 'আমার কথায়' 'আমার কনিষ্ঠা কন্যার যখন মৃত্যু হয়, সেই দিন ঠিক সেই সময়ে আমার সেই কন্যা অথবা তাহার ছলনাময়ী মূর্তি সেই আত্মীয়াটির প্রত্যক্ষীভূত হয়। আমিও যেমন আলস্য জড়িত দেহে শুইয়াছিলাম মাত্র, তিনিও সেইরূপ সুষুপ্তি হইতে অন্তরে ছিলেন। আমার কন্যামূর্তিকে দেখিয়া বলেন,—একী। কালো! তুই এখানে? তিনি তখন কলিকাতার বাহিরে বাস করিতেছিলেন। মূর্তি উত্তর করিল,-হ্যাঁ। আত্মীয় তাহাতে বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—'সে কী! এত অসুস্থ শরীরে তুই এলি কী করে মা?' ছায়াময়ী উত্তর করিল,—'এলুম।' দুটি-তিনটি কথা কহিয়া তিনি যেমন উঠিয়া বসিলেন, আর দেখিতে পাইলেন না!'

যাই হোক, মেয়ের মৃত্যুর পর বিনোদিনী অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই সময় রাঙাবাবু একদিন গিরিশবাবুকে নিয়ে আসেন। অনেক কথা হয়। তিনি ওর নতুন কবিতার খাতাখানা নিয়ে পড়েন। ছাপানোর কথা হয়। সেই অনুসারে রাঙাবাবু ওটি ছাপতে দেন। ছাপতে দেরিও হয়ে যায়। ১৯০৫ সালে 'কনক ও নলিনী' নামে কবিতার বইটি প্রকাশিত হয়। এটি বিনোদিনী উৎসর্গ করেছিল তার মেয়েকে। উৎসর্গ-পত্রে লেখা ছিল 'আমার স্বর্গগতা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা কন্যা শ্রীমতী শকুন্তলা দাসীর উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তক অর্পিত হইল। মৃত্যু-তারিখ, সন ১৩১০ সাল, ২৭শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার।'

গিরিশবাবু পরে আরও দু-তিনবার এসেছিলেন। বিনোদিনীকে তিনি ওর নাট্যজীবনী লিখতে বলেন। তাঁর বিশেষ অনুরোধে এক সময় বিনোদিনী লিখতেও আরম্ভ করে। বিনোদিনী এ-বিষয়ে মন্তব্য করেছে, 'তিনি ইহার প্রতি ছত্র প্রতি লাইন দেখিয়া শুনিয়া দেন। তিনি দেখিয়া ও বলিয়া দিতেন মাত্র। কিন্তু একছত্র কখনো লিখিয়া দেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, আমি সরলভাবে সাদা ভাষায় যাহা লিখি, তাঁহার নিকট সেই সকল বড় ভালই বলিয়া মনে হয়।'

কিন্তু তার আগে নাট্য জগতের কিছু কথা আছে। মেয়ের মৃত্যুর পর এসব কথা আর বেশি দিন হয় নি, কিন্তু রাঙাবাবু জানতেন রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গমঞ্চের কথা বিনোদিনীর কতো প্রিয়। মুখে 'না—না' করলেও ভিতরে ভিতরে সে উৎসুক হয়ে থাকতো। রাঙাবাবু তা বুঝতেন, বিশেষ করে তাকে মেয়ের চিন্তা থেকে দূরে রাখবার জন্য আরও বেশি ক'রে বিষয়গুলির অবতারণা করতেন।

ওদিকে চুনিবাবু নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার দেখা করলেন অমরবাবুর সঙ্গে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর অমরবাবুর রাগ পড়লো। মিনার্ভা থিয়েটারের ভার দিলেন চুনিবাবুর ওপর। নিজে রইলেন নিজের কাজে, চুনিবাবু থিয়েটার চালাবেন আর মাস-মাস পাঁচশো টাকা ভাড়া বাড়িওয়ালাকে পৌঁছে দেবেন, এই হলো সর্ত। কিন্তু ক্লাসিক যেমন চলছে, তেমনি চলছে ষ্টার,—প্রতিযোগিতায় মিনার্ভা পারবে কেন? বিক্রি এতো কম যে দানীবাবুর মতো অভিনেতার ভাগ্যেও চল্লিশ টাকা জুটলো না। তাই বিরক্ত হয়ে দানীবাবু আবার চলে এলেন ক্লাসিকে। চুনিবাবু অমরবাবুর কাছ থেকে মনোমোহন গোস্বামীর দুখানা নাটক নিলেন মিনার্ভার জন্য,—'সংসার' ও 'মুরলী'। ক্লাসিক থেকে মনোমোহন গোস্বামীকেও অমরবাবু পাঠিয়ে দিলেন মিনার্ভায়। কিন্তু তবু চললো না মিনার্ভা। জুন মাসে গিরিশবাবু ওখানে একরাত্রি 'প্রফুল্ল'-এ যোগেশ সেজে এলেন, তবুও ভাগ্যলক্ষ্মী সদয় হলেন না। ৩০শে

এপ্রিল ক্লাসিকে অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের 'সৎনাম' খুললেন। এতে 'গুলসানা'-র ভূমিকায় প্রমদাসুন্দরীর নামবার কথা ছিল। কিন্তু তার আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে ভূমিকাটি দেওয়া হয় রাণীসুন্দরীকে। সৎনামে আওরঙ্গজেব-দানীবাবু রণেন্দ্র-অমরেন্দ্রনাথ, বৈষ্ণবী-কুসুমকুমারী, মোহান্ত-পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ফকিররাম হরিভূষণ ভট্টাচার্য প্রভৃতি। কিন্তু চতুর্থ রজনীতে 'উত্তেজিত মুসলমান জনতার আপত্তিতে অমরেন্দ্রনাথ সৎনাম বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন।' ৪ঠা জুন খোলা হলো রামলাল বন্দোপাধ্যায়ের 'পেয়ার।' নাম-ভূমিকায় কুসুমকুমারী, রূপরাজ-অমরবাবু, বিজলী-হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকি), কেতকী-রাণীসুন্দরী। সর্বেশ্বর-নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রভৃতি।

এখানে বলা কর্তব্য, ক্লাসিকে 'যশোহর লক্ষ্মী' করবার পরই তিনকড়ি থিয়েটার ছেড়ে দেয়। তার শরীর ভেঙে পড়তে আরম্ভ করে। ডাক্তারদের মতে, সেরে উঠতে হলে তাকে চিরকালের মতো থিয়েটার ছাড়তে হবে। রাত্রি-জাগরণ তার শরীরে আর সইবে না।

ওদিকে দুটি থিয়েটার চালাতে গিয়ে ও নানান লোকের চক্রান্তে অমরবাবু বিপুল খরচান্ত হয়ে পড়লেন। প্রথমেই তার হাত থেকে চলে গেল মিনার্ভা। ১৯০৪ সালেই মিনার্ভা চলে এলো মহেন্দ্রকুমার মিত্র ও মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের হাতে। মহেন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রকে অধ্যক্ষ করে নিয়ে এলেন ক্লাসিক থেকে মিনার্ভায়। এখানে এসে গিরিশবাবু ডেকে আনলেন তিনকড়িকে। গিরিশবাবু ডাকলে তিনকড়ির 'না' বলার উপায় ছিল না। সে এসে 'সীতারাম'-এ শ্রী, সিরাজদ্দৌলায় 'জহরা', এবং নতুন নাটক 'দুর্গাদাস'-এ যশোবন্তের পত্নীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

ক্লাসিকে ১৯০৪ সালে অমরবাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের দুটি নাটক (তরণী সেন ও বিক্রমাদিত্য) করলেন। তারপর করলেন ঐ সালেরই ২৭শে নভেম্বর রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি।' এতে মহেন্দ্র—অমরবাবু, বেহারী—মনোমোহন গোস্বামী, বিনোদিনী—কুসুমকুমারী, আশা—হরিসুন্দরী, (ব্ল্যাকি), অন্নপূর্ণা—জগত্তারিণী, রাজলক্ষ্মী—পান্নারাণী। ২৫শে ডিসেম্বর করলেন নিত্যবোধ বিদ্যারত্নের, 'প্রেমের পাথার।' ১৯০৫-এর ২১ জানুয়ারি করলেন সেক্সপীয়রের 'Comedy of Errors' অবলম্বনে 'কোনটা কে?' কিন্তু নানান গোলমালে এপ্রিল মাসে 'ক্লাসিক' ছাড়তে বাধ্য হলেন অমরেন্দ্রনাথ। তারপরে হ্যারিসন রোডের ওপর 'কার্জন রঙ্গমঞ্চ'-এ গিয়ে খুললেন গ্র্যাণ্ড থিয়েটার। এখানে মনোমোহন গোস্বামীর 'পৃথিরাজ' ও নিজের লেখা 'ঘুঘু' মঞ্চস্থ করলেন। কুসুমকুমারী ছিলেন, ছিলেন চুনিবাবু। জুলাইতে খুললেন অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'বাপ্পারাও', আর ১৬ই অক্টোবর 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ।'

ওদিকে ক্লাসিকের রিসিভার অতুলচন্দ্র রায় অমরবাবুকে আবার নিয়ে এলেন ক্লাসিকে। এখন তিনি মালিক নন, কর্মচারী। গ্র্যাণ্ড থেকে চুনিবাবু ছাড়া সবাই এলেন। চুনিবাবু ২১শে অক্টোবর গ্র্যাণ্ডে 'প্রতিফল' নাটক খুললেন তাতে তিনকড়িকে এনে 'জুমেলা'র ভূমিকা দিলেন, তাতেও গ্র্যাণ্ড চললো না। অমরবাবু ক্লাসিকে সুরেন্দ্রনাথ বসুর প্রহসন 'হলো কী' মঞ্চস্থ করলেন। প্রস্তাবনায় অমরবাবুরই লেখা গানটি খুব জমতো। গানটির আরম্ভ—'বল ভাই বন্দেমাতরম / চার কোটি ভাই চার কোটি বোন—আমরা কি কেউ কম?' অমরবাবু এরপর 'প্রণয় না বিষ', 'এসো যুবরাজ' করে ১৯০৬ সালের ২৭শে জানুয়ারিতে গিরিশবাবুর সিরাজদ্দৌলা খুললেন। নামভূমিকায়—অমরবাবু, ঘেসেটি—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকি), জহরা—কুসুমকুমারী প্রভৃতি। মিনার্ভাও ঐ রাত্রে 'সিরাজদ্দৌলা' করলো নামভূমিকায় দানীবাবুকে নামিয়ে। করিম—গিরিশচন্দ্র, মিঃ ড্রেক—অর্ধেন্দুশেখর, ঘেসেটি—তিনকড়ি, লুৎফন্নেশা—সুশীলাবালা। জহরা—তারাসুন্দরী।

তারাসুন্দরী, সুশীলাবালা আগেই এসেছিলেন মিনার্ভায়। সিরাজদ্দৌলার আগের উল্লেখযোগ্য বই গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' (৮ এপ্রিল ১৯০৫)। গিরিশচন্দ্র —করুণাময়, রূপচাঁদ - অর্ধেন্দু, দুলালচাঁদ—দানীবাবু, কিশোর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মোহিত—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, রমানাথ—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), ধনশ্যাম—মনীন্দ্র মণ্ডল (মণ্টুবাবু) সরস্বতী—তারাসুন্দরী, জোবি—সুশীলাবালা ইত্যাদি। তারাসুন্দরীর সরস্বতী দেখবার মতো অভিনয় ছিল মেয়েদের মধ্যে, আর ছিল সুশীলার অভিনয় ও গান। তার গলায় 'উলু নয় ও রোদনধ্বনি' গানটি শুনে দর্শকদের চোখে জল আসতো। বলিদানের পরে ও সিরাজদ্দৌলার আগে মিনার্ভায় অভিনীত হলো ষ্টারের দেখাদেখি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'রাণা-প্রতাপ।' ষ্টারে—মেহের উন্নিসার ভূমিকায় কিন্নরকণ্ঠী নরীসুন্দরী, মিনার্ভাতেও কিন্নরকণ্ঠী সুশীলাবালা। তারপরে ১৯০৫-এ হলো সিরাজদ্দৌলা। ১৯০৫ সালে ওরা জানুয়ারি মনোমোহন গোস্বামীর 'সংসার' আর চুনিবাবুর অপেরা 'নসীব' মঞ্চস্থ হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারি দুর্গেশনন্দিনী। বীরেন্দ্রসিংহ—গিরিশচন্দ্র গজপতি—অর্ধেন্দু, ওসমান—দানীবাবু, জগৎসিংহ—তারকপালিত, বিমলা—তিনকড়ি, আয়েষা—তারাসুন্দরী। ১৫ এপ্রিল বিবাহ-বিভ্রাট, ঝি-র ভূমিকায় তিনকড়ি। ২৮শে এপ্রিল সিরাজদ্দৌলা, এদিন থেকে মিনার্ভায় বৈদ্যুতিক পাখার ব্যবস্থা হয়। ১৬ই জুন খোলা হলো গিরিশচন্দ্রের মীরকাশিম। এতে মীরজাফর—গিরিশবাবু, নামভূমিকায়—দানীবাবু, অর্ধেন্দু—হলওয়েল, হে, মেজর অ্যাডামস্। তারা—তিনকড়ি। এই সময় তারাসুন্দরী আবার চলে গিয়েছিল ক্লাসিকে। সেখানে তাজ্জব ব্যাপার-এ সে নামে পাতখোলাওয়ালীর

ভূমিকায়। এরপরে 'দুর্গাদাস', যে কথা আগেই বলেছি, এতেও সুশীলাবালা গানে ও অভিনয়ে সাফল্যলাভ করে। ওদিকে ১৯০৬ সালের মাঝামাঝি অমরেন্দ্রনাথ গ্রহিনী রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন ও ক্লাসিক ছেড়ে দেন। অতুলবাবু অমরেশবাবু ও তারাসুন্দরীকে এনে ক্লাসিক চালাবার চেষ্টা করলেন, 'তাজ্জব ব্যাপার' হলো, কিন্তু জমলো না। ক্লাসিক উঠে গেল। অমরবাবু একটু সুস্থবোধ করে সেই কার্জন মঞ্চে 'নিউ ক্লাসিক'-এর পত্তন করে কুসুমকুমারী প্রভৃতিদের নিয়ে চালাবার চেষ্টা করলেন। 'কুন্দ' নাম দিয়ে বিষ-বৃক্ষ করলেন, ১০ নভেম্বর হরনাথ বসুর 'স্বর্ণহার' হলো, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ না থাকায় চললো না। অমরেন্দ্রনাথ তখন গুরুতর অসুস্থ। সেই হেমনলিনী। তাঁর অক্লান্ত সেবায় অমরেন্দ্রনাথ যেন নতুন জীবন লাভ করলেন।

এই সময় 'মিনার্ভা' নাট্যজগতের শীর্ষে। বেঙ্গল—মঞ্চে নবগঠিত ন্যাশানাল থিয়েটার চুনিবাবু ও তারাসুন্দরীর সাহায্যে অভিনয় করলেন বটে ক্রমান্বয়ে 'সংসার', 'বঙ্গ বিক্রম', 'সীতার বনবাস', 'তরুবালা', 'প্রভাসমিলন', 'দুর্গাদাস', 'সমাজ',—কিন্তু থিয়েটার সব মিলিয়ে জমিয়ে রাখতে পারলেন না। অমরবাব সুস্থ হয়ে ষ্টারে এসে যোগদান করলেন। ১৯০৭-এর ১৮ই মে ষ্টারে তিনি 'চন্দ্রশেখর'-এ করলেন প্রতাপ। দারুণ জমলো। একদিকে অমরবাবুর প্রতাপ, অন্য দিকে নরীসুন্দরীর দলনী বেগম। তার 'আজু কাঁহা মেরি' গানখানি সে যুগে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এরপর হলো সরলা। অমৃতলাল বসু—নীলকমল, অমরবাবু—বিধুভূষণ, সরলা—কুসুমকুমারী, গদাধর—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। ৯ই জুন প্রতাপাদিত্যে 'রডা' সাজলেন অমরবাবু। ঐ দিন অমৃত মিত্রেরও শেষ অভিনয় প্রতাপাদিত্যের অংশে। পরের সপ্তাহে আর নামতে পারলেন না, তাঁর হয়েছিল ক্যান্সার। ওদিকে ক্লাসিক কিনে নিলেন শরৎকুমার রায়, থিয়েটারের নাম দিলেন 'কোহিনুর'। শরৎবাবু নিয়ে এলেন গিরিশবাবুকে। তাঁর সঙ্গে এলেন দানীবাবু আর তিনকড়ি। মিনার্ভার অবস্থা হলো কাহিল, তাঁরা নিয়ে এলেন অমরেন্দ্রনাথ ও কুসুম-কুমারীকে। পুরানো দুটি নাটকে অভিনয়ের পর গিরিশবাবুর ছত্রপতি শিবাজী খোলা হলো ১৯০৭ সালের ২১শে জুলাই, নামভূমিকায় অমরবাবু, 'সইবাঈ'—কুসুমকুমারী, পুতলাবাঈ—সুশীলাবালা, জীজাবাঈ—প্রকাশমণি। ওদিকে কোহিনুরের উদ্বোধন হলো ১১ আগষ্ট ক্ষীরোদপ্রসাদের 'চাঁদবিবি' নিয়ে। এতে তারাসুন্দরী চাঁদবিবির ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন। তিনকড়ির যোশীবাঈও হতো দেখবার মতো। এরপরে দুই থিয়েটারেই হয় ছত্রপতি শিবাজী। কোহিনুরে শিবাজী সাজলেন দানীবাবু। আর জীজাবাই—তিনকড়ি 'যদি দেশের জন্য প্রয়োজন হয় তাহলে তোমার মায়ের মুণ্ড ছেদন করতেও দ্বিধা

করো না.'—এই সংলাপ যখন তিনকড়ি বলতো, তখন উপেন্দ্র বিদ্যাভূষণের ভাষায়—'দর্শকদের দেহের প্রতি শিরা ও ধমনী পর্যন্ত স্পন্দিত হয়ে উঠতো।' ১৯০৮ সালে কোহিনুরে হলো রাজা অশোক,—এতে 'ধরণী' করবার পরই সে ছেড়ে দেয়। শরৎ রায় মারা যান, তাঁর ভাই চালাতে চেষ্টা করেন, কিন্তু পারেন না। গিরিশবাবু আবার এলেন মিনার্ভায়। তিনি তিনকড়িকে ডাকলেন, কিন্তু সে আর যেতে পারলো না, তার হয়েছিল বহুমূত্র রোগ রাত্রি-জাগরণের ফলে। ডাক্তারদের কঠোর নিষেধে সে আর থিয়েটারে গেল না। শরীর সারাবার জন্য চলে গেল কাশী। শরীর সুস্থ হলে সে যখন ফিরলো, তখন আবার তাকে ডাকাডাকি।

ওদিকে মিনার্ভায় 'শিরীফরহাদ' করার পর অমরেন্দ্রনাথ অর্ধেন্দুশেখরকে মিনার্ভায় নিয়ে আসেন। এ হচ্ছে ১৯০৭ সালের অক্টোবরের কথা। দুর্গাদাস-এর নামভূমিকায় অমরবাবু, রাজসিংহ—অর্ধেন্দু, রাজিয়া—কুসুমকুমারী। এরপরে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'রমাবাঈ' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে অমরবাবু অভিনয় করান 'দলিতা ফণিনী' নাম দিয়ে এই সময় কোহিনুর থেকে গিরিশবাবুকে আনার ব্যবস্থা হয় মিনার্ভায়। অমরবাবু ছেড়ে দেন এবং চলে আসেন আবার ষ্টারে। এখানে আবার 'চন্দ্রশেখর' সরলা ইত্যাদি অভিনীত হতে থাকে। নতুন নাটক (২০ জুন ১৯০৮) সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'খংকিঞ্চিৎ'। ২৭শে জুন অমৃতলাল মিত্র মারা যান। এই শোক সবাইকে স্পর্শ করে। বিনোদিনীও রাঙাবাবুর মুখে খবরটা শুনে চোখের জল লুকোতে পারে না। এই সময় তারাসুন্দরী ছিল কোহিনুরে। নীলদর্পণে তাকে দেখা যায় সাবিত্রীর ভূমিকায়। ১৯০৮ এর ২১শে নভেম্বর রমেশচন্দ্র দত্তের 'জীবনসন্ধ্যা' নাট্যায়িত করে মঞ্চস্থ করেন অমরবাবু। তিনি সাজেন তেজসিংহ, কুসুমকুমারী—ডালিয়া। এতে ছেলেদের দুটি কোরাস গান দারুণ জমতো তার একটির আরম্ভ হচ্ছেঃ মুক্তপ্রাণে যুদ্ধক্ষেত্রে বক্ষোরক্ত করিতে দান। 'লক্ষ লক্ষ বীরপুত্র ব্যগ্রচিত্তে আগুয়ান।' ২৫ ডিসেম্বরে হলো অমরবাবুর নতুন গীতিনাট্য,—'কেয়া মজাদার।' এছাড়া হতে থাকে পুরানো নাটক। নতুন হলো বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত (অমরবাবুরই নাট্যরূপ)—নামভূমিকায় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় আর প্রসন্ন গোয়ালিনী কুসুমকুমারী। ১৯০৯ সালের কথা। ২১ আগষ্ট মনোমোহন গোস্বামীর 'কর্মফল।' মিনার্ভায় কিন্তু ইতিমধ্যে (১৬ মে ১৯০৮) অর্ধেন্দুবাবু অতুলকৃষ্ণ মিত্রের অপেরা তুফানী জমিয়ে দিয়েছেন। ফলে মিনার্ভা পড়তে পড়তেও উঠে দাঁড়ালো। এটি মলিয়েরের নাটক থেকে অনুপ্রাণিত।

কোহিনুর থেকে ১৯০৮ এর ১৯শে জুলাই গিরিশবাবু চলে আসেন মিনার্ভায়। অর্ধেন্দুর শরীর ভালো যাচ্ছিল না, তিনি মিনার্ভা ছেড়ে গেলেন কোহিনুরে। ১৯০৮ এর ৯ই আগষ্ট তিনি কোহিনুরে অভিনয় করতে করতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই যে শয্যা নেন আর উঠতে পারেন না, মারা যান। অমরবাবু ষ্টারে নানান নাটক অভিনয় করাবার ও করবার পর ১৯১১ সালের ২২শে জানুয়ারি ছেড়ে দেন। তিনকড়ি অসুস্থ। মাঝে মাঝে কোনো কোনো মঞ্চে এসে অভিনয় করে। ন্যাশানালে এসে সৎনাম-এর নামান্তর ভারতগৌরব-এ বৈষ্ণবীর ভূমিকায় অভিনয় করে ১৯০৯ সালের মে মাসে। মিনার্ভায় 'য্যায়সা কা ত্যায়সা'তে গরব আর ১৯১১ সালে 'তপোবল'-এ বদরী। মিনার্ভাতে ছিলো তারাসুন্দরী, ছিল সুশীলবালা। সাজাহানে তারাসুন্দরী—জাহানারা, সুশীলা—পিয়ারা। পলিমে তারাসুন্দরী আইরিন (পরে পলিন)—প্রথমে পলিন করতো সুশীলা-বালা। পরে সে ছেড়ে দেয়। চলে যায় বেঙ্গল-মঞ্চে স্থাপিত অমরেন্দ্রনাথের 'গ্রেট ন্যাশানালে।' এখানে রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া'র নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করান অমরবাবু 'জীবনে মরণে' নাম দিয়ে। নিজে সাজেন আরাকানরাজ। (১৭ জুন ১৯১১)। মিনার্ভা ঐদিন খুললেন অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'রকমফের'। এতে জালিম—গিরিশচন্দ্র। তিনি তখন সুস্থ নন, তবু নামলেন। এর পরে মিনার্ভায় হলো (১৯১১তে) চন্দ্রগুপ্ত ও তপোবল। তারাসুন্দরী সাজলো যথাক্রমে হেলেন ও সুনেত্রা। তপোবলে তিনকড়িও নেমেছিলেন বদরীর ভূমিকায়।

এই সময় বিনোদিনীও গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাঁচবার আশা ছিল না। রাঙাবাবু শিয়রে বসে থাকতেন সবসময়। সজল চোখে বলতেন,— কে তোমাকে কেড়ে নেবে আমার কাছ থেকে? আমি জীবিত থাকতে তোমায় কখনো মরতে দেবো না!

ডাক্তার যেখানে জবাব দিয়ে গেছে, সেখান থেকে বেঁচে ওঠা ঐ মানুষটিরই পুণ্যফলে। চার মাস সে শুয়েছিল। দেখতে আসতেন তাকে অমৃতলাল বসু, উপেন্দ্র মিত্র, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। আসতে পারতেন না গিরিশবাবু, তিনিও সুস্থ নন। তবু সেই অবস্থায় বিনোদিনীর 'আমার কথা'র ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। নিজের অসুস্থতা সম্বন্ধে বিনোদিনী লিখে গেছে,—'এইরূপ প্রায় দুই তিনবার হইয়াছিল। দুই তিনবারই তাঁহারই (অর্থাৎ রাঙাবাবুর) হৃদয়ের দৃঢ়তায় মৃত্যু আমায় লইতে পারে নাই। এমনকি শুনিয়াছি অক্সিজেন গ্যাস দিয়া আমায় ১২/১৩ দিন রাখিয়াছিল।...আমার জীবনের কোনো আশাই ছিল না। শত শত সহস্র

সহস্র অর্থ ব্যয় করিয়া, নানাবিধ চিকিৎসা, শুশ্রুষা, দৈবকার্য করিয়া, প্রায় অনাহারে, অনিদ্রায় বহু অর্থ ব্যয়ে দেবতাস্বরূপ আমার আশ্রয়দাতা দয়াময় মহামহিমান্বিত মহাশয় আমায় মৃত্যুমুখ হইতে কাড়িয়া লইলেন।...এই রোগ হইতে মুক্ত হইয়া আমি বৎসরাধিক উত্থান শক্তিহীন হইয়া জড়বৎ ছিলাম।...আমায় চিকিৎসকগণের মতানুযায়ী বহু স্থানে বহু জলবায়ু পরিবর্তন করাইয়া হৃদয়দেবতা আমার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে দান করিয়া গিয়াছেন।'

৮ই জুলাই ১৯১১ সালে গ্রেট ন্যাশানালে অমরবাবু নিজে করুণাময় সেজে 'বলিদান' অভিনয় করান। তাতে 'জ্যোবি'রূপে আবির্ভূত হয় সুশীলাবালা। এই সময় একটা ব্যাপার লক্ষ্যনীয়, কুসুমকুমারীর নাম নেই। এতেও নেই, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাজীরাও'তেও নেই। ২৯শে জুলাই (১৯১১) বাজীরাও এর প্রথম অভিনয়। ঐ দিন ফুটবল মাঠে ইস্ট ইয়র্ককে হারিয়ে মোহনবাগান আই-এফ-এ শীল্ড জিতেছিল। বাজীরাও-এর সপ্তাহ খানেক আগে (২২ জুলাই) মিনার্ভায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর প্রথমে অভিনয় হয়। চাণক্যের ভূমিকায় দানীবাবুর অভূতপূর্ব অভিনয় দেখে দর্শক স্তম্ভিত হয়ে যান। শোনা যায়, হরীন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, 'তিনি রিহার্স্যালেই চাণক্যের যে চিত্র ফুটাইয়া তুলেন, তাতে দ্বিজেন্দ্রলাল অবাক হইয়া গিয়া বলিয়াছিলেন, দেখ দানীবাবু, ভেবেছিলুম যে আমি তোমাকে কিছু শেখাতে পারি। কিন্তু তোমার যে পরিচয় পেলুম, তাতে এইমাত্র বলতে পারি যে, ধৃষ্টতা মার্জনা করো।'

'ষ্টার'-এর অবস্থা তখন কাহিল। আবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে অমরবাবুকে ওঁরা নিয়ে এলেন। ১৯১১-র ১১ই নভেম্বর ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সৎসঙ্গ' খোলা হলো। প্রবোধের ভূমিকায় অমরবাবু, হেমাঙ্গিনী—সুশীলাবালা। গুলজার—রাণীসুন্দরী, সরমা – কোহিনুরবালা ইত্যাদি।

এই ১৯১১ সালেরই এপ্রিল মাসে ঘটেছিল বিনোদিনীর জীবনের চরম দুর্ঘটনা। খুকি চলে যাবার বেদনা রাঙাবাবু ভুলতে পারেন নি। খুকি যখন ছোট ছিল, তার কাছেই বসে পড়তো। একদিন চেঁচিয়ে 'একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল' পড়তে পড়তে হঠাৎ পড়া থামিয়ে খুকি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—বাবা, বাঘের গলায় হাড় ফুটবে কেন? বাঘ তো কোনো দোষ করে নি!

উনি একটু হেসে মেয়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে উত্তর দিয়েছিলেন,- দোষ না করলেও অনেক সময় হাড় ফোটে মা, কিছু করার নেই!

খুকি চলে যাবার পর এই কথাগুলিই ওঁর বারবার মনে পড়তো। ওঁর হাঁপানীর টান তো ছিলই, তার সঙ্গে নানান উপসর্গ দেখা দিতো। অসুখে পড়ে বিনোদিনীর কাছেই উনি থাকতেন। বলতেন, সেরে উঠি! সেরে উঠে তোমার একটা ব্যবস্থা করে যেতেই হবে!

—থাক! ওসব কথা ভাবতে হবে না!

রাঙাবাবু সেদিন সেরে উঠলেন, কিন্তু পরে আবার পড়লেন। এবার অসুখটা হলো মারাত্মক। শেষ পর্যন্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলেন। হাত-পা পড়ে গেল, মুখেও কথা বিলক্ষণ যেতে লাগলো জড়িয়ে। এ-বাড়ি থেকে খোকা আর নায়েবমশাই এসে গিন্নী-মার আদেশে তাঁকে ও-বাড়িতে নিয়ে গেল। বিনোদিনীর ঘর মুহূর্তে ভরে গেল শূন্যতায়। ও-বাড়িতে অন্তিম বিছানায় সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে শুয়ে রইলেন রাঙাবাবু। বিনোদিনীর মন উড়ে যায় ও-বাড়িতে। কিন্তু তার যাবার উপায় নেই। কেউ বলেও না যেতে। গিন্নীর কড়া আদেশে ও-বাড়িতে তার পা ফেলা মানা। তিনি আজ চলে যেতে বসেছেন, ডাক্তাররা সবাই জবাব দিয়ে গেছে। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বিনোদিনী তার খাতায় লিখলো,—'চমকিত হইয়া দেখি, ও মা! আমারই আজ ৩১ বছরের সুখস্বপ্ন ভাঙিয়া যাইল!'

[এইখানে তথ্যের দিক থেকে একটা কথা থেকে যায়। বিনোদিনী লিখেছে,—'৩১ বছরের সুখস্বপ্ন',—অথচ রাঙাবাবুর মারা যাবার তারিখ সে দিচ্ছে,-১৩১৮ সালের চৈত্র মাসের বুধবারের প্রাতঃকালে।' অর্থাৎ ১৯১১-র এপ্রিল মাস। বিনোদিনীর মঞ্চ জীবনের শেষ আর বধূ জীবনের শুরু ১৮৮৬ সাল। তাহলে হয় ২৫ বছর, ৩১ বছর সে লিখলো কেন? তাহলে কি রাঙাবাবুর সঙ্গে প্রথম আলাপের দিনটি থেকে ধ'রে এই হিসাবটা করেছিল সে?]

মালিনী বিনোদিনীকে ভক্তি করতো, শ্রদ্ধা করতো, ভালো বাসতো। সে চোখের জল মুছতে মুছতে ঐ বুধবারের সকালে এসে তার কাছে দাঁড়ালো, বললে,—ও-বাড়ি চলুন।

—যেতে দেবে?

—এই সময়ও দেবে না?

বিনোদিনী উঠলো, মালিনীর পিছনে পিছনে ও-বাড়িতে ঢুকে ওপর তলায় উঠে একটি ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো। সবাই আছে সে-ঘরে, খোকা, খোকার মা, সবাই। সে আজ আর সংকোচ করলো না, বিছানায় স্বামীর পাশে গিয়ে বসলো। শেষ অবস্থা। শ্বাস উঠেছে। কে যেন রাঙাবাবুর কানে কানে বললো,—বাবু! ছোট মা!

তখনো জ্ঞান ছিল। চোখ মেলে তাকালেন। অনেক কষ্টে যেন চিনতে পারলেন। চোখে জল দেখা গেল। ইঙ্গিতে যেন বোঝাতে চাইলেন,—তোমার জন্য কিছুই করে যেতে পারলাম না!

—ও কথা থাক।

তিনি হঠাৎ ডান হাতটা উঠিয়ে কী যেন দেখাতে চাইলেন। ওঠাতে পারছেন না, হাত কাঁপছে, কী যেন একটা দেওয়ালের দিকে দেখাতে চেষ্টা করছেন। তাঁর নির্দেশ বুঝে বিনোদিনী দেওয়ালের দিকে তাকালো। একটি কুলুঙ্গি। তাতে পিতলের ছোট একটি হামা-দেওয়া গোপাল-মূর্তি! বিনোদিনী বুঝলো, তার রাঙাবাবু তাকে কী বলতে চান। সে উঠে গিয়ে ঐ গোপাল মূর্তিটি হাতে নিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে রোল উঠলো কান্নার। রাঙাবাবু মহাপ্রস্থান করলেন।

পরের দিন। বিনোদিনীর বিধবার বেশ, গোপালমূর্তিটিকে হাতে নিয়ে সেই দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

ও-বাড়িতে তখন অন্য দৃশ্য। গিন্নী-মারও বিধবার বেশ। তিনি সরকার মশাইকে ডেকে বলছিলেন, বুঝেছেন তো আমার কথাগুলো? খোকার আমার ভাগ্য ভালো যে, ও-বাড়ির জন্য কোনো উইল—ফুইল লেখবার আগেই ওর বাবার অঙ্গ পড়ে গিয়েছিল! তা না হলে কী হতো বলুন তো? খোকাকে বঞ্চিত করে কত্তো কী লিখে দিতো কে জানে! আপনি যান—ও বাড়িতে গিয়ে বলুন—আজই যেন বেরিয়ে যায়—এখখুনি—এক বস্ত্রে!

সরকার মশাই নত মস্তকে আদেশ পালন করবার জন্য চলে যান। গিন্নী-মা তাঁর ছেলেকে ডাকতে থাকেন,—খোকা কইরে! খোকা!

বিনোদিনীর মহল্লায় অন্য দৃশ্য। সরকার মশাই যা বলবার তাকে তা বলেছেন। বিনোদিনী যাবার জন্য প্রস্তুত, এক হাতে তার লেখার পাণ্ডুলিপি আর বই, অন্য হাতে সেই গোপাল-মূর্তি। অদূরে দাঁড়িয়ে সরকার মশাই, কাছে দাঁড়িয়ে মালিনী ঘনঘন চোখ মুছছিল। বিনোদিনী পা বাড়াতেই সে বলে উঠলো,—এ অন্যায় ছোট-মা! ঘোরতর অন্যায়! ওদের কথায় কেন আপনি যাবেন! এখখুনি! এক বস্ত্রে! না—আপনি যাবেন না!

বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ে—আমি আপনার পায়ে ধরছি ছোট-মা, আপনি যাবেন না!

বিনোদিনী ধীর, শান্ত গলায় বলে,—কী নিয়ে থাকবো! শুধু ভেবেছিলাম, বাবুর কাজকর্ম চুকে যাক, তারপর—

সরকার-মশাই বলে ওঠেন, তা হয় না। আইনে আটকায়। এ বাড়িতে বসে আপনি তাঁর কাজকর্ম করলে একটি দাবি বর্তাতে পারে আপনার। খোকাবাবু তা সইবে কেন?

বিনোদিনী নির্বাক। মালিনী বলে,—সইবে—সইবে! খোকাবাবুকে আমরা চিনি না! তোমরা সবাই মিলে খোকাবাবুকে—

বলে, আঁচলে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলে। বিনোদিনী কাছে এসে ওর পিঠে হাত রাখে সান্ত্বনার ভঙ্গিতে। তারপরে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। মালিনী ডুকরে ওঠে,—ছোট-মা!

বিনোদিনী এক মুহূর্তের জন্য ফিরে তাকায়। মুখে ম্লান হাসি। তারপরে মুখ ফিরিয়ে ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

নিচে নেমে সদর দরজা দিয়ে বার হয়ে ফটকের দিকে চললো বিনোদিনী। মালিনী ওর পিছনে পিছনে নেমে এসেছিল। সে ও-বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগলো।

দেউড়ির একপাশে দাঁড়িয়েছিল খোকা—থামটার আড়ালে। ভিতরের দিক থেকে তাকে দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ-ই তার দিকে চোখ পড়ে যায় বিনোদিনীর। বলে ওঠে,—খোকা!

খোকা এখন কতো বড়ো হয়েছে। ওর ভিতর থেকে সেই ছোট খোকাটি যেন মুহূর্তে বেরিয়ে এসে ওর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। খোকার মুখখানা অন্যদিকে ফেরানো, ডান হাতে একটা থলি, সেটা এগিয়ে দেয় বিনোদিনীর দিকে, বলে,—আপনার দিদিমার বাড়িটাই তো রয়েছে। আর এতে আছে কিছু টাকা। আপনার পাথেয়।

বিনোদিনী বলে ওঠে,—দাও বাবা, দাও! আমার গোপালের হাত থেকে আমার পাথেয় আমি নেবো বই কী!

বলে থলিটা নিয়ে সে ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে চলতে থাকে। খোকা এবার মুখ ফেরায়। অবাক চোখে তার প্রস্থান পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার চোখও কি সজল হয়ে ওঠে?

অনেকটা এগিয়ে যাবার পর একটা ফাঁকা গাড়ি (অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ি) ধরে নেয় বিনোদিনী, তাতে উঠে পড়ে বলে,—চলো কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট।

গাড়ি গিয়ে যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছায়। নেমে, ভাড়া মিটিয়ে বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে দেখে, খোকার বুড়ো এক দারোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে তার ঘরে যারা ছিল, তারা দারোয়ানের নির্দেশে নিচে নেমে এসেছে, জিনিষপত্রও নামানো হয়েছে, এখন ঝাড়পোঁছ চলছে। তার আগের ঘরে গিয়েই শেষ পর্যন্ত বসলো বিনোদিনী। কিছুক্ষণ পরে দারোয়ান তার কাজ শেষ করে সেলাম জানিয়ে চলে গেল! তাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিল বিনোদিনী, খোকা নিজেই তাকে পাঠিয়েছে।

খবর পেয়ে সবার আগে এলেন গিরিশচন্দ্র। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে তাঁর! অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প করলেন। ওর 'আমার কথা'র পাণ্ডুলিপিখানা নিয়ে গেলেন পড়বার জন্য। দিন দুই পরেই গিরিশবাবুর সঙ্গী ও অনুচর অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় এসে হাজির ঐ পাণ্ডুলিপিখানা নিয়ে। বললেন, চমৎকার হয়েছে। কিছু বদলাবার দরকার নেই বললেন। এবার ওটা ছাপতে হবে।

প্রথমে বিনোদিনী রাজী হয় নি, পরে অবিনাশবাবুর পীড়াপীড়িতে রাজী হলো। শুধু বললে, ওঁকে দয়া করে বলবেন, একটি ভূমিকা লিখে দিতে হবে।

গিরিশবাবুর শরীর ভাল যাচ্ছিল না, তবু একসময় তিনি ভূমিকা লিখে নিজে এলেন। থিয়েটারের খবরাখবর আর কে দেবে? রাঙাবাবুই তো নেই। তবু গিরিশবাবুর সঙ্গে কথা বলে অনেক খবর জানতে পারলো বিনোদিনী। তিনি চলে গেলেন একসময়। ভূমিকাটি পড়লো বিনোদিনী মনে হলো সব কথা লেখেননি, আরও কিছু লেখা উচিত। অবিনাশবাবু আসতে তাঁর হাতে ওটা দিয়ে দিলো বিনোদিনী। বললে, বুঝিয়ে বলবেন। নতুন করে লিখে দিতে হবে। আরও বেশি বেশি কথা যেন থাকে ওতে।

কিন্তু নতুন করে ভূমিকা আর লেখা হলো না। ঘটলো ইন্দ্রপতন। ১৯১২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি গিরিশচন্দ্র মহাপ্রয়াণ করলেন। বিনোদিনীর 'আমার কথা' তিনি ছাপা অবস্থায় দেখে যেতে পারলেন না। বিনোদিনীর বয়স তখন উনপঞ্চাশ। রীতিমত প্রৌঢ় বয়স তার।

বিনোদিনীর পুরানো ভাড়াটেরা অনেকে ছিল, আর যারা নতুন, তাদের ওর মা বসিয়ে গিয়েছিলেন। এদেরই একজনের 'রাধা' বলে একটি বারো-তেরো বছরের মেয়ে ছিল। এই মেয়েটা তার খুব বাধ্য হয়ে গেল। সে ওর কাজকর্ম করে দিতো, ওর কাছেই থাকতে লাগলো। বিনোদিনী তার স্বামীর দান গোপাল মূর্তির পুজো করতো। বইটই পেলে পড়তো, আর থিয়েটারের কেউ দৈবাৎ এলে গল্প শুনতো, এ-ছাড়া খবরের কাগজ তো ছিলই।

গিরিশবাবুর মৃত্যুর পর ষ্টার খুললো অমৃতলাল বসুর 'খাসদখল' (৩০ মার্চ ১৯১২) নিতাই—অমৃতলাল বসু, মোহিত—অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, সারদা—অমৃতলাল বসুর পুত্র শশীভূষণ বসু, মাইতি—কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুরেশ—ক্ষেত্রমোহন মিত্র, ডাঃ পাকড়াশী ও কবিরাজ—কার্তিক দে, রুবি—রাণীসুন্দরী, মোক্ষদা—বসন্তকুমারী, গিরিবালা,—সুশীলাবালা, লাবণ্য—কোহিনুরবালা, ইত্যাদি। এই নাটকে 'নিতাই' বেশী অমৃতবসুর 'Is the' শব্দটির প্রয়োগ, সুশীলার গান 'ওগো কেউ বলো না গো ভাতার কেমন মিষ্টি',—আর অমর দত্ত

মশাইয়ের মোহিত বেশী চালচলন ও আবৃত্তি দর্শকদের মনে উম্মাদনার সৃষ্টি করতো। সুশীলার ঐ গানখানা শোনবার জন্য 'এনকোর' ধ্বনিতে বাড়ি ফেটে পড়তো। এক রাত্রে ঐ গানখানা ৭।৮ বার গাইবার পর ক্লান্ত হয়ে সুশীলা গানটি ফের গাইতে রাজী না হওয়ায় অমরবাবু নিজে হাতে ধরে ওকে পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে আসেন। ৮ই জুন অভিনীত হলো রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী।' এর পরে ঘুরে ফিরে চলতে থাকে পুরানো নাটক, নতুন নাটক হলো ১৭ই আগস্ট দ্বিজেন্দ্রলালের 'পরপারে।' এতে সুশীলাবালার 'শান্তা' হয়ে দাঁড়ালো এক অপূর্ব সৃষ্টি! অমরবাবু সাজলেন বিশ্বেশ্বর, বৃদ্ধের ভূমিকা। নরীসুন্দরীও 'হিরন্ময়ী'র ভূমিকা খুব ভালো করেছিল। ১৪ই নভেম্বর ষ্টারে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গনাটক 'আনন্দ বিদায়'-এর অভিনয় অমরবাবুর এক কুকীর্তি। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা দর্শকরা সহ্য করতে পারেন নি দেখে পর রাত্রি থেকেই এটি বন্ধ করে দিতে হয়। ২৫শে ডিসেম্বর হলো রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালপরিণয়'-এর পুনরভিনয়। এতে মনীন্দ্র—অমরবাবু, সারদা—প্রবোধচন্দ্র বসু (দ্বিতীয় রজনী থেকে অমৃতলাল বসু), কালী—সুশীলাবালা, মনু—ছোট সুশীলা, কিশোরী—নলিনী বালা। মোক্ষদা—বসন্তকুমারী। এঁদের দেখাদেখি মিনার্ভাও কালপরিণয় করে। তাতে মোক্ষদা সাজতো তারাসুন্দরী। মিনার্ভায় 'ভীষ্ম' নাটকে তারা সুন্দরীর 'অম্বা' ও 'শিখণ্ডী' অসাধারণ অভিনয়ে চিহ্নিত। ষ্টারে ২৯শে মার্চ হলো মনোমোহন গোস্বামীর 'ধর্মবিপ্লব।' এতে কালাচাঁদ—অমরবাবু, নিরঞ্জন—নাট্যকার স্বয়ং, দুর্গাবতী—নরীসুন্দরী, সুরমা—সুশীলাবালা। ওরা মে অমরবাবুর রঙ্গনাট্য 'কিসমিস।' স্কুলসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—অমরবাবু, রজনীকান্ত—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, রামা—কার্তিক দে, বিলাসবতী—নরীসুন্দরী, লভচাঁদ—সুশীলাবালা (পরে কুসুমকুমারী)। এই সময় মনোমালিন্য হওয়ায় অমৃতলাল বসু নাট্যাচার্য হয়ে মিনার্ভায় চলে যান। মহেন্দ্র মিত্রের অকালমৃত্যুর পর মনোমোহন পাঁড়ে মশাই-ই এখন মিনার্ভার একক মালিক। ১৯১৩ সালের মে মাসে অমরেন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগ হয়। বলা বাহুল্য, ব্যাধিজর্জরিত সময়ে তাঁর পত্নী হেমনলিনীই ছিল তাঁর একমাত্র আশ্রয়। এ আশ্রয় চলে যাওয়ায় শিরে যেন বজ্রপাত হয়েছিল অমরবাবুর।

যাইহোক, কিসমিস নাটক চলার সময় সুশীলাবালাকে ছুটি নিতে হয়। তার জায়গায় নিয়ে আসতে হয় কুসুমকুমারীকে। আসলে, সুশীলাবালা তখন সন্তানসম্ভবা। তার বয়স তখন তিরিশ বছর। দেবনারায়ণবাবু লিখেছেন, 'বেশিবয়সে সে সন্তানসম্ভবা হওয়ায় তাঁর দেহে নানারকম উপসর্গ দেখা দিতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত একটি মৃত সন্তান প্রসব করে সূতিকা রোগে তিনি

আক্রান্ত হলেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই তিনি ষ্টারের অভিনয় আসরে নিয়মিত অভিনয় করতে শুরু করেন। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে বেশিদিন অভিনয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। পুনরায় রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়িনী হয়ে পড়লেন। ১৯১৫ সালের ৩রা জানুয়ারি রবিবার শেষ রাত্রে তিনি সংসার রঙ্গ মঞ্চ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন।'

যাইহোক, ষ্টারে অমরবাবু পুরানো নাটকেরই অভিনয় করতেন বেশি। এক রাত্রিতে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে অমরবাবু জগৎসিংহ সাজলেন, মিনার্ভা থেকে দানীবাবু এসে সাজলেন ওসমান, তিনকড়ি—বিমলা, সুশীলাবালা-তিলোত্তমা। নরীসুন্দরী—আশমানী, আয়েষা—কুসুমকুমারী। নতুন নাটক বা নাটিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি'র নাট্যরূপের অভিনয়। এ'রা নাম দিয়েছিলেন 'অভিমানিনী।' প্রথম রজনীতে হাঁদুবাবু ছিদাম সাজলেও দ্বিতীয় রজনী থেকে অমরেন্দ্রনাথ সাজতে থাকেন। অমরেন্দ্রনাথ 'নাট্যমন্দির' পত্রিকা বার করেছিলেন, এবার (১৯১৪) বের করলেন 'থিয়েটার।' ১৯১৪ সালের ১৫ই আগষ্ট মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহল্যাবাঈ' ষ্টারে অভিনীত হলো। নামভূমিকায় কুসুমকুমারী, গঙ্গাবাঈ—নরীসুন্দরী, মলহর রাও—অমরবাবু। পুরানোর সঙ্গে মিলে হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'জয়দেব'ও এখানে অভিনীত হলো। চুনিবাবু—জয়দেব, অরুণা—কুসুমকুমারী। ৩১শে অক্টোবর ষ্টারে রবীন্দ্রনাথের 'দিদি' অবলম্বনে রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'অকলঙ্ক শশী'র প্রথম অভিনয় হয়। জয়গোপাল—অমরবাবু, শশী—কুসুমকুমারী। সুশীলাবাবা সম্বন্ধে একটু আগে যা লিখেছি, সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে এসেই সে অভিনয়ে যোগ দেয়। অমরবাবুর 'অভিনেত্রীর রূপ'-এ 'দুর্গা'র অভিনয়ই তার শেষ অভিনয়। দর্শকরা এ'কে বলতেন, Divine Sushila। ষ্টারে এরপরে যে উল্লেখযোগ্য নতুন নাটকের অভিনয় হয়, সেটি হচ্ছে 'সাইন অফ দি ক্রশ'। (২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫) ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ। মার্কাস—অমরবাবু, মর্সিয়া—কুসুমকুমারী, নিরো—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, টিজেলিনাস,—মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), সারভিলাস—কার্তিক দে। ষ্টারের সাফল্য দেখে এই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা 'আহুতি'র অভিনয় হয় মিনার্ভায়। তাতে মার্কাস (ভারতীয়করণে নাম—চন্দ্রপীঠ) সাজেন দানীবাবু, নায়িকার ভূমিকায় তারাসুন্দরী।

কয়েক রাত্রি 'মার্কাস' করবার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন অমরবাবু। কিছুদিন পরেই অবশ্য আবার এসে যোগদান করেন। তিনকড়িও অসুস্থ, তবু মাঝে মাঝে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারে না। ১৯১৪-র এপ্রিলে ষ্টারে দেবীচৌধুরাণীতে দেবী, 'থেসপিয়ান টেম্পল'-এ নূরমহল নাটকে যোধাবাঈ (৭।৮।১৯১৫) রূপে তাকে দেখা যায়।

ষ্টারে এই জুন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' হলো, নামভূমিকায় কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, ঔরঙ্গজেব—অমরবাবু, জাহানারা—কুসুমকুমারী। ৩রা জুলাই 'জয়দেব'-এ জয়দেব সাজলেন অমরবাবু। এরপরে ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রথিত সেক্সপিয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' অবলম্বনে 'সওদাগর'-এর অভিনয় হলো ষ্টারে। এতে Shylock বা কুলীরকের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন অমরবাবু। ওদিকে মিনার্ভা নিয়ে আবার গোলমাল, মামলা-মোকর্দমা। মনোমোহন বাবু একটা সুযোগ পেয়ে তখন 'কোহিনুর' কিনে নেন। নাম দেন, 'মনোমোহন থিয়েটার।' উপেন্দ্রনাথ মিত্র মিনার্ভা পেয়ে অমরবাবুকে নিয়ে যেতে চাইলেন। অসুস্থতার জন্য অমরবাবু কিছু সময় চাইলেন। উপেন্দ্রবাবু কিন্তু আর সময় ক্ষেপ করলেন না, অপরেশ মুখোপাধ্যায়কে ম্যানেজার নিযুক্ত করে মিনার্ভায় নিয়ে আসেন। ১৯১৫-র ২রা অক্টোবর দ্বিজেন্দ্রলালের 'সিংহল-বিজয়'-এর উদ্বোধন হয়। তারাসুন্দরী, নরীসুন্দরী, মিঃ পালিত প্রভৃতিরা এসে যোগ দেন অপরেশবাবুর সঙ্গে। এদিকে ষ্টারে জগৎচন্দ্র সেনের 'রাজা চন্দ্রধবজ' এর প্রথম অভিনয় হয়। নামভূমিকায় অমরবাবু, অলকা—কুসুমকুমারী, সাহানা—চারুবালা। ৯ই অক্টোবর হরনাথ বসুর লেখা 'রত্নমঞ্জরী।' নামভূমিকায় কুসুমকুমারী, সনাতন—অমরবাবু। তারপরে ১৬ই অক্টোবর সাজাহানে ঔরঙ্গজেব করবার পর অমরবাবু চুনিবাবুর ওপর সব ভার দিয়ে সুস্থ হয়ে আসবার জন্য কাশী চলে যান। ৪ঠা ডিসেম্বর—সওদাগর। অমরবাবু কাশী থেকে ফিরে এসে 'কুলীরক'-এর ভূমিকায় নামেন। প্রতিভা—কুসুম-কুমারী, যূথিকা আশ্চর্যময়ী। ১২ই ডিসেম্বর সাজাহানে ঔরঙ্গজেব করছিলেন, কিন্তু তৃতীয় অঙ্ক শেষ হবার আগেই তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো, আর অভিনয় করতে পারলেন না। পরদিন চিকিৎসকদের পরামর্শে স্টীমার যোগে গোয়ালন্দ যাত্রা করলেন তিনি। গোয়ালন্দে নেমে, তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে একদিন থেকে প্রবল জ্বর নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। কিন্তু আর সুস্থ হলেন না, ১৯১৬ সালের ৬ই জানুয়ারি তিনি মহাপ্রস্থান করলেন।

অমরবাবুর অভিনয়কে একসময় 'ষাঁড়-চ্যাচানি' অ্যাকটিং বলে কেউ কেউ ব্যঙ্গ করতেন। কিন্তু অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' (১ম খণ্ড)-তে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন অন্য রকম। তিনি দেখেছিলেন অমরবাবুর কুলীরক। লিখে গেছেন, (চোখে), 'ভাসছে সেই দৃশ্যটি, যেখানে তিনি, তাঁর কন্যা গৃহত্যাগ করার পর খালের ওপরকার একটি সাঁকোর ওপর অন্তরাল থেকে আলো হাতে করে উঠে আসছেন। প্রথমে তাঁর মাথা, তারপরে দেখতে পেলাম তাঁর পূর্ণ অবয়ব। এক হাতে আলো, অন্য হাতে লাঠি, সাঁকোর ওপরে উঠে এলেন। গৃহের অভ্যন্তরে ত প্রতিদিনই আলো জ্বলে, আজ তাঁর গৃহতল অন্ধকার

কেন? বুকের ভিতরটা যেন কী এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো তাঁর! নিশ্চয়ই কোনো অঘটন ঘটেছে! সাঁকো থেকে নেমে বারান্দা, তারপরে গৃহদ্বার। সেই দ্বারের দিকে লক্ষ্য করে আর্তনাদ করে বুক-ফাটা ডাক ডেকে উঠলেন কন্যার নাম ধরে,—যূথিকা—যূথিকা! সাড়া নেই। তারপরে সবটাই হলো ওঁর নির্বাক অভিনয়। নেমে গেলেন দরজার কাছে। আবার ফিরে এলেন সাঁকোর ওপরে দেখলেন উৎসুক দৃষ্টি মেলে, এদিক-ওদিক। তারপরে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন সিঁড়ির নিচের ধাপে। ধীরে ধীরে নেমে এলো যবনিকা। আশ্চর্য দেখলাম ওঁর 'টাইমিং'-এর জ্ঞান। নির্বাক অবস্থায় এই যে অভিনয়টুকু করলেন, তাতে যেটুকু যেখানে সময় নেবার প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই নিলেন, কোথাও বাড়তি না, কোথাও কমও না।'

এবার আসি তিনকড়ির কথায়। তার ডায়াবেটিস-রোগের ওপর হঠাৎ হলো কার্বাঙ্কল। মেডিকেল কলেজের বড়ো ডাক্তার অপারেশন করলেন। তারপরে দু-তিন দিন সে একটু সুস্থ ছিল বটে, কিন্তু হঠাৎ ঘটলো স্বাস্থ্যের অবনতি। দুই দিন ভীষণ যন্ত্রনার মধ্যে কাটিয়ে সে চিরতরে চোখ বুজলো। এ ঘটনা ঘটলো ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে। মনোমোহনে 'সাজাহান'-এ 'জাহানারা'ই সম্ভবতঃ তাঁর শেষ ভূমিকা। মহাপ্রাণ ছিল সে। দুখানা বাড়ি ছিল তার। উইল করে একখানা সে দান করলো বড়বাজার হাসপাতালকে, অন্য বাড়িটি তার বাবুর ছেলেকে। আর টাকাকড়ি? নগদ আর অস্থাবর মিলিয়ে মোট যে টাকা হয়, তা তার ভাড়াটে মেয়েদের মধ্যে সমান ভাগ করে দেবার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল।

নরীসুন্দরীর কথা এতক্ষণ বলা হয়নি। নরীসুন্দরী স্টারেই বরাবর থেকেছে, আর্থিক প্রলোভন সত্ত্বেও সে অন্য থিয়েটারে যায় নি। ১৯১১ সালে সে মিনার্ভায় গেল 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে ছায়ার ভূমিকা করতে। ঐ সালেরই ১৮ই নভেম্বর গিরিশচন্দ্রের 'তপোবল'—এ সে 'বেদমাতা'র ভূমিকায় নামে। দুটি ভূমিকাই সে গানে আর অভিনয়ে জীবন্ত করে তুলেছিল। আবার সে ফিরে আসে স্টারে, ১৯১২—১৯১৪ সাল সে স্টারেই থাকে। স্টারে তার শেষ অভিনয় অমরবাবুর 'অভিনেত্রীর রূপ'-এ অপরাজিতার ভূমিকায়। ১৯১৫-তে আবার সে যায় মিনার্ভায় দ্বিজেন্দ্রলালের 'সিংহল বিজয়'-এ 'লীলা'র ভূমিকায় রূপ দিতে। ১৯১৬ সালের পর সে আর নিয়মিত অভিনয় করেনি। মাঝে মাঝে নামতো। অপরেশচন্দ্রের 'বাসবদত্তা' ১৯২১ সালের ১৫ই জানুয়ারি স্টারে মঞ্চস্থ হয়। এতে নরীসুন্দরী অবতীর্ণ হয়েছিল সুসঙ্গীতার ভূমিকায়।

প্রসঙ্গত বলে রাখি, নরীসুন্দরীর শেষ অভিনয় আলফ্রেড মঞ্চে মিত্র থিয়েটারে। বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'শ্রীদুর্গা' নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯২৬ সালের ২রা

এপ্রিল। এর নাম ভূমিকায় 'তারাসুন্দরী'র অনবদ্য অভিনয়, 'পৃথিবী'—রূপিনী নরীসুন্দরীর সুরেলা ও উদাত্ত কণ্ঠের গান, নির্মলেন্দু লাহিড়ীর 'মহিষাসুর' ও একটি হাস্যরসাত্মক ছোট্ট ভূমিকায় (কুটুস) পরবর্তীকালের বিখ্যাত অভিনেতা ও চিত্র-পরিচালক ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় (ডি-জি) কে আজও বর্তমান লেখকের মনে পড়ে। এই অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য তার হয়েছিল। নরীসুন্দরীর এই ভূমিকাই নাট্যজগতে তার শেষ ভূমিকা। তার পরবর্তী জীবন—পুরোপুরি ধর্মজীবন। তিনি মারা যান ১৯৩৯ সালের ১লা জুন তারিখে।

নীরদাসুন্দরীর কথাও এতক্ষণ বলা হয় নি। গিরিশচন্দ্রের 'তপোবল'-এ (মিনার্ভায়) সে ব্রহ্মণ্যদেবের ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তারপরে ১৯১২ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর 'গৃহলক্ষ্মী'তে করে 'ফুলি।' এসময় তারাসুন্দরী ছিল মিনার্ভায়। 'তপোবল'-এ সে করেছিল সুনেত্রা, আর গৃহলক্ষ্মীতে বিরজা। মিনার্ভার 'খাসদখল-এ মোক্ষদা করেও তারাসুন্দরী বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। ১৯১৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর প্রমথ নাথ ভট্টাচার্যের 'ক্লিওপেট্রা'তে নামভূমিকায় তারাসুন্দরী অসামান্য অভিনয়ের স্বাক্ষর রেখেছিলো নীরদাসুন্দরীর এ নাটকের ভূমিকার নাম ছিল 'চারমিয়ান।' এরপর ক্ষীরোদপ্রসাদের আহেরিয়ায় 'কেতু' করে নীরদাসুন্দরী মনোমোহনে চলে যায়। তারাসুন্দরী 'শাস্তি কি শাস্তি' প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে মিনার্ভা থেকে চলে যায় কোহিনুরে, সেখানে 'কালাপাহাড়'-এ 'চঞ্চলা' করে আবার ফিরে আসে মিনার্ভায়। সিংহল বিজয়-এ 'কুবেনী'ও তারার এক সৃষ্টি। এরপরে মিনার্ভায় লর্ড লিটনের 'Lady of Lyons'-এর ছায়াবলম্বনে অপরেশবাবুর লেখা 'শুভ-দৃষ্টি'র অভিনয় হয়। এতে 'ডোরানলিনী' সেজেছিল তারাসুন্দরী। তারপরে অপরেশবাবুরই 'রামানুজ'-এ নামভূমিকায় তারার অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে। এর কিছুদিন পরে তারাসুন্দরী চলে যায় ষ্টারে। ১৯১৬ সালে ২৫শে সেপ্টেম্বর মনোমোহনে দাশরথী মুখোপাধ্যায়ের 'কণ্ঠহার' নাটক অভিনীত হয়েছিল। এতে 'রঙ্গিলা'র চরিত্রে নীরদাসুন্দরী অপূর্ব অভিনয় করেছিল। এখানে বছর খানেক থেকে সে চলে যায় আবার মিনার্ভায়। এখানে 'রামানুজ' -এ নীরদাসুন্দরী করেছিল 'চমাম্বা'র ভূমিকা। এই অভিনয় দেখে শ্রীশ্রীমা সারদা ওকে কাছে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করেন। রামানুজের প্রথম তিন অঙ্কে নাম-ভূমিকায় থাকতো তারাসুন্দরী। পরবর্তী অঙ্ক গুলিতে করতেন হাঁদুবাবু দীক্ষাদানের সময় তারাসুন্দরীর অপূর্ব ভাবপ্রকাশ দেখে মা সারদা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

১৯১৮ সালে মিনার্ভায় ক্ষীরোদপ্রসাদের 'কিন্নরী' অভিনীত হলো ১৭ই আগস্ট। নাম ভূমিকায় অভিনয় করে নীরদাসুন্দরী খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিল। ১৯২১ সালে ম্যাডান কোম্পানী নতুন এক রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এতে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী নট ও পরিচালক রূপে আবির্ভূত হন। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' তিনি মঞ্চস্থ করলেন ১৯২১-এর ১০ই ডিসেম্বর। এতে নীরদাসুন্দরী করলেন 'সুজাতা', পরে এই নাটকে শিশিরবাবুর সঙ্গেই সে 'মীরাবাঈ' ও তারও পরে 'উদিপুরী'ও করেছিলো। শিশিরবাবুর সঙ্গে যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা'তে সে করেছিল 'তুঙ্গভদ্রা।' শিশিরবাবু পরিচালিত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'ভীষ্ম'তেও সে করেছিল 'সত্যবতী।' ১৯২৫ সালে 'নাচঘর' পত্রিকা এই নাটক প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'শ্রীমতী চারুশীলা ও শ্রীমতী নীরদা-সুন্দরীর অভিনয় অপূর্বভাবে উপভোগ্য ও উচ্চশ্রেণীর যোগ্য হয়েছিল।'

এক কথায় নীরদাসুন্দরী সেকালের হয়েও একালের সঙ্গে শিল্পী হিসাবে একাত্ম হতে পেরেছিল।

কিন্তু ও'কে ছেড়ে এবার আমরা আগের কথায় ফিরে যাই। মিনার্ভায় বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের 'মিশরকুমারী' খুব জমাটি নাটক হয়েছিল। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রহসন 'কেলোর কীর্তি'ও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এতে কর্তা—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, মধা—কার্তিক দে, আর রেসের জুয়াড়ি বলে ছোট একটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সন্তোষকুমার দাস (ভুলো)। মঞ্চের ওপর ঘোড় দৌড়ের দৃশ্য দেখান হতো। ভুলো দেখলো তার ঘোড়া বাজী জিতেছে, অমনি সে ভিড় থেকে বেরিয়ে এলো লাফাতে লাফাতে। পকেটে বিস্কুট ছিল, মুখে ফেলেছে সেই বিস্কুট, তাই কথা অস্পষ্ট, কিন্তু উত্তেজনা প্রবল। অহীন্দ্রবাবু লিখেছেন, এই অবস্থায় পকেটে হাত দিয়ে সে তার টিকিট খুঁজছে, কিন্তু টিকিট নেই। কখন যে সে বিস্কুটের সঙ্গে ঐ টিকিটটি চিবিয়ে খেয়েছে তার হদিস নেই। এখন কোথায় পাওয়া যাবে সেই টিকিট? কাঁদতে কাঁদতে মাথায় হাত দিয়ে সে বসে পড়তো। এ-দৃশ্য দারুণ উপভোগ করতেন দর্শক। তাঁদের কাছে তার নামই হয়ে গিয়েছিল 'বিস্কুট-খোকা ভুলো।'

যাই হোক, মিনার্ভাতে পুরানো নাটকই তখন হচ্ছিল বেশি, তার মধ্যে 'মৃণালিনী' ছিল। এই মৃণালিনীতে গিরিজায়ার ভূমিকায় নতুন এক সুধাকণ্ঠী আবিস্কৃত হলো, তার নাম সুবাসিনী। দর্শকরা একে কোকিলকণ্ঠী বলতো, 'মিশরকুমারী'তে বুলা, 'চন্দ্রগুপ্ত'-এ 'ছায়া',—এসব করে অভিনয়ে-গানে সুবাসিনী খুবই নাম করেছিল। এরও গানে দর্শক মহল এনকোর ধ্বনি তুলে বাড়ি ফাটাতো। তখন আর একজন প্রতিভাময়ী গায়িকা ছিলো মনোমোহনে, —আশ্চর্যময়ী। মনোমোহনে তখন দানীবাবু একাই একশো, কিন্তু ১৯১৮তে

'দেবলাদেবী'র খিজির তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি হলেও আশ্চর্যময়ী 'মতিয়া' সেজে গানে একেবারে মাতিয়ে দিতো। মনোমোহনে সুরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'মোগল-পাঠান' খুব জমেছিল। এটির অভিনয় হয়েছিল ১৯১৬ সালে। এতে দানীবাবু-শেরসা, চুনিবাবু—হুমায়ুন, চাঁদ-বসন্তকুমারী, সোফিয়া-শশীমুখী। এই শশীমুখীরও গানের গলা ছিল চমৎকার। মোগল-পাঠানে শশীমুখীর একটি গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল,—'ভেঙে গেছে মোর সোনার স্বপন, ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার। (আজি) হৃদয় ভরিয়া উঠিছে কেবল মরমভেদী হাহাকার।' ১৯১০ সালে অভিনীত ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বাংলার মসনদ'-এর একটি গানও তখন লোকে খুব নিয়েছিল,—'এসো সোনার বরণী রাণী গো, শঙ্খকমল করে। এসো মা লক্ষী, বোসো মা লক্ষী, থাকো মা লক্ষী ঘরে!' মনোমোহনে দানীবাবুর অভিনয়-দীপ্ত আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক অতুলানন্দ রায় রচিত 'পাণিপথ।' এতে দানীবাবুর 'বাবর শা' আর আশ্চর্যময়ীর অন্ধ ফুলওয়ালীর রূপসজ্জায় অনবদ্য গান,—'ওগো দাও, সাড়া দাও, কও কথা কও বরষি আসিয়া শ্রবণে' দর্শক চিত্তে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল।

মনোমোহনে আরও একটি নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৯২০ সালে, সেটি ঐ সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরই লেখা 'হিন্দুবীর।' এছাড়া এখানে যা হতো, সব পুরানো নাটক। এই সঙ্গে 'ষ্টারে'-এর কথাও আসে। অমরবাবুর পর অন্য একজন লিজ নিয়েছিলেন, তার পরে নিলেন গিরিমোহন মল্লিক। এরই আমলে ১৯১৯ সালে অপরেশবাবু ম্যানেজার হয়ে ষ্টারে এলেন। সঙ্গে মিঃ পালিত ও তারাসুন্দরী। এঁরা ১৯১৯ সালের মার্চে ষ্টারে করলেন দেবেন্দ্রনাথ বসু—অনূদিত সেক্সপিয়ারের 'ওথেলো'। ওথেলো—তারকনাথ পালিত, ইয়াগো-অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডেসডেমোনা—তারাসুন্দরী। কিন্তু নাটক ভালো হলেও লোকে তেমন নিলে না। 'কিন্নরী' করতে গেলেন, মিনার্ভার উপেন্দ্র মিত্র মামলা করে ষ্টারকে আর কিন্নরী করতে দিলেন না। অপরেশচন্দ্র লিখলেন,—নাচ গানের নাটক 'উর্বশী।' এটিও জমলো না, গিরিবাবু লিজ ছেড়ে দিলেন, এবারে লেসি হলেন অপরেশবাবু নিজে। ১৯২০ সালে ইবসেনের 'ভাইকিংস'—অবলম্বনে লেখা অপরেশবাবুর 'রাখীবন্ধন' খোলা হলো। বৃদ্ধ-চন্দ্রাবত—মিঃ পালিত, নায়িকা-তারাসুন্দরী। অসামান্য অভিনয় করলেন দুজনে। কিন্তু তবু অর্থাগম হচ্ছে না। অপরেশবাবু লিখলেন, ছিন্নহার, দেবেন্দ্রনাথ বসুর 'কুহকী'ও করা হলো, জমলো না। এবারে অপরেশবাবু লিখলেন, 'অযোধ্যার বেগম।' শ্রেষ্ঠাংশে তারাসুন্দরী। মীরকাশিম—চুনিলাল দেব, সুজাউদ্দোলা—লক্ষীকান্ত মুখোপাধ্যায়, হাফেজ

রহমৎ—অপরেশবাবু। এছাড়া নতুন দুজন অভিনেত্রী, 'ছায়া'—কৃষ্ণ ভামিনী, 'জিন্নাৎ'—নীহারবালা। পরবর্তীকালে এই নতুন দুজন প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিল।

এতসব থিয়েটার হচ্ছে, বিনোদিনী রয়েছে থিয়েটার পাড়ায়, অথচ কোনো থিয়েটারে তাকে দেখা যায় না। নিজের মনে গোপালের সেবা করে কাটায়, এমন সময় কে দুটি মেয়ে এসে তাকে একেবারে প্রণাম করলো। বড়টির হাসি-হাসি মুখ। কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল বিনোদিনীর। সে মেয়েটি বললে, মা, আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি তারা। তারাসুন্দরী, এ মেয়েটি আমার সঙ্গে অভিনয় করে। কৃষ্ণভামিনী। বিনোদিনী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, তাকে এমন করে খুঁজে বের করবে কে? এক অবিনাশবাবু ছাড়া কেউ খোঁজ নেয় না তার। তারা বললে,—অনেকদিন ধরেই আসবো-আসবো করছি, সময় পাইনি। এখন আমি ষ্টারে, 'অযোধ্যার বেগম' করছি। আসুন না একদিন? আমি আপনাকে এসে নিয়ে যাবো।

চমকে উঠলেন বিনোদিনী,—সেই ষ্টার! অবশ্য নামটাই ষ্টার, হাতিবাগানের ষ্টার তার সেই ষ্টার নয়।

যাই হোক, তারাসুন্দরী এক দিন সত্যিই বিনোদিনীকে ধরে নিয়ে গেল ষ্টারে। কী আশ্চর্য! কেউ ওরা ওকে ভোলেনি। মেয়েগুলো সব এসে টিপ টিপ করে প্রণাম করতে লাগলো। বহুদিন পরে অভিনয় দেখলো বিনোদিনী, তারাকে বললো—খুব ভালো হয়েছে। লোকে নেবে।

ফলেছিল বিনোদিনীর কথা। এই সঙ্গে কর্ণওয়ালিস মঞ্চে শিশিরকুমার ভাদুড়ী নামলেন ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নিয়ে। তিনি নিজে নাম-ভূমিকায়, উদিপুরী—কুসুমকুমারী, কামবক্স—নতুন একটি সুদর্শন যুবক—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্লা দিয়ে দুটি থিয়েটারই চলতে লাগলো বলে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী। তবে অপেক্ষাকৃত তরুণেরা 'আলমগীর'-এই ভিড় করতে লাগলো বেশি।

১৯২২-এর বিরাট খবর, মিনার্ভা পুড়ে গেছে। প্রেক্ষাগার একেবারে বিধ্বস্ত অনেকেই বললে, বিজলিবাতি ফিউজ হয়ে এই কাণ্ড ঘটেছে। থিয়েটার জগতের এ-এক প্রচণ্ড ক্ষতি। মিনার্ভা সম্প্রদায় বেরিয়ে গেলো বাইরে অভিনয় করতে। ষ্টারে নতুন লেসি হয়েছে 'আর্টথিয়েটার লিমিটেড।' এঁরা অপরেশবাবুকে নাট্যাচার্য রেখে নিয়ে এলেন সব নতুন দল। তারাসুন্দরী আগেই চলে গিয়েছিল থিয়েটার ছেড়ে ভুবনেশ্বরে তার নির্মিত আস্তানায়। সুতরাং কে আর আগ্রহ করে ষ্টারে নিয়ে আসবে বিনোদিনীকে, একষট্টি বছরের বৃদ্ধাকে? ষ্টারে খোলা হলো নতুন ভাবে অপরেশবাবুর লেখা 'কর্ণার্জুন, এতে তিনকড়ি চক্রবর্তী

—কর্ণ, অহীন্দ্র চৌধুরী —অর্জুন, নরেশ মিত্র শকুনি, ইন্দু মুখোপাধ্যায় —শ্রীকৃষ্ণ, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়—দুঃশাসন, কালীপ্রসন্ন পাইন—দ্রোণাচার্য, দ্রৌপদী—নিভাননী, নিয়তি—নীহারবালা, পদ্মা কৃষ্ণভামিনী, কুন্তী—মনোরমা, বিকর্ণ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যুধিষ্ঠির হেমেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, পরশুরাম—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিদুর—জানকীনাথ বসু, ভীম—ননীগোপাল মল্লিক প্রভৃতি। অভিনয়ের তারিখ: ৩০শে জুন ১৯২৩ সাল। নতুন এই দলের আবির্ভাবের পূর্বে পুরাতন ষ্টারের শেষ অভিনয় হয়েছিল অপরেশবাবুরই লেখা 'সুদামা'। নাম ভূমিকায় ছিলেন মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু), শ্রীকৃষ্ণ—কৃষ্ণভামিনী, রুক্মিনী—নীহারবালা। যাইহোক, 'কর্ণার্জুন' ষ্টারে দারুণ জমে গিয়েছিল। এই নাটকের কুন্তীর ভূমকাটি ছিল জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' (১ম খণ্ড) বইতে লিখে গেছেন, 'কুন্তী হবেন চিরযৌবনা, এবং অর্জুন ও কর্ণ, এই দুই পরস্পরবিরোধী আত্মজের জন্য মাতৃ-হৃদয়ের যে মর্মবেদনা ফল্গুর মতো অন্তরের অন্তরাল দিয়ে বয়ে চলেছে তা বেশ সুন্দর ভাবেই ফুটিয়ে তুলতে হবে তাঁকে এবং তা আদৌ সহজসাধ্য নয়।····· কর্তৃপক্ষেরা স্থির করলেন, 'কুন্তী'র জন্য তারাসুন্দরীর কাছে গিয়ে প্রস্তাব করা যাক। কিন্তু একটা অন্তরায় ছিল সরাসরি তাঁর কাছে গিয়ে প্রস্তাব করবার পক্ষে। ষ্টার ভেঙে গিয়ে নবরূপে এই যে 'আর্ট থিয়েটার' গঠিত হলো, এর জন্য তাঁর মনে ছিল এক প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধ। কেন না, তিনি ছিলেন ষ্টারের অন্যতম সংগঠনকারিনী।...তিনি তখন গিয়ে বাস করছিলেন ভুবনেশ্বরে। পত্রযোগে আহ্বান জানালে পাছে তা প্রত্যাখ্যাত হয়, তাই কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করলেন স্বয়ং অপরেশচন্দ্রকে যেতে।'

কিন্তু অপরেশবাবু তারাসুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এলেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আর নামলেন না। অপরেশচন্দ্র তখন খবর দিলেন মনোরমা অর্থাৎ 'ক্যাপ্তেন মোনা' কে। অহীন্দ্রবাবু লিখেছেন, 'কাপ্তেন মোনার নাম আসলে মনোরমা, মনোরমার দিদিমা ছিলেন পয়সাওয়ালা মানুষ। তদুপরি মনোরমা নিজেও অনেক টাকা করেছিলেন বহু রাজা-মহারাজাদের সেবা করে, কিন্তু এ-টাকা সে দু-হাতে ব্যয় করতো বলে তার নামের আগে 'কাপ্তেন' শব্দটি যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। মিনার্ভায় আগে সে অভিনয় করতো।···এলো সে। দেখলাম 'হ্যাঁ, সুন্দরী। ঈষৎ স্থূলতা এলেও সে সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যায় নি।'

যাইহোক, দীর্ঘদিন ষ্টারে এই 'কর্ণার্জুন' চলে এক অভূতপূর্ব রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। অর্জুনের ভূমিকা করতেন অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁর প্রস্তুতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, 'পতন ও মূর্ছা কথাটা উচ্চারণ করা যত

সহজ, দেখানোর ব্যাপারটা তত সহজ নয়। এবং আমার মতে, অবহেলার কস্তুও নয়। অবশ হয়ে, অর্থাৎ সর্বাঙ্গ শিথিল করে অপূর্ব পড়ে যাওয়ার একটি দৃশ্য আমি দেখেছিলাম—দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় সামাজিক নাটক 'বঙ্গনারী'তে। অবশ্য অনেকদিন আগেকার কথা ১৯১৬ সালের কথা—ঐ মিনার্ভাতেই। পরিবারের প্রথমা কন্যা বিনোদিনীর ভূমিকায় নেমেছিলেন তারাসুন্দরী। বিনোদিনী ছিল বালবিধবা এবং সুন্দরী। তার ওপরে দৃষ্টি পড়ে একজন প্রৌঢ় ধনী ব্যবসাদারের—নাম তার যজ্ঞেশ্বর। বিনোদিনীর জ্যেঠামশাই ছিলেন যাকে বলে এক ভক্ত-বিটেল গুরু। তাঁকে টাকা খাইয়ে কৌশলে একদিন যজ্ঞেশ্বর উক্ত ভক্ত-বিটেলেরই বাড়িতে বিনোদিনীকে আনাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঐ জ্যেঠামশাই নিজেই বিনোদিনীকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসে, ঘরে বসে কথা কইতে কইতে হঠাৎ বাইরে গিয়ে ঘরের শিকল দিয়ে দিলেন। বিনোদিনী আর্তস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন, দরজায় ঘা মারতে লাগলেন। এমন সময় সেই দরজা দিয়েই প্রবেশ করলেন যজ্ঞেশ্বর, ঘরের দরজায় খিল এঁটে দিলেন। অত্যাচারীর সামনে ভয়ে কাঁপতে লাগলো বিনোদিনী। যজ্ঞেশ্বর ওর হাত ধরে টানলেন, বিনোদিনী এগিয়ে গেলো দু-পা। তারপরে একটা লতাকে হঠাৎ কেটে দিলে যেমন সে ধীরে নেতিয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি করে নেতিয়ে পড়লেন তারাসুন্দরী। যজ্ঞেশ্বর সাজতেন নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। নগেন্দ্রবাবুর হাতের ওপরে অবশ্য ওর দেহের কতখানি ভার ছিল জানি না। কিন্তু এমন সাবলীল ভাবে প'ড়ে যাওয়া রুদ্ধশ্বাসে প্রত্যক্ষ করবার মতো। সারা শরীরের ওপর অদ্ভুত কণ্ট্রোল, সর্বাঙ্গ শিথিল করে দেবার অপূর্ব ভঙ্গিমা! দেহের সমস্ত পেশী আর স্নায়ু রীতিমত আয়ত্তে।'

এই কর্ণার্জুনে ছোট একটি মেয়ে 'বৃষকেতু' সাজতো। মেয়েটির নাম ছিল তারকবালা। খুব ছটফটে ছিল মেয়েটি। থিয়েটারের আগে যখন স্টেজ-লাইট প্রভৃতি ঠিকঠাক করছে কর্মীরা, তখন সে এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়াতো। হাতের কাছে পেয়ে তাকে স্টেজে দাঁড় করিয়েই লাইটের লোকেরা আলো কোথায় কী ভাবে ফেলবে, তা ঠিক করে নিতো। মূল অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে না ডেকে একে দাঁড় করিয়েই তারা 'লাইটের পজিশন' ঠিক করে নিতো। কিন্তু মেয়েটি তো ছটফটে? তাই দেখা যেতো, এই আছে, এই নেই। তখন লাইটম্যানেরা চেঁচাতো, এই দেখ্‌তো, কোথায় গেল 'লাইটের মেয়েটা' এই 'লাইটের মেয়েটা' 'লাইটের মেয়েটা' করতে করতে তার নামই হয়ে গেল 'লাইট।' উত্তরকালে সে যখন বড়ো হলো আর নাম করা অভিনেত্রী হলো, তখন তার নাম লেখা হতো 'তারকবালা (লাইট)' অথবা 'মিস লাইট।'

বৃষকেতুর মস্তক-ছেদনের একটি ট্রিকসিন ছিল কর্ণার্জুনে। আসল বৃষকেতু মিস লাইট, আর নকল বৃষকেতু অপেক্ষাকৃত আরও ছোট একটি মেয়ে। অহীন্দ্রবাবু লিখেছেন, 'সামনে আসল বৃষকেতু। পিছনে নকল বৃষকেতু আছে বসে। মুহূর্তের অবসরে চেয়ার শুদ্ধ (রিভলভিং চেয়ার) বৃষকেতুরূপী মিস লাইটকে দেওয়া হতো ঘুরিয়ে ; সে চলে যেতো পর্দার আড়ালে, আর পেছনে সাজানো থাকতো যে নকল বৃষকেতু, সে এসে পড়তো সামনে। এই নকল বৃষকেতুকে এমনভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল যে, তার শরীরটা ঢেকে মাথার ওপরে একটা পুতুল-বৃষকেতুর মস্তক বসিয়ে দিলে তাকে দেখাবে আসল বৃষকেতুর সমান। এই পুতুল বৃষকেতুর মস্তকটি পেপার-ম্যাপি দিয়ে কুমোরটুলির শিল্পীদের দিয়ে তৈরি করে নেওয়া হয়েছিল। মস্তকচ্ছেদের পর দেখা যেতো, পাঁঠা কাটবার পর ঘাড়ে যেমন থোকা-থোকা মাংস ঝুলে থাকে, ঠিক তেমনি ঝুলে আছে।...নকল বৃষকেতু করা হয়েছিল চারুবালা নামের একটি ছোট মেয়েকে। সন্দেহ ছিল, মুখঢাকা অবস্থায় ঐ গরমে অতটুকু মেয়ে ঠিক বসে থাকতে পারবে কিনা।...কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে ঠিক মতো অভিনয় করে যেতো মেয়েটি। তার হাত-পা ছোঁড়ার কায়দাটিই ছিল দেখবার মতো। ছিন্নমস্তক হয়ে দেহের যে নিঃশব্দ বিক্ষেপ হয়, তাই ফুটিয়ে তুলতো সে যথাযথ। পরবর্তী জীবনে এই ছোট মেয়েটিই নামকরা অভিনেত্রী হয়েছিল। মহানিশার অন্ধ ধীরার ভূমিকাভিনেত্রীই হচ্ছে সেদিনের এই চারুবালা।'

প্রসঙ্গত আর এক গোলাপসুন্দরীর কথা বলে গেছেন অহীন্দ্রবাবু। কর্ণার্জুন চলবার সময় বুধবারে বুধবারে অভিনয় করতে লাগলেন ও'রা স্টারে রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রাণী। এতে তিনি নিজে করতেন কুমার সেন, রাজা—তিনকড়ি চক্রবর্তী, রাণী—কৃষ্ণভামিনী, ইলা—নীহারবালা, রেবতী—গোলাপসুন্দরী (ছোট)। অহীন্দ্রবাবু লিখেছেন, 'গোলাপসুন্দরী এই ছোট ভূমিকাটির মধ্যে যে দৈবতভাব অন্তর্নিহিত ছিল, তাকে বাস্তবিক ফুটিয়ে তুলেছিলেন চমৎকার। বহুদিনের অভিনেত্রী এই গোলাপসুন্দরী।...দেবী চৌধুরাণীর নাম-ভূমিকায় ইনি (একসময়) যে চমৎকার অভিনয় করেছিলেন, তার ফলস্বরূপ তাঁকে দর্শকরা নাম দিয়েছিল,—দেবী গোলাপ!...গোলাপসুন্দরী সম্বন্ধে বসুমতী লিখলেন—'শ্রীমতী তিনকড়ির লেডি ম্যাকবেথের অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা রেবতী-অভিনয়ে তাহার সৌসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইবেন।'

স্টারে ১৯২৪ সালের ১লা জানুয়ারি খোলা হয়েছিল নতুন নাটক 'ইরানের রাণী,' অস্কার ওয়াইল্ডের 'ডাচেস অব পাডুয়া' অবলম্বনে অপরেশবাবুর লেখা। এতে 'ডাচেস' বা 'রাণী'র ভূমিকাটিই প্রধান। করেছিল কৃষ্ণভামিনী। এই কৃষ্ণভামিনী বিনোদিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো। তাকে এনে দেখিয়েছিল

কর্ণার্জুন, পরে 'ইরানের রাণী'।' এতে মিনার্ভা থেকে এসে যোগ দিলো সুধাকণ্ঠী সুবাসিনী 'গুলরুখ'-এর ভূমিকায়। নায়ক দারা ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, বন্ধু—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, কাজী-দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা—অপরেশবাবু, নাদেরসা—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, নর্তকী—নীহারবালা।

এই নাটকে মেয়েদের মধ্যে গানে সুবাসিনী ও নাচে নীহারবালা সুনাম অর্জন করে, তবে বিশেষ খ্যাতির শিখরে ওঠে কৃষ্ণভামিনী। আর্ট থিয়েটার 'ষ্টার'-এর পরিচালনায় আবির্ভূত হবার আগে অপরেশবাবুর নাটক 'অযোধ্যার বেগম'-র কৃষ্ণভামিনীর 'ছায়া' খুব ভালো হয়েছিল। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় নাট্যমঞ্চ' বইতে লিখেছেন 'শ্রীমতী তারাসুন্দরী তাহাকে এই ভূমিকায় নিজ বাড়িতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।' বলা বাহুল্য, তারাসুন্দরী নিজে নামতেন নাম-ভূমিকায়।

পুরাতন 'ষ্টার' নাম বদলে হয়েছিল এমারেল্ড। সে নাম আবার বদলে গিয়ে হয়েছিল প্রথমে ক্লাসিক পরে কোহিনুর। তারপরে 'কোহিনুর' বদলে হলো 'মনোমোহন।' এখানে ১৯১৭ সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পাণিপথ' নাটকে একটি নতুন গায়িকা অভিনেত্রীর প্রতিভার স্ফুরণ দেখা যায়, তার নাম আশ্চর্যময়ী। এঁদের পরের নাটক নিশিকান্ত বসুরায়ের 'দেবলা দেবী'তে দানীবাবুর খিজির খাঁ আর আশ্চর্যময়ীর 'মতিয়া' অসাধারণ অভিনয়ে চিহ্নিত। চুনীলাল দেবের 'আলাউদ্দিন'ও হতো দেখবার মতো।

এর পরবর্তী এখানকার উল্লেখযোগ্য নাটক নিশিকান্ত বসুরায়ের 'বঙ্গে বর্গী।' এতে 'ভাস্কর পণ্ডিত' বেশে দানীবাবু আর মোহনলালের ভূমিকায় ক্ষেত্রমোহন মিত্র বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯২৪-এ এঁরা করেন ললিতাদিত্য। দানীবাবু সম্পর্কে হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর বইতে লিখেছেন, 'স্বপ্নাবেশে শয্যা হইতে উঠিয়া পাদচারণ করিতে করিতে দানীবাবু ললিতাদিত্যের যে অভিনয় করেন, মানসিক দুশ্চিন্তা ও বিবেকের সংগ্রামের যে অপূর্ব ছবি তাহার মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিত, তাহা অপূর্ব।...শশীমুখীর রাণী রত্না এবং আশ্চর্যময়ীর চাঁপাও ত্রুটিহীন হয়।'

এরপরে মনোমোহন পাঁড়ে মশায় থিয়েটার আর না চালিয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী মশাইকে লিজ দেন, দানীবাবুর সঙ্গেও তাঁর চুক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিল, তিনিও তখন বাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য হলেন, যদিও কিছুদিন পরে এসে যোগ দিলেন ষ্টারে।

এখন যেটি 'শ্রী' সিনেমা, সেটি আগে ম্যাডান কোম্পানীর নাট্যমঞ্চ ছিল। এখানে ১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর শিশিরকুমার ভাদুড়ী অধ্যাপনা ছেড়ে প্রথম সাধারণ মঞ্চে এসে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলমগীর' অভিনয়

করেন। নাম-ভূমিকায় তিনি নিজে, উদিপুরী—কুসুমকুমারী—রূপকুমারী-প্রভা, গরিবদাস—নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, রাজসিংহ—প্রবোধ বসু এবং কামবক্স—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পরে স্টারে যোগ দিয়ে কর্ণার্জুনে দুঃশাসন করেছিলেন।

ম্যাডানে বেশিদিন থাকতে পারেন নি শিশিরবাবু। ১৯২৩ সালে ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীতে চার রাত্রি শিশিরবাবু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সীতা' অভিনয় করেন। তিনি নিজে রাম, প্রভা—সীতা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য—বাল্মীকি, ললিতমোহন লাহিড়ী—বশিষ্ঠ সাজেন। এই সীতা নিয়েই তিনি 'মনোমোহন নাট্যমন্দির'—এর উদ্বোধন করবেন কথা ছিল। কিন্তু 'দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়, তিনি যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে 'সীতা' লিখিয়ে নিয়ে এখানে সুসমারোহে অভিনয় করেন। প্রখ্যাত গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এখানে যোগদান করেন. 'সীতা' নাটকে তাঁর গান বিশেষ মনোগ্রাহী হয়েছিল। তবে শিশিরবাবুর 'রাম' আর প্রভার 'সীতা' হতো অতুলনীয়। বাল্মীকির ভূমিকায় চরিত্রোপযোগী অভিনয় করে মনোরঞ্জনবাবুর নামই হয়ে যায় 'মহর্ষি'।'

'কর্ণার্জুন' তখনো চলছে স্টারে। ১৯২৪-এর ২২শে মার্চ এই নাটকের যে অভিনয় হলো, তাতে দুজন সুদক্ষ অভিনেতার মুখ দেখা গেল। 'দুঃশাসন'—রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় (তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় চলে গেছে শিশিরবাবুর কাছে) ও পরশুরাম—নির্মলেন্দু লাহিড়ী।

ম্যাডান থেকে শিশিরবাবু চলে যাওয়ায় সেখানে সিনেমা চালিয়ে ম্যাডানরা তাঁদের থিয়েটার নিয়ে এলেন আলফ্রেড মঞ্চে। অনুসূয়া বলে ওঁদের একটা হিন্দি নাটক ছিল, সেটি অবলম্বন করে হরনাথ বসু লিখেছিলেন 'সতীলীলা।' এই দিয়েই ও'রা আলফ্রেডে ওঁদের থিয়েটার খুললেন। সতীলীলায় মধ্যে ছিল দুই সতীর কাহিনী। প্রথম সতী সাজলেন নরীসুন্দরী, অত্রিমুনি—নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, সতীর কুষ্ঠরোগগ্রস্ত স্বামী—সত্যেন্দ্রনাথ দে। দ্বিতীয় সতীটি হচ্ছেন অনুসূয়া। এই ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করতো মালিনী। তার সঙ্গে আরও একটি অভিনেত্রী নাম করেছিল। অহীন্দ্রবাবু তাঁর বইতে লিখে গেছেন, 'আর একটি নতুন অভিনেত্রীও চোখে পড়বার মতো অভিনয় করলে। অল্পবয়সী মেয়েটি, ছিপছিপে গড়ন, অভিনয় করেছিল একটি চটুল ভূমিকায়। সুন্দর মানিয়েছিল তাকে, তার ওপরে নাচে-গানে লঘু সংলাপে রীতিমত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল ভূমিকাটি। এ'র নাম শ্রীমতী প্রভা, উত্তরকালে যিনি প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী রূপে প্রখ্যাত হয়েছিলেন বাংলার রঙ্গমঞ্চে। ইনিই শিশির বাবুর তখনকার 'সীতা'র 'সীতা।'

১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে স্টার বড়দিন উপলক্ষে একটি একাঙ্ক নাটক করলেন, 'মুক্তির ডাক।' অভিনব নাটক। নাট্যকার মন্মথ রায়। অহীন্দ্র চৌধুরীর ভাষায়

নাটকটির 'নায়িকা হচ্ছেন নগরীর বিখ্যাত নর্তকী, নটী। তাঁর রূপমুগ্ধ রাজা বিম্বিসার তাঁর সতীত্বের প্রতি কটাক্ষপাত করে হাসলেন, বললেন,—তোমার সতীত্ব! তখন নটী (অম্বা) বললেন—হ্যাঁ, আমার সতীত্ব। চমকে উঠো না রাজা। সতীত্ব শুধু দেহের ধর্ম নয়—আমার একনিষ্ঠতাই তার প্রকৃত প্রাণ।' 'অহীন্দ্রবাবুই প্রকৃতপক্ষে এ-নাটকের প্রয়োগকর্তা ছিলেন, যদিও নিজে অভিনয় করেননি। বিম্বিসার—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, সুন্দরম—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে ইন্দু মুখোপাধ্যায়)। অম্বা—কৃষ্ণভামিনী, পদ্মা—নীহারবালা। এ-নাটক ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করলো প্রমথ চৌধুরী, কাজী নজরুল প্রভৃতি বিশিষ্ঠ ব্যক্তির। 'কাগজে কাগজেও বেরুলো অজস্র সুখ্যাতি'—লিখে গেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী।

১৯২৪ সালের ১লা মে কুসুমকুমারী যোগদান করলেন স্টারে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' খোলা হলো বৃহস্পতিবারের নাটক হিসেবে। শনি-রবি চলছে কর্ণার্জুন, বুধবার—ইরানের রাণী। মৃণালিনীতে নাম-ভূমিকায় নীহারবালা, গিরিজায়া—সুবাসিনী, মনোরমা—কুসুমকুমারী। পশুপতি—তিনকড়ি চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র—নির্মলেন্দু লাহিড়ী। পরে বৃহস্পতিবারের নাটক হিসাবে 'কপালকুণ্ডলা'ও খোলা হয়েছিল। নামভূমিকায়—নীহারবালা, মতিবিবি—কুসুমকুমারী, পেশমন—সুবাসিনী,—শ্যামা – নিভাননী, মেহেরউন্নিসা—পান্নারাণী, নবকুমার—তিনকড়িবাবু, কাপালিক—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, চাটুজ্যে—অপরেশবাবু, অধিকারী—অহীন্দ্রবাবু। পান্নারাণী সম্পর্কে অহীন্দ্রবাবু লিখেছেন, 'এই পান্নারাণীও ছিল এক সুগায়িকা, ভবানীপুরের অধিবাসিনী, ভবানী থিয়েটারে অভিনয় করতো এবং গান করতো। পরে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করে।'

অহীন্দ্রবাবু তখন যুবক, সাজতেন যুবকেরই ভূমিকায়, অর্জুন, দারা ইত্যাদি। সেই মানুষ কপালকুণ্ডলায় 'অধিকারী'র রূপসজ্জায় দেখা দিলেন বৃদ্ধের বেশে।

যাইহোক বৃহস্পতিবারের নাটক হিসাবে এরপর এঁরা ধরলেন চন্দ্রগুপ্ত। চাণক্যের ভূমিকায় দানীবাবু, সেলুকাস—অহীন্দ্র চৌধুরী, অ্যান্টিগোনস—ইন্দু মুখোপাধ্যায় (রাধিকানন্দবাবু তখন স্টার ছেড়ে দিয়েছিলেন)। হেলেন—নীহারবালা, মুরা – নিভাননী, ছায়া—সুবাসিনী, কাত্যায়ন—নরেশ মিত্র, আর নাম ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। নন্দ—দুর্গাপ্রসন্ন বসু। বাচাল—সন্তোষ দাস (বিস্কুট খেকো ভুলো) প্রভৃতি। এ-অভিনয়ের তারিখ ১৯২৪-এর ২৪শে জুলাই। দানীবাবুর চাণক্য ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল। অহীন্দ্রবাবু লিখে গেছেন,—'অবাক হতাম বিশেষ করে তাঁর একটি দৃশ্যের

অভিনয় দেখে। চাণক্যবেশী দানীবাবু নন্দকে অভিসম্পাত দিয়ে মঞ্চ থেকে প্রস্থান করছেন। সেইদিন দেখবে আবার এই ব্রাহ্মণের তপস্যার-শক্তি-থেকে শুরু করে আরও পাঁচ ক্রম স্বর তুলে শেষ কথাটি বলে যাচ্ছেন—'ব্রাহ্মণের দুর্ধর্ষ প্রতাপ' ইত্যাদি। এখানে যখন তিনি প্রস্থান করছেন, তখন দেখবার জিনিস এই ছিল যে, তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রস্থান করতেন না। পৈতেটা হাতে করে যখন অভিশাপ দিচ্ছেন, সারা শরীরটা তখন তাঁর থর থর করে কাঁপতো।...ধীরে ধীরে পা টানছেন, কাঁপুনিটা সমানে বজায় রেখে অবশ্য এবং ঐ পা-টানাটা চোখে দেখা যায় না এমনি সাবলীল।'

এরপরে স্টার ধরলো 'প্রফুল্ল।' নাম-ভূমিকায়—নীহারবালা। যোগেশ—দানীবাবু, রমেশ—অহীন্দ্র চৌধুরী, সুরেশ—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভজহরি—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মদন ঘোষ—অপরেশবাবু, কাঙালীচরণ—সন্তোষদাস (ভুলো), জ্ঞানদা—কুসুমকুমারী, উমাসুন্দরী—কোহিনুরবালা, যাদব—ফুল্লনলিনী ইত্যাদি।

'রমেশ' আগে করতেন অমৃতলাল বসু। এ-ভূমিকায় তাঁর সুখ্যাতি ছিল খুব। কিন্তু অহীন্দ্রবাবু তাঁর অভিনয়ে আনলেন নতুনত্ব। এ-বিষয়ে অহীন্দ্রবাবু নিজে লিখে গেছেন :—'উনি (অর্থাৎ অমৃতলাল বসু) করতেন এই রকম : যাদব শয্যায় শুয়ে আছে, মাথার কাছে প্রফুল্ল বসে। যাদবের বালিশের তলায় আলতা ভিজিয়ে নুটি বা গোলা করা থাকতো। যখন রমেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলছে—সরে যা, নইলে তোকে খুন করব! তখন—না যাব না—এই কথা বলে যাদবকে আটকাবার জন্য নিচু হতো প্রফুল্ল। এবং এই সময়েই সেই আলতার নুটিটা লুকিয়ে মুখে পুরে দিতো। রমেশ তখন প্রফুল্লকে ধরে গলা টেপার অভিনয় করেই ঠেলে ফেলে দিতো। দেখা যেতো, প্রফুল্ল যখন মেঝেতে পড়ে গেছে, তখন তার মুখের কস বেয়ে রক্তের ধারা ঝরে পড়ছে।...বরাবর এই ব্যবস্থাটাই চলে আসছে প্রফুল্লর শেষ দৃশ্যে, রমেশ-প্রফুল্লের অভিনয়ে। আমার কিন্তু ব্যাপারটা তেমন মনঃপূত হলো না, আমি চিন্তা করতে লাগলাম। গলা টিপলে মানুষ হয়ত মরে যায়, কিন্তু স্টেজে ওটা ভালো দেখায় কী? 'ভালো' অর্থে যথাযথ। যথাযথ হত্যা করার বিভ্রম সৃষ্টি করা তেমন যায় কি ওতে! অথচ নাটকের দিক থেকে দেখতে গেলে ওখানে একটা আতঙ্কের অনুভূতি দর্শকদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া দরকার। ভাবতে ভাবতে দু-তিন দিনের মধ্যেই একটা কল্পনা মাথায় এলো।'

বলে অহীন্দ্রবাবু actionটার বর্ণনা দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন নীহারবালার নিষ্ঠা ও সহযোগ্যতার কথা। লিখে গেছেন, 'নীহারের অদ্ভুত

গুণ দেখেছি, নতুন কিছু করতে—নতুন কিছু শিখতে ওর উৎসাহের অন্ত ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ও রাজী হয়ে গেল।' অহীন্দ্রবাবু যখন ওঁর গলা টিপে ধরতেন, তখন তাঁর মুখ থাকতো সামনের দিকে, চোখ দুটি বিস্ফারিত, অতি ক্রূর সে চোখের দৃষ্টি, আর নীহারবালার দেহটা ও'র দু-টি হাতে ঝুলতো, খোঁপা ভেঙে এলিয়ে পড়তো, যেন দম বন্ধ হয়ে এসেছে, এমনি ছিল তার অভিব্যক্তি। অহীন্দ্রবাবু ঐ অবস্থায় প্রায় একহাত ওপরে তুলতেন নীহারকে, তারপরে ঐ অবস্থায় ওকে বার দুই-তিন ওঠা-নামা করিয়ে ছেড়ে দেওয়া মাত্রই 'প্রফুল্ল'র নিষ্প্রাণ দেহটা মেঝেতে লুটিয়ে পড়তো। অহীন্দ্রবাবু মন্তব্য করেছেন, 'বাস্তবিকই নীহারের সাহস ও সহযোগিতা না পেলে ঐ এফেক্ট আমি আনতেই পারতাম না।' যাইহোক, ষ্টারের অভিনয়ে সব থেকে সুখ্যাতি পেয়েছিলেন দানীবাবু, অহীন্দ্রবাবু, নীহারবালা আর ফুল্লনলিনী (যাদব)। এই সঙ্গে নির্মলেন্দুবাবু ও অপরেশবাবুরও নাম হয়েছিল খুব।

৩০শে অক্টোবর 'সাজাহান' খুললো ষ্টারে। নাম-ভূমিকায় নরেশবাবুই নামবেন কথা ছিল, কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় হঠাৎ নামতে হলো অহীন্দ্রবাবুকে। আর 'সাজাহান' যে অহীন্দ্রবাবুর একটি অন্যতম সার্থক ভূমিকা সে কথা বলা বাহুল্য। এতে ঔরংজেব—দানীবাবু, দিলদার—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, পিয়ারা—আশ্চর্যময়ী (আশ্চর্যময়ী এবার এলেন ষ্টারে) দারা—তিনকড়ি চক্রবর্তী (পরে প্রফুল্ল সেনগুপ্ত)। জাহানারা—কুসুমকুমারী (পরে রাণীসুন্দরী)। মহামায়া-নিভাননী, সাজাহান—এর ভূমিকায় নতুনত্ব এনেছিলেন অহীন্দ্রবাবু, বিশেষ করে পক্ষাঘাতগ্রস্ত সাজাহান দেখিয়ে। অহীন্দ্রবাবুর নিজের মন্তব্য,—'সেই যে ২৪ সাল থেকে শুরু হয়েছিল, তারপর থেকে গত ৫৭ সাল পর্যন্ত যতদিন আমি থিয়েটার করেছি, কতবার কত থিয়েটারে যে সাজাহান করেছি তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু ঐ আংশিক পক্ষাঘাত দেখাতে কোনদিন ভুল হয় নি আমার।'

'সাজাহান'-এ দানীবাবুর 'ঔরংজেব' ছিল ওঁর নামকরা ভূমিকা, সেই সঙ্গে যুক্ত হলো অহীন্দ্রবাবুর 'সাজাহান।' নির্মলেন্দুবাবুর 'দিলদার'ও উপভোগ্য হতো। সাজাহানের সময়ে দুর্গাদাসবাবু ও কৃষ্ণভামিনী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, ওঁরা থাকলে 'সাজাহান' নাটক আরও ভালো হতো বলে অহীন্দ্রবাবু মনে করতেন।

এই সময় আলফ্রেডে মিনার্ভা-সম্প্রদায় এসে করলে মনোমোহন রায়ের নাটক 'জীবন যুদ্ধ', ভিক্টর হুগোর 'লা মিজারেবল' এর নাট্যরূপ। 'জাঁ-ভালজা'র নাম হয়েছিল 'মেঘনাদ', সেজেছিলেন কার্তিক দে। ইন্সপেক্টর—সত্যেন্দ্র-

নাথ দে, 'বিশপ' বা পুরোহিত—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী।

আলফ্রেডে মিনার্ভা-সম্প্রদায় এই সময় একটি দুই অঙ্কের হাস্যরসাত্মক নাটক খুললেন ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'জোর বরাত।' অহীন্দ্রবাবু লিখেছেন, এই 'জোর বরাত' মিনার্ভার বরাত খুলে দেয় বলা চলে। নাটকটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। দোলগোবিন্দ সেজেছিলেন মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু) আর ব্যারিস্টার ঘটক সেজেছিলেন কার্তিকচন্দ্র দে। এ দুটি ভূমিকা অপূর্ব হয়েছিল। আমোদকুমাররূপী সত্যেন দে মন্দ নয়। কার্তিকবাবু এই অভিনয়ে খুবই নাম করেছিলেন, যেমন তাঁর মেক-আপ, তেমনি মুখে পূর্ববঙ্গীয় ভাষা বলার অপূর্ব ভঙ্গি।'

স্টারে ধরা হলো নতুন নাটক 'বন্দিনী'-একটি ইটালিয়ান অপেরা 'আইদা'-র নাট্যরূপান্তর করেছিলেন অপরেশবাবু। এই নাটকের প্রয়োগ-কর্তাও ছিলেন অহীন্দ্রবাবু। সেনাপতি আমোসিসের ভূমিকাতেও তিনি। কিল্লাদার—অপরেশবাবু, ফারাও—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, মিতানীরাজ—দুর্গাপ্রসন্ন বসু, তাবেজ (ক্রীতদাস)—আশ্চর্যময়ী, রাজকুমারী—রাণীসুন্দরী, নাহেরেম—নীহারবালা বন্দিনী—ফিরোজাবালা (নেনী), দূত—তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

স্টারে ৯ই জানুয়ারি ১৯২৫ সালে খোলা হলো অমৃতলাল বসুর 'সরলা' এতে দানীবাবু তাঁর বিখ্যাত ভূমিকাটিই করলেন, গদাধরচন্দ্র। শশীভূষণ—তিনকড়ি চক্রবর্তী, বিধুভূষণ—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নীলকমল—নরেশ মিত্র, দারোগা—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, ঠানদি—কোহিনুরবালা, শ্যামা—আশ্চর্যময়ী প্রমদা—রাণীসুন্দরী, মুদিনী—ফিরোজবালা (নেনী), গদাধরের মা—সিন্ধুবালা, এবং নাম-ভূমিকায়—কৃষ্ণভামিনী (আরোগ্যলাভ করে সে তখন ফিরে এসেছে)। অহীন্দ্রবাবু এ বইতে নামেন নি, তিনি সবার অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। তিনি লিখেছেন,—'কিন্তু আমার কাছে যেটা প্রভূত বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দেখা দিয়েছিল, সে হচ্ছে কৃষ্ণভামিনীর 'সরলা' কৃষ্ণভামিনী এর আগে বড়ো বড়ো পার্ট করেছে, ভালোভাবেই করেছে, কিন্তু তাতে যেন একটা শেখানো ভাব থাকতো, পূর্বসূরী কোনো অভিনেত্রীর ছাপও পাওয়া যেতো। কিন্তু সরলা দেখে মনে হয়ে ছিল, এ ওর আরেক মূর্তি! সরলার মধ্য দিয়ে ওর অভিনয়ের স্বকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে। অভিনয় শুধু সাবলীলই হয়নি, বলা যায় স্বতস্ফূর্ত 'চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম।'

অহীন্দ্রবাবু প্রসঙ্গত বিনোদিনীর কথাও বলে গেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বিনোদিনী তখন প্রায়ই থিয়েটার দেখতে আসতেন। যথেষ্ট বৃদ্ধা হয়েছেন, কিন্তু থিয়েটার দেখবার আগ্রহটা যায় নি। নতুন বই হলে ত উনি আসতেনই, এক কর্ণার্জুন যে কতবার দেখেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।...কৃষ্ণভামিনী সরলা করে

এসে ওঁর পায়ের ধ্বলো নিয়ে প্রণাম করলেন। উনি ওঁকে আশীর্বাদ করলেন। —কিন্তু কৃষ্ণভামিনীর অমন যে সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন, সে-ও একদিন অকালে গেল মিলিয়ে।—কৃষ্ণভামিনীও বেশিদিন বাঁচে নি, অল্প বয়সেই মারা গেল।'

ষ্টারে এর পরের নাটক ক্ষীরোদপ্রসাদের গোলকুণ্ডা। প্রধান ভূমিকা হাসান—নির্মলেন্দ্ব লাহিড়ী, মীরজুমলা—তিনকড়িবাবু, ঔরঙ্গজেব—অহীন্দ্র চৌধুরী, সেলিমা—সুবাসিনী, মণিজা—রাণীসুন্দরী, আরজমন্দ—কৃষ্ণভামিনী, আহিরন—নিভাননী।

ষ্টারে এবার 'বিষবৃক্ষ' করা হলো। নগেন্দ্রনাথ-দানীবাবু, শিরিশচন্দ্র-নির্মলেন্দু, সূর্যমুখী—কৃষ্ণভামিনী, কমলমণি—রাণীসুন্দরী, দেবেন্দ্র—আশ্চর্যময়ী, কুন্দনন্দিনী—নীহারবালা, হীরা—সুবাসিনী। এতে কৃষ্ণভামিনী অসাধারণ অভিনয় করে। আর করে ঐ দুজন গায়িকা—আশ্চর্যময়ী আর সুবাসিনী। 'নাচঘর' (১৩ই মার্চ ১৯২৫) লিখেছিলেন, 'আর্ট থিয়েটার তাঁদের বিজ্ঞাপনপত্রে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের দুজন শ্রেষ্ঠ গায়িকার যে সঙ্গীত-যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, তাতে মনে হলো যেন জয়মাল্যটা দর্শকেরা সকলেই এই হীরার কণ্ঠেই দুলিয়ে দিতে ব্যগ্র হয়েছেন। আমরা সেদিনের দর্শকদের সুবিচার সম্পূর্ণ অনুমোদন করতে পারি। সত্য সত্যই সেদিন শ্রীমতী সুবাসিনী সঙ্গীত ও অভিনয় এই দুইয়েই নৈপুণ্য দেখিয়ে উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রতিদ্বন্দিনীকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে পেরেছিলেন।'

ষ্টার এরপর অতুলকৃষ্ণ মিত্রের অপেরা 'শিরী-ফরহাদ' করে ধরলেন গিরিশ-চন্দ্রের 'জনা।' তখন শিশিরকুমার ভাদুড়ীও তাঁর নাট্যমন্দিরে 'জনা' খোলবার জন্য তোড়জোড় করছিলেন। ষ্টারে 'জনা' করবে সুশীলাসুন্দরী, কিন্তু নাট্য মন্দিরে করবে কে? শোনা গেল, তারাসুন্দরী। এ-সংবাদে প্রচণ্ড চমক ছিল। তারাসুন্দরীর ছোট ছেলে নির্মল বা খোকা হঠাৎ চব্বিশ সালের শেষের দিকে মারা গেল। এতে প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছিলো তারাসুন্দরী। অহীন্দ্রবাবু লিখেছেন,—'তারাসুন্দরী ছিলেন ঠাকুরের খুব ভক্ত। ভুবনেশ্বরে ঠাকুরের নামে মঠ করে দিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের কাছেই ছিল সেই মঠ। কিন্তু সেখানেও মন নিবিষ্ট হতে চায় না, তাই তিনি ভাবলেন, আবার কাজকর্ম শুরু করবেন, কাজে ডুবে থাকলে যদি সব ভুলে থাকা যায়। ওঁর মনের এই অবস্থাতেই নাট্যমন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ওঁর সাক্ষাৎকার ঘটে থাকবে, এবং তারই ফলে আকস্মিকভাবে ওঁর ঐ নাট্যমন্দিরে যোগদান।'

যাইহোক, ষ্টারে: বিদূষক—দানীবাবু, প্রবীর—অহীন্দ্রবাবু, অর্জুন—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নীলধ্বজ—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, বৃষকেতু—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণ—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, নায়িকা—সুবাসিনী, মদনমঞ্জরী—

নীহারবালা, । আর নাট্যমন্দিরে : প্রবীর—শিশিরবাবু, নীলধ্বজ—নরেশ মিত্র (পরে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য,) শ্রীকৃষ্ণ—রবি রায়, মদনমঞ্জরী—প্রভা, নায়িকা—চারুশীলা। এ বিষয়ে অহীন্দ্রবাবুর মন্তব্য : 'আমি নিজে না দেখলেও শিশিরবাবুর প্রবীর-এর যথেষ্ট সুখ্যাতি শুনেছিলাম। নিজে না দেখলেও কথাটা আমার বিশ্বাসজনক মনে হয়েছিল। কারণ আমি জানতাম শৃঙ্গার-রসাত্মক অভিনয়ে তখনকার দিনে শিশিরবাবুর তুলনা ছিল না।...পরে, এ শক্তি অর্জন করেছিল আমাদের দুর্গাদাস।'

ষ্টার এর পরে 'মেবার পতন' করেছিল, কিন্তু নতুন বই যেটা করলো, সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'—১৮ই জুলাই ১৯২৫ সাল। রসিক—অপরেশবাবু, অক্ষয়—তিনকড়ি চক্রবর্তী, চন্দ্রবাবু—অহীন্দ্রবাবু, পূর্ণ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন—রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, শৈল—সুশীলাসুন্দরী, নৃপবালা—রাণীসুন্দরী, নীরবালা—নীহারবালা, নৃপবালা—ফিরোজাবালা, নির্মলা—নিভাননী, জগত্তারিণী—নন্দরাণী। এ বইটিকে বলা যেতে পারে ষ্টারের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। যেমন চন্দ্রবাবু তেমনি রসিক, তেমনি অক্ষয়, তেমনি পূর্ণ, তেমনি বিপিন ও শ্রীশ। আর মেয়েদের তো কথাই নেই। বিশেষ করে নীহারবালা। গানে-অভিনয়ে একেবারে মাতিয়ে দিতো। অহীন্দ্র-বাবু লিখে গেছেন, 'পরে আরও চিরকুমার সভা হয়েছে, পর পর আঠারো বছর ধরে হয়েছে, কিন্তু ঐরকম গান—ঐরকম প্রাণবন্ত সুষ্ঠু অভিনয় নীহার ছাড়া আর কেউ করতে পারলো না।'

এরপরে এই ১৯২৫-এর ৮ই আগস্ট নতুন বাড়িতে মিনার্ভার শুভ-উদ্বোধন হলো মহাতাপচন্দ্র ঘোষের লেখা 'আত্মদর্শন' নাটক দিয়ে। উপেন্দ্র মিত্রের এ এক অসাধারণ প্রযোজনা। প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করলো এ-নাটক। এ নাটকে গানও অনেক। সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন ভূতনাথ দাস, নৃত্য শিক্ষক—সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু)। উপেন্দ্রনাথের ভাগ্নে কালীপ্রসাদ ঘোষ বইখানির সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন, তিন চার খানি গানও দিয়েছিলেন লিখে। নাটকের প্রধান চরিত্র 'মন-রাজা',—করেছিলেন মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)। বুদ্ধি—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, অহঙ্কার—অমূল্যচন্দ্র দত্ত (পরে মৃত্যুঞ্জয় পাল), মদন ও কাম—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্রোধ—সত্যেন দে, জ্ঞান—কার্তিকচন্দ্র দে, বিবেক—বিখ্যাত গায়িকা আঙুরবালা। রতি—সুবাসিনী, কুমতি—শশীমুখী, সুমতি—আশমানতারা, সুখ—রেণুবালা। এই সুখ করে রেণুবালার নামই হয়ে গিয়েছিল—রেণুবালা (সুখ), দুঃখ—ভবানীবালা, লোভ—সন্তোষ দাস (ভুলো)। বৈরাগ্য—আর এক রেণুবালা। তার নামই হয়ে যায় বৈরাগ্য রেণু। এ নাটকে ছিল গান-নাচ-অভিনয়ের আশ্চর্য

সমাহার। পরে ১৯৩০ এ মিনার্ভায় এসে অহীন্দ্রবাবু নিজেও করেছিলেন 'মনরাজা।'

১৮ই আগস্ট শিশিরবাবু করলেন ভিক্টর হুগোর 'হাঞ্চব্যাক অব নতরদাম' অবলম্বনে শ্রীশচন্দ্র বসুর লেখা 'পুণ্ডরীক।' এতে 'কোয়াসিমোদো'র নাম হয়েছিল কাশীমদ, করেছিলেন গোপালদাস ভট্টাচার্য। বেদিনী নায়িকা রুস্তানা—চারুশিলা, অন্যান্য ভূমিকায় তারাসুন্দরী, নরেশ মিত্র (তখন স্টার ছেড়ে গেছেন) এবং শিশিরবাবু স্বয়ং।

২৮ আগস্ট স্টার করলো পুরানো নাটক চন্দ্রশেখর। নবাব—অহীন্দ্র চৌধুরী। প্রতাপ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নামভূমিকায়—রাধিকানন্দ, লরেন্স ফস্টর—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, শৈবলিনী—সুশীলাসুন্দরী, দলনী—আশ্চর্যময়ী, সুন্দরী—নীহারবালা। ১১ই সেপ্টেম্বর স্টার করলো গিরিশবাবুর গৃহলক্ষ্মী। এতে উপেন্দ্র—দানীবাবু, শৈলেন্দ্র—অহীন্দ্রবাবু, হীরু ঘোষাল—অপরেশবাবু, নীরোদ—রাধিকানন্দ, মদন—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিরজা—সুশীলাসুন্দরী, কুমুদিনী—আশ্চর্যময়ী, তরঙ্গিনী—রাণীসুন্দরী, ফুলি—নীহারবালা। ১৮ই নভেম্বর স্টারে নসীরাম। নামভূমিকায়—দানীবাবু। সোনা—ইন্দুবালা। এঁর গায়িকা হিসাবে খ্যাতি ছিল প্রচুর, তাই তাকে আনা হলো মুখ্যত গানেরই জন্য। ইন্দুবালা আর আঙুরবালা এই দুটি নাম একদা সংগীত-জগতে অন্যতম জনপ্রিয় নাম ছিল। ইন্দুবালার জন্ম ১৮৯৯ সালে। তখনকার বিখ্যাত বাঙালী সার্কাস 'বোসেস সার্কস'-এর মালিক ছিলেন মতিলাল বসু। তাঁর সার্কাসে একটি বাঙালী মেয়ে কঠিন ট্রাপিজের খেলা দেখিয়ে দর্শকদের অভিভূত করতো। তার নাম ছিল ছায়াবালা। ছায়া বালার গানের গলাও ছিল মধুর। মতিবাবু এই ছায়াকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁদেরই সন্তান এই ইন্দুবালা। গিরিশবাবুর 'প্রফুল্ল'তে এক সময় মাতালনীর ভূমিকায় কোন দেশী বিচার গানটি গেয়ে ইন্দুবালা একেবারে আসর মাত করে দিতেন। মিশর কুমারী-তে এক সময় আঙুরবালা যেমন 'অজানা দেশের নীল সরোবরে ফুটে ছিল কোন কমলিনী' গেয়ে দর্শককে বিস্ময়াবিষ্ট করতেন, তেমনি করতেন ঐ গানে ইন্দুবালা। দুজনেই পরে কাজী নজরুলের শিষ্য হয়েছিলেন। প্রাচীনেরা ইন্দুবালার আঠারো বছর বয়সের রেকর্ড-করা একটি গানের কথা হয়ত মনে করতে পারেন (কুমুদরঞ্জন মল্লিকের লেখা)—

'মাঝি তরী হেথা বাঁধবো না কো, আজকের সাঁঝে!

... ...

ঐ নদীর ঐ ঘাটেতে এমন সময় আমার প্রিয়া

যেতো ছোট কলসিটিকে কোমল তাহার কক্ষে নিয়া।

ঐ নদীর ঐ কূলে তটিনীর ঐ কোমল কোলে
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায় আপন হাতে চিতায় তুলে।'

তেমনি আঙুরবালার—
'আমার জীবন নদীর ওপারে'—
অথবা 'আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা
আমি যে পথ চিনি না,—

এই গান দুটি এইত কয়েক বছর আগে প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছিলেন অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত (বিমল কর রচিত) 'ছুটি' ছবিতে। এই গান দুটির রচয়িতা যথাক্রমে বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ও বীরেন চট্টোপাধ্যায় (কারও কারও মতে আঙুরবালা নিজে)।

ইন্দুবালা ও আঙুরবালা উভয়ে মূলতঃ গায়িকা, কিন্তু মঞ্চেও অভিনয় করেছিলেন। ও'দের আমলে বিষবৃক্ষ এর পুনরভিনয়ে ইন্দুবালা 'দেবেন্দ্র' সেজে মঞ্চে এসে যেমন করতেন গান, তেমনি অভিনয়। ইন্দুবালার দেহান্ত হয় ১৯৮৪ সালে, আঙুরবালাও গেলেন কাছাকাছি সময়ে।

তা যা-ই হোক, আমরা আবার আগের কথায় ফিরে আসি।
ডিসেম্বরে ষ্টারে হলো দুখানি নতুন নাটক। একটি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'ঋষির মেয়ে', অন্যটি রবীন্দ্রনাথের গৃহপ্রবেশ (৫ই ডিসেম্বর)। যতীন-অহীন্দ্রবাবু, ডাক্তার—তিনকড়িবাবু, অখিল—কুমার কনকনারায়ণ, মাসী—সুশীলাসুন্দরী, হিমি—নীহারবালা, মণি—সেরাবালা। পরে কবিগুরু যোগ করে দিয়েছিলেন দুটি নতুন চরিত্র, কিশোরী মেয়ে টুকরি, আর বৈষ্ণবী। ফুল্লনলিনী করলো টুকরি আর বৈষ্ণবী—রাজলক্ষ্মী (বড়ো)। ২৫শে ডিসেম্বর হলো 'ঋষির মেয়ে।' এতে আপস্তম্ব—রাধিকানন্দ, অগ্নিবর্ণ—অহীন্দ্রবাবু, উগ্রশ্রবা—দুর্গাপ্রসন্ন বসু, চারু দত্ত—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রায়ুধ—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, অগ্নিবেশ—সন্তোষ সিংহ, সত্যসেন—তুলসী চক্রবর্তী, সুবাহু—মনীন্দ্রনাথ ঘোষ, সৌধিয়ক—বিজয় মুখোপাধ্যায়। শাশ্বতী—সুশীলাসুন্দরী, সুদত্তা—নীহারবালা, চারণী—রাজলক্ষ্মী (বড়ো), বাসন্তিকা—সেরাবালা। এই ২৫ তারিখে মিনার্ভাও খুললো নতুন বই, বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্তের 'সত্যভামা!' নামভূমিকায়—সুবাসিনী।

শিশিরবাবু বড়দিনে কোনো নাটক করেন নি, তবে নভেম্বরে করেছিলেন ক্ষীরোদপ্রসাদের আলমগীর। শিশিরবাবু নামভূমিকায়, তারাসুন্দরী—উদিপুরী, প্রভা—বীরাবাঈ, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী—রাজসিংহ।

১৯২৬ সালের ২০শে মার্চ মিনার্ভা খুললো নতুন নাটক ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙালী'। পারিবারিক নাটক। কর্তা দীনদাস—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, সুখদাস—মন্মথনাথ পাল (হাঁদু বাবু)। রামলোচন—কার্তিক দে, রেণুবালা (সুখ) নামলো পুরুষের ভূমিকায়—বাড়ির ছোট ছেলে। বড়গিন্নী—নগেন্দ্রবালা, ছোটগিন্নী—প্রকাশমণি। ভিখারিণী—সুবাসিনী। এদের সঙ্গে আসমানতারা, শশীমুখী, কাপ্তেন মোনা (মনোরমা)-ও ছিল।

আমরা 'শ্রীদুর্গা' ও মিত্র থিয়েটারের কথা বলেছি, এখন একটু বিশদ করে বলি। বরদা দাশগুপ্তের লেখা 'শ্রীদুর্গা' মিত্র থিয়েটার খুলেছিল ২রা এপ্রিল ১৯২৬ সালে। শিশিরবাবু মনোমোহন ছেড়ে অন্যত্র নাট্যমন্দির খোলবার চেষ্টা করছেন, সেজন্য তারাসুন্দরী এখানে এসে করলেন শ্রীদুর্গা। কামকলা—কুসুমকুমারী, ইন্দ্র—প্রকাশ মুস্তফী, নিভাননী ষ্টার ছেড়ে দিয়ে—শচী, কুট্রুস—ধীরেন গাঙ্গুলী। (ডি-জি), মহিষাসুর—নির্মলেন্দু লাহিড়ী। বইটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু অকস্মাৎ ও-অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধে যাওয়ায় বইটা মার খেয়ে গেল।

ষ্টারে ১৯২৮ এর ২৫শে মে খোলা হলো অপরেশবাবুর শ্রীকৃষ্ণ। নাম-ভূমিকায়—তিনকড়িবাবু, বলরাম—মনীন্দ্র ঘোষ, কংস ও ব্যাসদেব—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, বসুদেব ও জরাসন্ধ—দুর্গাপ্রসন্ন বসু, দ্রোণাচার্য—ব্রজেন্দ্র সরকার, অশ্বত্থামা—প্রফুল্ল রায়, সাত্যকী—সন্তোষ দাস (ভুলো) কৃতবর্মা, মন্ত্রী, বিদুর—তুলসী চক্রবর্তী, অনিরুদ্ধ—বিজয় মুখোপাধ্যায় দুর্যোধন—অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশুপাল—রাধিকানন্দ, যুধিষ্ঠির—কনকনারায়ণ, ভীম—ননীগোপাল মল্লিক, অর্জুন—দুর্গাদাসব ন্দ্যোপাধ্যায়, সহদেব—সন্তোষ সিংহ। অক্রুর, বৃদ্ধ যাদব—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (হাবুল), প্রাপ্তি—সুশীলাসুন্দরী, অস্তি—নীহারবালা, দেবকী ও দ্রৌপদী—রাণীসুন্দরী।

'কর্ণওয়ালিস'-মঞ্চে 'নাট্যমন্দির' খুললেন শিশিরবাবু। এতে ১৯২৬-এর ২৩শে জুন হলো সীতা, ২৬শে জুন রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন।' রঘুপতি—শিশিরবাবু, রাজা—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নক্ষত্র রায়—নরেশ মিত্র, জয়সিংহ—রবি রায়। রাণী—চারুশীলা, অপর্ণা—ঊষাবতী (পটল), ভিক্ষুক—কৃষ্ণচন্দ্র দে। অভিনয় ভালো হলেও লোক তেমন নিলো না। শিশিরবাবু এর পর করলেন গিরিশচন্দ্রের পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। এতে শিশিরবাবু প্রথমে ভীম, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ভূমিকা গ্রহণ করলেও পরে 'ভীম' আর ব্রাহ্মণ করতে লাগলেন। কীচক—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অভিমন্যু—গায়ক ধীরেন দাস, দ্রৌপদী—প্রভা, উত্তর—চারুশীলা, উত্তরা—শেফালিকা (পুতুল) বৃহন্নলা—রবি রায়। এই নাটক বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল দর্শকমহলে,

বিশেষ করে শিশিরবাবুর অভিনয়।

ষ্টারে আবার নতুন বই। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'লাখ টাকা।' আটর্নী রক্তবীজের ভূমিকায় বিচিত্র রূপসজ্জায় অহীন্দ্রবাবু অসামান্য অভিনয় করলেন। ফক্কারাম—রাধিকাবাবু, লক্কারাম—তুলসী চক্রবর্তী, ভুজঙ্গিনী—নীহারবালা, চঞ্চলা—সুশীলাসুন্দরী। এই সময় মিনার্ভায় হলো অমৃতলাল বসুর 'ব্যাপিকা বিদায়।' এ-বই দারুণ জমে গিয়েছিল। ব্যাপিকার ভূমিকায় নগেন্দ্রবালা দারুণ অভিনয় করেছিলেন। লিলি—সুবাসিনী। একটি চরিত্রে আঙুরবালাও খুব নাম করেছিলেন। ২৩শে জুলাই ষ্টারে আর একটি নতুন নাটক রবীন্দ্রনাথের শোধবোধ।

এতে সতীশ-অহীন্দ্র চৌধুরী, শশধর ও মিঃ নন্দী-রাধিকানন্দ, মন্মথ—দুর্গাপ্রসন্ন বসু, মিঃ লাহিড়ী—কনকনারায়ণ, মাসী সুকুমারী—সুশীলাসুন্দরী, নলিনী—নীহারবালা, চারুবালা—সরস্বতী। এরপরে ষ্টারে কয়েকটি পুরানো নাটকেরও অভিনয় হয়,—'পাণ্ডবগৌরব', 'দেবীচৌধুরাণী', অলীকবাবু।

ওদিকে শিশিরবাবু খুলেছিলেন দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', সঙ্গে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের গীতিনাট্য 'মুক্তার মুক্তি।' মিত্র থিয়েটার 'শ্রীদুর্গা'র পর ধরলেন ক্ষীরোদপ্রসাদের 'জয়শ্রী' ও ভুপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডার্বি টিকিট' জমলো না দেখে অমৃতলাল বসুকে নিয়ে এসে কৃষ্ণকান্ত উইলের নাট্যরূপ 'ভ্রমর।' নাম ভূমিকায় কুসুমকুমারী, রোহিণী—তারাসুন্দরী, গোবিন্দলাল-নির্মলেন্দু লাহিড়ী, কৃষ্ণকান্ত—অমৃতলাল বসু। অমৃতবাবুর 'নবযৌবন' ষ্টারে করা হলো দর্পনারায়ণ -অহীন্দ্র চৌধুরী, ফুলচাঁদ—রাধিকাবাবু, অলকা—নীহারবালা, সুকুমারী—ফিরোজবালা, তুলসী—রাণীসুন্দরী, আর নায়ক বসন্তকুমার সাজলো সুশীলাসুন্দরী। অহীন্দ্রবাবু মন্তব্য করে গেছেন,—'নায়কের ভূমিকায় সুশীলাবালা ভালো করলেও মেয়েছেলে তো? লোকে নেবে কেন? দুর্গাদাস তখন অসুস্থ, থিয়েটারে নেই…এই ভূমিকাটি যেন ওরই জন্য লিখিত। ওকে যদি পাওয়া যেতো তো, সোনায় সোহাগো হতো।'

ষ্টারে এরপর ধরা হলো অমৃতলাল বসুর 'বন্দে মাতরম।' অমৃতবাবুর আদেশে অহীন্দ্রবাবু করেছিলেন 'বাজ বাহাদুর।' অদ্ভুত চরিত্র। তাঁর সংলাপের ধরন দেখলেই বোঝা যাবে: আরবদের ভেতর বেদুইন বলে একটি জাত ছিল; তারা যে গান গেয়ে লুট করতে যেতো, সেই গানগুলো জড় করে ব্যাসেৎ বলে একজন ইহুদি প্রথম পাবলিশ করে। বেদে সবিতা বলে একটি কথা আছে তো?

—হ্যাঁ, সূর্যের আরেকটি নাম।

সঙ্গে সঙ্গে বাজ বাহাদুরের প্রতিপ্রশ্ন: সূর্য! সূর্য ছিল কোথায়? সিরিয়া

থেকে সংরীয়, ক্রমে বাংলায় সংর্ষি দাঁড়িয়েছে। ঐ সবিতা রাশিয়ার সোভিয়েট কথা থেকে হয়েছে, তা জানেন ?'

বইখানা ছোট, তাই সঙ্গে বড়ো বই জুড়তে হতো। ১১ই নভেম্বর হলো 'চন্দ্রগুপ্ত'-এর সঙ্গে। এতে 'চাণক্য' করেই দানীবাবু ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুণ ছয় মাসের জন্য থিয়েটার থেকে অবসর গ্রহণ করলেন।

বিনোদিনীর কাছে সব খবরই পেঁছতো। মেয়েরা কেউ না কেউ দেখা করতে যেতো। সেই অনেক কাল আগের কথা। বিখ্যাত গায়িকা যাদুমণি এসেছিলেন দেখা করতে। প্রথম যুগের অভিনেত্রী এবং পরে প্রখ্যাত গায়িকা। রাজদরবার-টরবারে গান করতে যেতেন বলে নামই হয়ে গিয়েছিল যাদুবাঈ। বিনোদিনীর থেকে আট বছরের বড়ো। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আসরের গল্প'-বইতে যে তথ্য দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, নানান অভিজাত মহলের আসরে গান করে তিনি প্রচুর অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু একটি রাত্রির ঘটনায় তাঁর জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। তাঁর গয়না গাঁটি, হীরে জহরত, টাকা কড়ি সব একদিন চোরে চুরি করে নিয়ে যায়, ফলে তিনি মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়েন। আর আসরে টাসরে যেতেন না। এ-জন্য লোকের মন থেকেও তিনি আস্তে আস্তে মুছে যান। বেশ কয়েক বছর গত হবার পর নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বৃদ্ধা ভিখারিণীর গান শুনে চমকে উঠলেন। কাছে গিয়ে দেখলেন, যা ভেবেছিলেন ঠিক তা-ই। ভিখারিণী আর কেউ নয়, যাদুমণি। যাদুমণির জীবনে আবার প্রতিষ্ঠা এনে দেবার জন্য নগেন্দ্রনাথ 'সঙ্গীত পরিষদ বিদ্যালয়' স্থাপন করে তাতে শিক্ষিকা নিযুক্ত করলেন যাদুমণিকে। এ হচ্ছে ১৯১৪ সালের কথা। চার বছর এই গান-শেখানোর কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে সমাপন করে ১৯১৮ সালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি, তাঁর স্মৃতি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

সেই যে দেখা করতে এসেছিলেন বিনোদিনীর সঙ্গে, সে কথা প্রায়ই মনে পড়তো। বিনোদিনীর মনটা বিষণ্ন হয়ে উঠতো। কিন্তু কতক্ষণ ? তার পাতানো নাতনী রাধা এসে ডাকলো, ও দিদিমা! দিদিমা! ঘুমুচ্ছ নাকি ? থিয়েটারে যাবে না ? কাল যে কারা কারা এসে তোমাকে পাস দিয়ে গেল ?

—ওলো, আমার পাস লাগেনা!—বিনোদিনী উঠে বসলো, তার মনে পড়লো, স্টারে একটা নতুন বই খুলেছে, দু-তিনটি মেয়ে এসে নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিল। রাধাকে বললে, তুই যাবি না ?

—যাবো না!—রাধা বললে,—সেই কখন গা ধুয়ে তৈরি হয়ে আছি! চলো দিদিমা, শীগ্গির তৈরি হয়ে নাও।

বিনোদিনীর তৈরি হতে আর কতক্ষণ ? ওরা দুজনে রওনা হলো। স্টার

আর কতদূর ? দু-পা ফেললেই তো স্টার ! স্টারে সেদিন নতুন বই, অপরেশ-বাবুর চণ্ডীদাস (২৫ ডিসেম্বর ১৯২৬)—২৪শে ডিসেম্বর মিনার্ভা খুললো ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন ব্যঙ্গ নাট্য—'যুগমাহাত্ম্য ।' মিত্র থিয়েটার সে সময় আলফ্রেড ছেড়ে মনোমোহন মঞ্চে এসে অভিনয় করছেন, এঁরা করলেন 'দেবলা দেবী' । আর ডিসেম্বরের পয়লা তারিখে শিশিরবাবু তাঁর নাট্য মন্দিরে খুললেন নতুন নাটক, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নরনারায়ণ ।' এ বই বর্তমান লেখকেরও দেখবার সুযোগ হয়েছিল । 'কর্ণ' রূপে শিশিরবাবু যে অভিনয় কলা প্রদর্শন করেন, তা এক কথায় অসামান্য । অন্যান্য ভূমিকাও ভালো হয়েছিল । শ্রীকৃষ্ণ—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, সূর্য ও সাত্যকী—নবাগত জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্র ও বিষ্ণু—অয়স্কান্ত বক্সী, পরশুরাম ও অর্জুন—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বৈতালিক—কৃষ্ণচন্দ্র দে, যুধিষ্ঠির—যোগেশ চৌধুরী, এবং হাস্যরসিক চিত্তরঞ্জন গোস্বামী নেমেছিলেন ঘটোৎকচ চরিত্রে । দ্রৌপদী—চারুশীলা, পদ্ম—কৃষ্ণভামিনী (স্টার ছেড়ে চলে এসেছিলেন) ।

এবার আসা যাক 'চণ্ডীদাস'-এর কথায় । নাম ভূমিকায় তিনকড়ি চক্রবর্তী চমৎকার অভিনয় করলেন । এ-ও বর্তমান লেখকের দেখা । নকুল—সন্তোষ সিংহ, হারাধন—সন্তোষ দাস (ভুলো), নফর মামা—ননী গোপাল মল্লিক, রাজা সুচেৎ সিং—কনকনারায়ণ, জমিদার দুর্লভ রায়—রাধিকাবাবু । রাণী—নীহার বালা, চাঁপা—সরস্বতী, নিত্যা—সুশীলাসুন্দরী (ছোট) । অভিনেত্রী হিসাবে মঞ্চে তাকে দেখা গেল এই প্রথম, এর অনেক দিন আগে সে মিনার্ভায় নর্তকী ছিল মাত্র । এ-নাটক জমে গিয়েছিল, যেমন অভিনয়, তেমন গান । রজকিনীকে ভালবাসার অপরাধে চণ্ডীদাস পিতৃশ্রাদ্ধের দিন প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে উঠছে, তখন 'ঠাকুর—চণ্ডীঠাকুর' বলে ব্যাকুল হয়ে ছুটে ছুটে যে ভাবে এলো 'রামী' রূপিনী নীহারবালা, যেভাবে জিজ্ঞাসা করলো,—'একী সত্যি'—তা ভোলবার নয়, এখনো চোখে ভাসছে । মনে আছে 'চণ্ডীদাস'-তিনকড়িবাবুর উত্তর,—'না, এ মিথ্যে !'

স্টারে এ সময় বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহও অভিনীত হয়েছে । নামভূমিকায় কনকনারায়ণ, ঔরংজেব—অহীন্দ্র চৌধুরী, মুবারক—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিকলাল—রাধিকানন্দ, অনন্ত মিশ্র—তিনকড়িবাবু । জেবউন্নিসা সাজলো নতুন একটি মেয়ে,—মণিমালা । অহীন্দ্রবাবু লিখেছেন, মেয়েটি ছিল সত্যিই সুন্দরী । দরিয়া—নীহারবালা, চঞ্চলকুমারী—ছোট সুশীলাসুন্দরী, নির্মল-কুমারী—বড়ো সুশীলাসুন্দরী । পানওয়ালীর ভূমিকায়—তারকবালা (লাইট) । এর পরে স্টারে ঘটলো বিপর্যয় । নায়িকা নীহারবালা চলে গেলো । চলে গেলেন প্রবোধ গুহ পরিচালক হয়ে মনোমোহনে । অপরেশবাবুর ফুলরা ধরা হয়েছিল ।

নাট্যমন্দির থেকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এসেছিলেন, আর এলেন সন্তোষ সিংহ। ফুল্লরায় 'দুর্গা'র ভূমিকায় শান্তবালা সুন্দর অভিনয় করেন। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখে গেছেন, 'ফুল্লরা'র দুর্গার ভূমিকায় পবিত্র ভাবটি আনিতে পারিয়াছিলেন।' পরবর্তী নাটক অপরেশচন্দ্র নাট্যায়িত অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্র শক্তি'তে রমাবল্লভের স্ত্রী কৃষ্ণভামিনীর ভূমিকা একেই দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই ভূমিকায় নিয়ে আসা হলো কুসুমকুমারীকে। রমাবল্লভ করতেন কুঞ্জ চক্রবর্তী। অম্বার কোমল ভাবটি ছোট সুশীলাসুন্দরী ভালোই আনতে পেরেছিল। 'তুলসী'র ভূমিকায় গানে ও অভিনয়ে সুবাসিনী দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন, কিন্তু প্রধান তিনটি ভূমিকায়, 'মৃগাঙ্ক', 'বাণী' আর 'মথরো' অদ্ভুত অভিনয় করেছিলেন যথাক্রমে অহীন্দ্র চৌধুরী, কৃষ্ণভামিনী ও তিনকড়ি চক্রবর্তী। এই সঙ্গে নায়ক অম্বরনাথের ভূমিকায় ইন্দু মুখোপাধ্যায়েরও নাম করতে হয়। হেমেন্দ্রবাবু লিখে গেছেন, 'ধীর, নির্মলচিত্ত, সংযত যুবকের ভূমিকায় কত উৎকৃষ্ট অভিনয় করিতে পারেন, অম্বরনাথ উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।' এই অভিনয়ের সময় কৃষ্ণভামিনী গিয়ে দেখা করেছিলো বিনোদিনীর সঙ্গে। 'মা' বলে ওকে ডাকতো সে। বললো—মা, আমি আবার ষ্টারে এসেছি। দেখবেন চলুন। কতদিন ষ্টারে যান না বলুন তো?

বিনোদিনী একটু হেসে বললে,—গিয়েছিলুম মা। তবে ষ্টারে নয়, নাট্য মন্দিরে। তারা এসে নিয়ে গিয়েছিল। গিরিশবাবুর স্মৃতিতে 'প্রফুল্ল' হয়েছিল। তারা করেছিল উমাসুন্দরী। চমৎকার করেছিল বিশেষ করে ম্যাড-সিনটিতো দেখবার মতো! প্রভা বলে নতুন একটি মেয়ে করলে 'প্রফুল্ল।' সে-ও ভালো করলে, তবে দানীর 'যোগেশ' লোককে একেবারে মাতিয়ে দিয়েছে, তোমাদের শিশিরবাবু করলেন রমেশ, খুব ভালো।

—দেখা হলো 'দানী—বাবার সঙ্গে?

—হ্যাঁ—বলতে বলতে চোখ ছলছল করে এলো বিনোদিনীর-কত কথা হলো, গিরিশবাবুর কথাই বেশি। ছেলে একেবারে বাপঅন্ত প্রাণ। জানো মা, আমার কাছে 'নাট্য মন্দির' বলে পুরানো একটি পত্রিকা আছে। বোধ হয় অবিনাশবাবু দিয়ে গিয়েছিলেন। সে কি আজকের কথা? ১৯১২ সালের পত্রিকা। তাতে তোমাদের নরীসুন্দরীর বক্তৃতা ছাপা হয়েছিল। এই দ্যাখো—

বলে, বিনোদিনী পত্রিকাটি এনে কৃষ্ণভামিনীকে দেখালো। বললে,—এই দ্যাখো। আমি দাগ দিয়ে রেখেছি।

কৃষ্ণভামিনী আগ্রহের সঙ্গে পড়তে লাগলো—'আমার জন্মের পর সাধুসমাজ আমায় বলিয়াছিলেন যে, পুণ্যের ছাপমারা কুলে তোর যখন জন্ম নয়, তখন তুই চিরদিন পাপই করিতে থাক আর আমরা পুণ্যের তেজে তোদের গাল দিতে

ঘৃণা করিতে থাকি। কিন্তু গিরিশবাবু অতটা পুণ্যবান ছিলেন না, তিনি মহাপুরুষ ছিলেন, তাই আমার মতো অভাগিনীর মুখ দিয়াও চৈতন্যলীলার নিতাইয়ের, বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীর মধুময় কথা বলাইয়াছিলেন।'

যাই হোক, এই 'মন্ত্রশক্তি'র সময়েই অহীন্দ্র চৌধুরী ষ্টার ছেড়ে চলে গেলেন মিনার্ভায়। এ হচ্ছে ১৯২৭ সালের এপ্রিলের কথা। 'মৃগাঙ্ক' করতে থাকেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমেন্দ্র দাশগুপ্তের মতে, যত লোকে মৃগাঙ্ক করিয়াছেন, দুর্গাদাসবাবু অপরাজেয়।'

নাট্য মন্দিরে সম্মিলিতভাবে 'প্রফুল্ল' হবার আগে শিশিরবাবু করেছিলেন শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা অবলম্বনে 'ষোড়শী।' এই অভিনয় বর্তমান লেখকেরও দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। শিশিরবাবুর জীবানন্দ এককথায় এক অপূর্ব সৃষ্টি। তাঁর সংগে ষোড়শী-চারুশীলা। সে জীবন্ত অভিনয় এখনো আমাদের চোখে ভাসছে। শিশিরবাবু এইসময় রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা-ও করেন। এরপরে যোগেশ চৌধুরীর লেখা 'দিগ্বিজয়ী' করেন শিশিরবাবু। তাঁর 'নাদির শা' এক অপূর্ব চরিত্রচিত্রণ। এরপরে করলেন রবীন্দ্রনাথের 'তপতী'। ভূপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শংখধ্বনি' ও করলেন এই সময়। এতেও তাঁর 'কেতনলাল' খুব ভালো হয়েছিল। ওদিকে প্রবোধ গুহ-র অধিনায়কত্বে মনোমোহন থিয়েটারে হলো দানীবাবুর পরিচালনায় বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'মীরাবাঈ' নামভূমিকায় সুবাসিনী এবং রাণাকুম্ভের ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী ভালো অভিনয় করেন। এরপরে এখানে খোলা হয় নিশিকান্ত বসুর 'পথের শেষে।' দুর্গাশঙ্করের ভূমিকায় দানীবাবু আবার যেন জ্বলে উঠলেন। তাঁর পুত্র নলিনীর ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী ও নলিনীর স্ত্রী পারুলের ভূমিকায় সরযূবালা 'এত করুণ রসসঞ্চার করিত যে অনেক সময় দর্শক আর পারি না বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিত।' সুখদার সাজে প্রকাশমনিও অপূর্ব অভিনয় করেন। সুবাসিনীর গানে মুগ্ধ হতো সবাই। নিরুপমার ললিতাও ভালো হতো। মনোমোহনে এর পরে হতে থাকে একে একে 'কর্মবীর', 'প্রাণের দাবী', 'রক্তকমল' সমুদ্রগুপ্ত ও মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাহাঙ্গীর। এতে শশীমুখীর 'নুরজাহান' খুব নাম করেছিল। আর ভালো হয়েছিল দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মহবৎ খাঁ ও নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সাজাহান। মনোমোহনের পরের নাটক মন্মথ রায়ের 'মহুয়া।' নির্মলেন্দুবাবুর 'হুমরো সর্দার' দুর্গাদাসের 'নদেরচাঁদ', 'সরযূবালা, মহুয়া', তার সঙ্গে প্রভাত সিংহের 'সুজন', সুগায়িকা ইন্দুবালার 'হুঁসিয়ার' দেখবার মতো হতো। রাধিকানন্দ একটি সম্প্রদায় গঠিত করে জ্যোতি বাচস্পতির 'নিবেদিতা' অভিনয় করে খুব নাম করলেন। নাম-ভমিকায় ছিলেন সুশীলা-সুন্দরী (বড়ো)। এঁরা মনোমোহনে যোগদান করলেন। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির

উপায়' হলো। রাধিকানন্দ—ফকির, আর নীহারবালা 'হৈমবতী'। তারপরে হলো শচীন সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা' ১৯৩০ সালের জুন মাসে। শিবাজীর ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ী দারুণ অভিনয় করলেন। রাধিকাবাবুর 'ঔরঙ্গজেব'-ও চমৎকার হতো। সঙ্গে সমান তালে চলতো সুশীলাসুন্দরীর 'জীজাবাঈ', সরযূবালার 'শ্যামলী', আর নীহারবালার 'বাঁরাবাঈ', মণি ঘোষের 'ঘোড়ফড়ে' আর জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 'রণরাও।'

ওদিকে অহীন্দ্র চৌধুরী তখন মিনার্ভার ম্যানেজার। একের পর এক হতে থাকে রাঙারাখী, অভিজাত, শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ, তারপরে বাসুকী' পুরোহিত, দেবযানী ইত্যাদি। এর পরে অহীন্দ্রবাবু চলে যান। এই মনোমোহনেই আগে হয়েছিল বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্তের মিশরকুমারী, যা পরে অনেক থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। এখানে তখন সামন্দেশ করতেন প্রিয়নাথ ঘোষ, আবন-কুঞ্জ চক্রবর্তী, নাহরিন—সুশীলাসুন্দরী, বুলা—সুবাসিনী। তারপরে মিনার্ভা পুড়ে যায়, সেকথা আগেই বলেছি। নতুন করে মিনার্ভা আবার চালু হবার পরে ৮ই আগস্ট ১৯২৫-এ করে 'আত্মদর্শন, এ তথ্যও আগে দিয়েছি।

শিশিরকুমার 'কর্ণওয়ালিশ ছেড়ে স্টারে আসেন ১৯৩০-এর জুন মাস নাগাদ। এখানে এসে পুরানো বই-ই করতে থাকেন, 'চিরকুমার সভা', 'মন্ত্রশক্তি' 'সাজাহান' ইত্যাদি। এখান থেকেই তিনি চলে যান আমেরিকায় নিজের দল নিয়ে থিয়েটার করতে।

মনোমোহনে তখন পুরানো বই-ই ঘুরে ফিরে চলছিল। যেমন, রাজসিংহ, গৃহলক্ষ্মী, শঙ্করাচার্য। দানীবাবুর রাজসিংহের ঔরংজেব আর শঙ্করাচার্যের 'শঙ্কর' খুব ভালো হতো। এর পরে মনোমোহনে খোলা হলো মন্মথ রায়ের 'কারাগার।' এতেও 'বসুদেব,-এর ভূমিকায় দানীবাবু চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। সুশীলাসুন্দরী (বড়ো)—দেবকী, কংস—নির্মলেন্দু লাহিড়ী, কঙ্কন—ভূমেন রায়, চন্দনা—নীহারবালা, নরক—মণি ঘোষ, ধরিত্রী—রাজলক্ষ্মী, কঙ্কা—সরযূবালাও সুন্দর অভিনয় করেন। নজরুলের লেখা সঙ্গীতগুলিও জনচিত্ত জয় করেছিল। কিন্তু ছাব্বিশ রাত্রি অভিনয় হবার পর এ নাটক 'রাজদ্রোহ'-এর অভিযোগে বন্ধ করে দেন তদানীন্তন সরকার। ১৯৩১-এর গোড়াতেই 'নাট্যনিকেতন' তৈরি হয়ে গিয়েছিল, প্রবোধ গুহ সদলবলে সেখানে চলে যান, মনোমোহন'-এর বাড়ি ভেঙে দিয়ে সেখান থেকে প্রশস্ত রাজপথ 'চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ' এগিয়ে যায়।

নাট্যনিকেতন খুলেছিল ১৯৩১ সালের ১৪ই মার্চ। এখানকার প্রথম নাটক ধ্রুবতারা, প্রধান ভূমিকায় ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নীহারবালা ও শেফালিকা (পুতুল)। এর পরে মন্মথ রায়ের সাবিত্রী। নামভূমিকায় নীহারবালা সত্যবান—কামাখ্যা চট্টোপাধ্যায়। এর পরে সতু সেনের পরিচালনায় হলো শচীন

সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে।' এতে প্রধান ভূমিকায় নির্মলেন্দু, নীহারবালা, রাধিকানন্দ, মণি ঘোষ ও নীরদাসুন্দরী। এ সম্পর্কে দেবনারায়ণ গুপ্ত লিখেছেন, 'একটি মাত্র দৃশ্যে তিন ঘণ্টার নাটক সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হলো বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে। জল, ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুতের ঝলকানি, মোটরের হর্ন এবং সর্বোপরি আলোক-সম্পাতের কলাকুশলতায় ঝড়ের রাতে দর্শকদের বিস্ময়ে অভিভূত করে তুললো।' এ-অভিনয় বর্তমান লেখকেরও দেখবার সুযোগ হয়েছিল। মাসিমার ভূমিকায় পুরাতন অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরী নতুনদের সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে নিয়ে ছিলেন। কথাবার্তা-হাঁটাচলায় একেবারে স্বাভাবিক। যাকে বলে জীবন্ত চরিত্র। এই নাটকেই, যতদূর মনে পড়ে, একটি চুম্বন দৃশ্য ছিল। খুব স্বাভাবিক-ভাবেই নির্মলেন্দু কথা বলতে বলতে স্ত্রীকে আলতোভাবে টুক করে চুমু খেয়ে নিতেন। নাট্যমঞ্চে এই action বোধ হয় এই-ই প্রথম।

নাট্যনিকেতনে পরে হলো কাজী নজরুল ইসলামের 'আলেয়া'. তারপরে হলো 'সতীতীর্থ', 'আঁধারে আলো', 'বিপ্লব।'

এই সময় নতুন একটি থিয়েটার গড়ে ওঠে, 'রঙমহল।' ১৯৩১ সালের ৮ই আগস্ট যোগেশ চৌধুরীর 'বিষ্ণুপ্রিয়া' দিয়ে এর উদ্বোধন হয়। আমেরিকা থেকে ফিরে শিশিরবাবু এই বিষ্ণুপ্রিয়া করেন। এই সময় দানীবাবুর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন ক্ষেত্রমোহন মিত্র. চুণীলাল দেব, তারাসুন্দরী প্রভৃতি। তারাসুন্দরী ওঁকে বলে,—'দানীদা, তুমি যা করবে, ভেবে করবে, এখনো জিত্ পায়া তোমারই।' দানীবাবু এই সময়ে বাড়িতে বসা। কথাটা তাঁর মনে লাগে। শিশিরবাবু নাট্যনিকেতনের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে দানীবাবুকে নিয়ে এসে কয়েকটি অভিনয় করেন। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'এই যুক্তাভিনয়ে দানীবাবুর যশের কথা এত শতমুখে মুখরিত হয় যে আবার অপরেশবাবু দানীবাবুকে এখানে আনাইলেন।' এখানে অর্থ 'স্টারে', অপরেশবাবুর 'শ্রীগৌরাঙ্গতে তিনি 'চাপালগোপাল করে আবার দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। নাচঘর 'পত্রিকা লিখেছিল' 'যোগ্য ভূমিকায় দানীবাবু এ বয়সেও যে অতুলনীয়, তাঁর চাপালগোপাল সকলের চোখে আঙুল দিয়ে সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে।'

শিশিরবাবু তখন নাট্যনিকেতনে। সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'মহাপ্রস্থান'-এ শিশিরবাবু করলেন শ্রীকৃষ্ণ (২৫ শে ডিসেম্বর ১৯৩১), কঙ্কাবতী—গান্ধারী. নীহারবালা—লক্ষনা।

স্টারে এরপরে অপরেশবাবু অনুরূপাদেবীর 'পোষ্যপুত্র'-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করলেন। হেমেন্দ্র দাশগুপ্তের মতে, (পোষ্যপুত্র) 'একখানি জীবন্ত প্রথম শ্রেণীর নাটকে পরিণত হয়। এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর এবং প্রাণস্পর্শী অভিনয় 'বলিদান'-এর পরে আর হয় নাই।' বস্তুত এটি সুঅভিনীত নাটক। কর্তা শ্যামাকান্তরূপী দানীবাবুর অভিনয় হতো অতুলনীয়। শ্যামাকান্তের বন্ধু

রজনীনাথের চরিত্রে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ভাষায়) 'এমন স্বাভাবিক অভিনয় করেন যে মাননীয় দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় একবার সভায় 'রজনীনাথ' বলিয়াই তাহাকে পরিচিত করিয়াছিলেন। যে দৃশ্যে জামাতা হেমেন্দ্র কুৎসিত আমোদে রত, রজনীনাথের প্রবেশ, একটি মাত্র কথা, অকস্মাৎ আগমন এবং পুনর্গমন এত স্বাভাবিক হইয়াছিল, মনে হয় যেন একটি ছবি দেখিয়াছিলাম।'

যোগেন—ইন্দু মুখোপাধ্যায়, বিনোদ—জীবন গাঙ্গুলী, হেমেন্দ্র—সন্তোষ সিংহ, বৈকুণ্ঠ—তুলসী চক্রবর্তী, গাঁটকাটাদ্বয়—আশু বসু ও সুবল ঘোষ, ফটিকচাঁদ—জহর গাঙ্গুলী, সবারই অভিনয় লক্ষ্য করার মতো, বিশেষ করে জহর গাঙ্গুলীর। শিবানী—কৃষ্ণভামিনী, শান্তি—সুশীলাসুন্দরী (ছোট) সিদ্ধেশ্বরী —শান্তবালা, মণিমালা,—আঙুরবালা, তাকিয়া হরি—রাজলক্ষ্মী, চন্দরী— সরস্বতী ইত্যাদি। কৃষ্ণভামিনী, সুশীলা আর গানে সুধাকণ্ঠী আঙুরবালা দর্শকের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। এমন জমাটি ও জনপ্রিয় নাটক হঠাৎ নাড়া খেলো। সাতাশ রাত্রি অভিনের পর দানীবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভাঙা শরীর আর সারলো না। ভুগে ভুগে তিনি মারা গেলেন ১৩৩২ সালের ২৮ শে নভেম্বর তারিখে। কৃষ্ণভামিনী এসে বিনোদিনীকে এই খবর দিয়ে যায়। বিনোদিনী চোখের জল সামলাতে পারে না। তার পরম আরাধ্য গোপালের মূর্তিটির দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকে সে, দুটি চোখ সজল হয়ে আসে।

মিনার্ভা থেকে অহীন্দ্র চৌধুরী আসেন নাট্যনিকেতনে। শচীন সেনগুপ্তের 'জননী' ও অনুরূপা দেবীর 'মা' (অপরেশবাবুর নাট্যরূপ) মঞ্চস্থ হলো। অরবিন্দ—অহীন্দ্র চৌধরী, ব্রজরাণী (মা)—নীহারবালা, নিতাই—নির্মলেন্দু বালক অজিত—সরযূবালা, মৃত্যুঞ্জয়—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, নির্মলা—রাণীবালা, শরৎ—চারুশীলা, দুর্গাসুন্দরী—কুসুমকুমারী। হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'মা-র অভিনয়ে খুব প্রশংসা হয় এবং অর্থের দিক হইতে প্রবোধবাবুর বেশ প্রাপ্তি হয়। যেমন ভালো করিতেন অরবিন্দের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবু, তেমন কলাসম্মত হইত মনস্তত্বপূর্ণ ব্রজরাণীর (মা) ভূমিকায় নীহারের। যেমন উপভোগ্য হইত প্রাণখোলা ও সদানন্দ নিতাই-এর ভূমিকায় নির্মলেন্দুবাবুর, তেমন চমকপ্রদ ও প্রাণস্পর্শী হইত বালক অজিতের ভূমিকায় সরযূবালার। মনোরঞ্জনবাবুর মৃত্যুঞ্জয়, চারুশীলার শরৎ, রাণীবালার নির্মলা, কুসুমকুমারীর দুর্গাসুন্দরী ও পরিত্যক্ত স্ত্রীর ভূমিকায় মনোরমার অভিনয়ও ভালো হইত।'

স্টারে ১৩৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস স্কুল' নাটকটি খুব নাম করে। প্রধান ভূমিকায় ছিলেন জহর গাঙ্গুলী, পদ্মাবতী, সুহাসিনী, শরৎকুমারী, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল মল্লিক, ললিত মিত্র, আশু বসু প্রভৃতি। এর পরে হলো নরেশ সেনগুপ্তের 'বড়বৌ।' প্রধান ভূমিকায় ছিলেন

জহর গাঙ্গুলী, নরেশ ঘোষ, সরস্বতী। (অল্পদিনের মধ্যেই সরস্বতী মারা যায়)।

মিনার্ভাতে উপেন্দ্রবাবু 'আঁধারে আলো' থেকে আড়াই ঘণ্টা/তিনঘণ্টা নাটক প্রবর্তন করেন। এ হচ্ছে ১৯৩৩ সালের কথা। অহীন্দ্র চৌধুরী স্টারে আসেন। 'মন্দির প্রবেশ' হয়। কিন্তু এইসময় আর এক ঘটনা ঘটে। বিনোদিনীর কাছে যে মেয়েটি প্রায়ই আসতো, 'মা' বলে ডাকতো, সেই কৃষ্ণভামিনী হঠাৎ মারা গেল ঐ ১৯৩৩-এর 'মে'-মাসে। স্টারও জুন মাসে বন্ধ হয়ে গেল। এপ্রিল মাসে (১৭ তারিখে) রঙমহলে খুলেছিল অনুরূপাদেবীর মহানিশা—যোগেশ চৌধুরীর নাট্যরূপ। তার আগে ১৯৩২-এর জানুয়ারি থেকে এখানে হয়ে গেছে একে একে বিজয়িনী, দেবদাসী, রঙের খেলা, সিন্ধুগৌরব, অসবর্ণা, আর রাজ্যশ্রী। রাজ্যশ্রীতে অবশ্য রবি রায় ও সরযূবালার খুব নাম হয়েছিল। কিন্তু 'মহানিশা'য় রবি রায়ের 'মুরলীধর' অসাধারণ প্রাণস্পর্শী অভিনয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিল। তেমনি হয়েছিল যোগেশ চৌধুরীর 'রাধিকাপ্রসন্ন' আর নরেশ মিত্রের বেহারী। তবে বোধহয় সব থেকে নাম করেন ব্রজরাজের ভূমিকায় ভূমেন রায়। মেয়েদের মধ্যে অন্ধ ধীরা রূপে চারুশীলা আর অপর্ণার সাজে সেফালিকা (পুতুল) খুব ভালো করেন। আসমানতারার সৌদামিনী ও ব্রজরাজের স্ত্রীর ভূমিকায় রেণুবালাও উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। রঙমহলে এর পরের অবদান মন্মথ রায়ের অশোক, তারপরে পতিব্রতা, কাজরী, আর তারপরে প্রভাবতী দেবীর বাংলার মেয়ে। এতে অভিনয়ের সৌকর্য দেখা যায় জিতেনের চরিত্রে নরেশ মিত্রের, মায়া ব্যানার্জী রূপে শান্তি গুপ্তার, আর বীথির সাজে শেফালিকার (পুতুল)। অন্যান্য ভূমিকাও যথাযথ।

স্টার মঞ্চে তখন এসেছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। 'নবনাট্যমন্দির' নাম দিয়ে এখানে তিনি প্রথমে করলেন শরৎচন্দ্রের বিরাজ বৌ, তারপরে সরমা, দশের দাবি, এবং শরৎচন্দ্রের বিজয়া। কিন্তু ইতিমধ্যে আর এক ইন্দ্রপতন ঘটে গেছে। ১৯৩৪-এর মে মাসে রোগে ভুগে ভুগে মারা গেলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সুলেখক, নট, নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক হিসাবে তাঁর অবদান কম নয়। তাঁর মৃত্যুর খবর বিনোদিনী প্রথমে পায় খবরে কাগজে। এই সময় হঠাৎ তার সঙ্গে দেখা করতে আসে বহুদিন পরে তারাসুন্দরী।

—কেমন আছো মা ?

বিনোদিনী পূজার আসনে বসেছিল। মুখ তুলে তাকায়। বলে, তুমি কেমন আছো ?

তারাসুন্দরী ওর কাছে এসে বসে,—আর ভালো লাগছে না। এইবার চলে যাবো।

—কোথায় ?

—আমার ডেরায়। ভুবনেশ্বরে।

নাট্যনিকেতনে এই সালে হলো পূর্ণিমামিলন, শিবপ্রসাদ করের স্বর্ণলঙ্কা, আর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য রচিত 'চক্রব্যূহ। এই বইতে অহীন্দ্র চৌধুরীর 'শকুনি' একটি নাম করা চরিত্র হলেও 'কুন্তী'র ভূমিকায় তারাসুন্দরী তার প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে। এই কুন্তীই তার শেষ অভিনয়। এখান থেকেই সে ফিরে যায় ভুবনেশ্বরে! পূজা-অর্চনাই একমাত্র পাথেয় হয়ে দাঁড়ায়।

স্টারে 'বিজয়া'তে শিশিরবাবুর 'রাসবিহারী' এক অদ্ভুৎ চরিত্র-সৃষ্টি। (যদিও তিনি রঙ্গ করে একবার বলেছিলেন,—'সারাজীবন হালুমবীর, ঘুঘুবীর আর বাঁশবেহারীই করলুম। নাটকের মতো নাটক পেলুম কই?') সঙ্গে কঙ্কাবতীর 'বিজয়া'ও এক অপূর্ব চরিত্র-চিত্রণ। এরপরে শিশিরবাবু করেন রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ'। এতে 'মধুসূদন' রূপে উচ্চাঙ্গের অভিনয় করেন শিশিরবাবু। কঙ্কাবতীর 'কুমুদিনী' স্বয়ং কবিগুরুর প্রশংসাধন্য। ১৯৩৭ সালের জুন মাসে শিশিরবাবু স্টার ছেড়ে দেন।

কঙ্কাবতী ছিলেন গ্র্যাজুয়েট, শিক্ষিতা মহিলা। শুধু তা-ই নয়, তিনি লেখিকাও ছিলেন। কঙ্কাবতী সাহু এই নামে একসময় গল্প লিখতেন বিভিন্ন পত্রিকায়। শিশিরবাবুও কঙ্কাবতীকে জড়িয়ে অনেক কাহিনী শোনা যেতো তখনকার দিনে। পরবর্তীকালে শিশিরবাবু এ-সম্পর্কে নিজেই বলে গেছেন নাট্যকার তারাকুমার মুখোপাধ্যায়কে। তিনি তা লিখে রেখেছেন তাঁর 'অন্তরালে শিশিরকুমার' বইতে। শিশিরকুমার বলেছেন,—'আমি কিন্তু কস্মিনকালেও কঙ্কাকে সাদি করি নি।...তবে কঙ্কা was a fair woman. দশ-পঁচিশের ঘুঁটি ছিল না কোনো কালেই। কী করে এলো আমার কাছে সে-ইতিহাস সমসাময়িক বন্ধুরা কেউ কেউ জানে, কিন্তু কী করে এসে মিললো আমার জীবনে, তার ইতিহাস কেই বা জানবে?...আমার ছোট ভাই পুতু, ভবানীকিশোর তার অন্তরের পরিচয় জানে।' এরপরে তারাকুমার লিখছেন,—'ভবানী সবিস্তারে কঙ্কাকাহিনী বলেছিল আমাকে। কেমন করে সে নারী পুতুর মুখের রক্ত (ভবানীর ছিল যক্ষ্মা) অঞ্জলি পেতে নিয়েছিল তাড়াতাড়িতে পাত্রের অভাবে, সেই সেবার আগ্রহ, ব্যাকুলতা আমাকে বলতে বলতে পুতুর চোখ ছলছল করেছে।...পুতু বললো, কঙ্কা মৃত্যুর পূর্বে আমাকে বলেছিল, জীবনে দুটি সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল। তোমার দাদাকে মদ ছাড়াতে পারলুম না; আমাকে তিনি বিয়ে করলেন না।'

তারাকুমার লিখছেন, 'কঙ্কা ফ্যাশানেবল বিবাহ চায়নি। সে চেয়েছিল ধর্মানুষ্ঠানিক সামাজিক মর্যাদা।'

তারাকুমার এ-সম্পর্কে শিশিরবাবুর বক্তব্যও লিখেছেন,—'আমি শিথিল, কিন্তু Conventional-ও।' কিন্তু সে যাই হোক কঙ্কাবতী যে এই বিরাট প্রতিভাকে ভালোবেসেছিলেন, এ-বিষয়ে দ্বিধা নেই। তারাকুমারবাবু লিখেছেন, 'কঙ্কাবতী কেমন করে মামুলী জীবন নেবে না বলে তাঁর কাছে অভিনয় শিখতে

এলো, কেমন করে শিশিরবাবু তাকে জীবনে গ্রহণ করতে আগ্রহী হলেন, সে-সব কথা আমাকে বলতে একটুকুও দ্বিধা করেন নি তিনি।'

প্রসঙ্গত বলা দরকার, কঙ্কাবতী সুকণ্ঠী গায়িকাও ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯০৩ সালে, মৃত্যু ১৯৩৯-এর ২১শে জুন। 'সংসদ চরিতাভিধান' জানাচ্ছেন, 'বেথুন কলেজে বি. এ পড়ার সময় রবীন্দ্রনাথের সংগে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে 'গৃহপ্রবেশ'এ 'মাসি'র ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। এম. এ পড়বার সময় অসুস্থতার জন্য শিক্ষাজীবনে ছেদ পড়ে। শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে দিগ্বিজয়ী নাটকে 'ভারতনারী'র ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে পেশাদারী অভিনেত্রী জীবনের সূত্রপাত হয়।'

যাইহোক, এবার অন্য কথায় ফিরে যাই। ১৯৩৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর রঙমহলে আর একটি নাটক নাম করেছিল, সেটি হলো শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' এতে উপেন্দ্র—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সাবিত্রী—শেফালিকা (পুতুল), কিরণময়ী—শান্তি গুপ্তা, সতীশ—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, দিবাকর—ধীরাজ ভট্টাচার্য। ওদিকে শিশিরবাবু ষ্টার ছেড়ে দিলে, ওখানে অন্য লোকের ব্যবস্থাপনায়, মঞ্চস্থ হতে থাকে বিদ্যাপতি, অভিসারিকা, অপরাজিতা। মুখ্য শিল্পী ছিলেন রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবকালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, শান্তি গুপ্তা, রাজলক্ষ্মী, শেফালিকা (পুতুল), কিন্তু পরের নাটক 'কালের দাবী'তেই ষ্টার বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৭ এর জুনে মিনার্ভা থেকে ষ্টারে আসেন লেসী হয়ে উপেন্দ্র মিত্র। মিনার্ভায় হতে লাগলো উৎপলেন্দু সেনের পার্থ সারথী আর কিছু পুরানো নাটক।

ষ্টারে উপেন্দ্র মিত্র করালেন ধর্মদ্বন্দ্ব, মহেন্দ্র গুপ্তের চক্রধারী, সুবীরবাবুর বাংলার বোমা। শিল্পী ছিলেন শরৎ চট্টোপাধ্যায়, জীবন গাঙ্গুলী, রঞ্জিৎ রায়, তারকবালা (মিস্ লাইট), প্রভৃতি।

নাট্য নিকেতনে ১৯৩৫ সালের নাটক জন্মতিথি, ব্রতচারিনট মন্মথ রায়ের খনা, প্রসাদ ভট্টাচার্যের মানময়ী বয়েজ স্কুল, শচীন সেনগুপ্তের নরদেবতা, (সরকার নিষেধাজ্ঞা জারী করেন) বিদ্যাসুন্দর। ১৯৩৬এ করলেন রমেশবাবুর লেখা 'কেদার রায়' ও রবীন্দ্রনাথের 'গোরা।' কেদার রায়-এ নামভূমিকায় ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমন্ত-নরেশ মিত্র, চাঁদ রায়—রবি রায়, সোনা-নিরুপমা, ইশা খাঁ-জহর গাঙ্গুলী, কার্ভালো—ভূপেন রায় (এ-ভূমিকায় ভূপেনবাবু দারুণ নাম করেন), কালুসর্দার-মণি ঘোষ. মায়া—রেনুকা রায় (পরে চিত্রাভিনেত্রী)। 'গোরা'তে পরেশ—মহীন্দ্রবাবু, পানুবাবু—নরেশ মিত্র, বিনয়—জহর গাঙ্গুলী, মহিম—রবি রায়, আনন্দময়ী-রাজলক্ষ্মী, ললিতা—চারুবালা, আর নামভূমিকায়—ভূমেন রায়। সুচরিতা—শান্তি গুপ্তা। ১৯৩৭-এ এঁদের নাটক: সতী, মোগল মসনদ, বব্রুবাহন। সব নাটকেই মুখ্য স্ত্রী চরিত্রে থাকেন শান্তি গুপ্তা ও রাণীবালা।

রঙমহলে ১৯৩৬-এর মে-তে হয়েছিল পথের সাথী। এতে বসন্ত সেনের ভূমিকায় যোগেশ চৌধুরী খুব ভালো অভিনয় করেছিলেন। এর পরে এখানে হয় 'সর্বহারা', তারপরে ঐ যোগেশবাবুরই 'নন্দরাণীর সংসার'। এতে নন্দরাণী—আসমানতারা, অন্যান্য মুখ্য ভূমিকায় যোগেশবাবু, প্রভা ও মনোরঞ্জনবাবু। এর পরে অন্যদের পরিচালনায় রঙমহলে হলো ১৯৩৭-এর ২৫শে মে 'অভিষেক।' ভরত—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈতালিক—কৃষ্ণচন্দ্র দে ও একটি বিশিষ্ট-ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী। এরপরে হলো 'প্রলয়'—ডিটেকটিভ (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা) বন্দিনী, তারপরে শচীন সেনগুপ্তের 'স্বামী-স্ত্রী'। একটি নরওয়েজিয়ান নাটকের ছায়াবলম্বন—এই নাটক খুব জমে যায়। বিশেষ করে ললিতের ভূমিকায় প্রচণ্ড নাম করেন দুর্গাদাস। লিলি—রাণীবালা, মিঃ দাস—সন্তোষ সিংহ, মোহন—জহর গাঙ্গুলী, মিসেস দাস—পদ্মাবতী, মিনতি—ঊষা দেবী। ১৯৩৮-এর ১৮ই জুলাইতে হলো বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মেঘমুক্তি'। এর পরে দুর্গাদাস চলে যান, আসেন অহীন্দ্র চৌধুরী। ডিসেম্বরে খোলা হলো শচীন সেনগুপ্তের মঞ্চ-সফল নাটক—তটিনীর বিচার। ডঃ ভোস-রূপে অহীন্দ্র চৌধুরী অসাধারণ অভিনয় করেন। তটিনী রূপে রাণীবালাও খুব ভালো অভিনয় করেন। রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় করেন 'বসন্ত', জহর গাঙ্গুলী এবং রাজলক্ষ্মীও থাকেন দুটি বিশিষ্ট ভূমিকায়।

ওদিকে নাট্যনিকেতনে হলো শচীন সেনগুপ্তের বোধহয় সব থেকে জনপ্রিয় নাটক—সিরাজদ্দৌলা। কাজী নজরুল-কৃত গান ও সুর শোনবার মতো হয়েছিল। আর হয়েছিল সিরাজের ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয়। রবি রায়ের—গোলাম হোসেন আর নীহারবালার 'আলেয়া'ও চমৎকার। লুৎফা করেছিলেন সরযূবালা, ঘেসেটি—নিরুপমা, ওয়াটস—ভূপেন চক্রবর্তী, রাজবল্লভ—মনি ঘোষ, মীরজাফর—শিবকালী বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৩৮-এর ৮ই অক্টোবর নাট্যনিকেতনে মঞ্চস্থ হলো জ্যোতি বাচস্পতির 'সমাজ'। এতে জমিদার-রূপে ছবি বিশ্বাস দেখা দেন। তার পরের নাটক মন্মথ রায়ের 'মীরকাশিম'। নামভূমিকায়—ছবি বিশ্বাস, ফতেমা করেন নীহারবালা। গুরগণ—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরগণের ভাই—নরেশ মিত্র। এ-বইতেই সম্ভবতঃ নীহারবালার শেষ অভিনয়। অন্তরে কী পরিবর্তন ঘটে কে জানে, মঞ্চের জগৎ, খ্যাতির জগৎ ছেড়ে

দিয়ে সে চলে যায় অধ্যাত্ম সাধনার পথে—পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দ-আশ্রমে। আমৃত্যু নীহারবালা সেখানেই থাকে (১৯৫৫ সাল)। তারাসুন্দরীরও অন্তিম পথ ছিল অধ্যাত্ম সাধনার—ভুবনেশ্বরে। তার মৃত্যু তারিখ ১৯৪৮ সালের ১৯শে এপ্রিল। নরীসুন্দরীরও অন্তিম জীবন অনুরূপ। সে মারা যায় ৩০শে মে ১৯৩৯ সাল। তখন অবশ্য বিনোদিনী বেঁচে।

১৯৩৯ সালের ১৩ই মে নাট্যনিকেতনে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' মঞ্চস্থ হলো। এই নাটকের 'সব্যসাচী' অহীন্দ্রবাবুর আর এক কীর্তি। তেমনি কীর্তি শশীকবির ভূমিকায় অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রভা করতেন সুমিত্রা, ভারতী—শেফালিকা (পুতুল)। এ-নাটক বেশ চলছিল, কিন্তু সরকার থেকে জারী হলো নিষেধাজ্ঞা।

পুরাতন আলফ্রেড মঞ্চকে 'নাট্যভারতী' নাম দিয়ে নতুন করে খোলা হয় ১৯৩৯ সালের ৫ই আগষ্ট তারিখে। 'তটিনীর বিচার' দিয়ে শুরু। তারপরে শচীন সেনগুপ্তের 'সংগ্রাম ও শান্তি'। এতে মুখ্য ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। সঙ্গে ছিলেন রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, মিহির ভট্টাচার্য, তুলসী চক্রবর্তী, বিজয়কার্তিক দাস, রাজলক্ষ্মী, রাণীবালা, নিরুপমা, সুহাসিনী, সাবিত্রী প্রভৃতি। ১৯৪০-এ এখানে 'নার্সিংহোম' করে অহীন্দ্রবাবু বোম্বাই চলে যান। তারপরে ফিরে এসে অহীন্দ্রবাবু এখানে ১৯৪১-এর জুলাইতে করেন মনোজ বসুর 'প্লাবন' ও সেপ্টেম্বরে মহেন্দ্র গুপ্তের 'কঙ্কাবতীর ঘাট'।

মিনার্ভায় ১৯৩৯-সেপ্টেম্বর থেকে মহেন্দ্র গুপ্তের 'অভিযান' হচ্ছিল। তারপরে এঁরা করেন দেবীদুর্গা, অন্নপূর্ণার মন্দির (নিরুপমা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ) জয়ন্তী, কবি কালিদাস, ব্ল্যাক আউট (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের লেখা) এতে রঞ্জিৎ রায়ের একটি গান—একটি ইংরেজী ফিল্মের গানের প্যারডি—দারুণ সুখ্যাতি পেয়েছিল), তারপরে হাউস ফুল, ইত্যাদি।

নাট্যনিকেতনে জেমস ব্যারীর বিখ্যাত নাটক 'মেরী রোজ' অবলম্বনে যোগেশ চৌধুরীর লেখা 'মহামায়ার চর' এবং সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের 'অগ্নিশিখা' হলো। তারপরে ১৯৪১এ হলো শচীন সেনগুপ্তের 'ভারতবর্ষ', তারপরে সুশীলাসুন্দরীকে এনে রিজিয়া, কিন্তু আয়ের দিক থেকে সুবিধা হলো না। ১৯৪১-এর ১২ই জুলাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

'কালিন্দী' তবু খানিকটা আশার আলো দেখালো। এতে অচিন্ত্য—নরেশ মিত্র, ইন্দ্র রায়—রবি রায়, শৈলেন চৌধুরী—রামেশ্বর, অহীন্দ্র—ভূমেন রায়, উমা—ছোট ছায়া প্রভৃতি।

কিন্তু শেষপর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল নাট্যনিকেতন। এখানে এলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। দীর্ঘদিন বসে থাকবার পর 'শ্রীরঙ্গম' নাম দিয়ে থিয়েটার খুললেন এখানে। এ-ও ১৯৪১ এরই ঘটনা।

শ্রীরঙ্গমের প্রথম নাটক তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনরঙ্গ'। মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে। এই নাটকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয়, শম্ভু মিত্র এতে 'নাট্যকার'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তারাকুমারবাবু লিখেছেন, 'আমার বেশ মনে আছে শম্ভুবাবুর কণ্ঠস্বর তাঁকে উৎসাহিত করেছিল।' এখানে 'তাঁকে' অর্থ—শিশিরবাবুকে। অন্যান্য ভূমিকায় সঞ্জয়—জীবেন বসু, দালাল—আদলবাবু, রমা—প্রকৃতি দেবী, নিভার চরিত্রে (তারাকুমারবাবুর ভাষায়) 'বন্দনা' ভালো করেছিল।' এই তার প্রথম মঞ্চে প্রবেশ। আর নাট্যাচার্যের ভূমিকায় ছিলেন শিশিরবাবু স্বয়ং। এই প্রসঙ্গে নাট্যকার তারাকুমারবাবু তাঁর বইয়ে আর একটি তথ্য দিয়েছেন। দুর্গাদাসবাবু শিশিরবাবুর সঙ্গে দেখা করে নায়ক 'শচীন'-এর অংশে অভিনয় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নানাকারণে তা সম্ভবপর হয়নি। 'শচীন'-এর অংশ দেওয়া হয়েছিল এক নবাগতকে।

রঙমহলের কথা বলা হয়নি। ১৯৩৯এ করলেন এঁরা যোগেশ চৌধুরীর 'মাকড়সার জাল।' তারপরে 'ডাঃ মিস কুমুদ', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর।' এ নাটক লোকে নিয়েছিল। এতে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, দুর্গাদাসবাবু, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মাবতী, শান্তি গুপ্তা, সিধু গাঙ্গুলী প্রভৃতি ভালো অভিনয় করেছিলেন। এর পরে বিধায়কবাবুরই 'বিশ বছর আগে'। নায়কের ভূমিকায় দুর্গাদাস কয়েকদিন করেই অন্যত্র চলে গেলেন। তাঁর বদলে ঐ ভূমিকায় প্রভাত সিংহ, ও পরে সিধু গাঙ্গুলী করতে থাকেন। অন্য ভূমিকায় যথাযথ অভিনয় করেছিলেন রবি রায়, ভূমেন রায়, পদ্মাবতী, শান্তি গুপ্তা, ঊষা দেবী প্রভৃতি। ১৯৪০এ হয় আগামীকাল, আঁধার পথে, বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মালা রায়।' এতে নরেশ মিত্র, শান্তি গুপ্তা, ভূমেন রায় খুব ভালো অভিনয় করেন। এরপরে 'ঘূর্ণি' এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রত্নদীপ' (নাট্যরূপ ঃ বিধায়ক)। এতে 'সোনার হরিণ'

চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখেছিলেন। ১৯৪১এর মে-মাসে 'কপালকুণ্ডলা' করা হলো দুর্গাদাসকে নিয়ে এসে 'নবকুমার' সাজিয়ে। তারপরে হয় বিধায়কের 'রক্তের ডাক।' প্রধান ভূমিকায় দুর্গাদাস ও সরযূবালা। এরপরে হয় 'মায়ের দাবী' প্রভৃতি।

এই সব নাট্যস্রোত বিনোদিনী দেখতে পায় নি। কৃষ্ণভামিনী চলে যাবার পর বিনোদিনীকে মেয়েরা আর কেউ ডাকেনি। বিনোদিনী তখন বৃদ্ধা, ৭৮ বছর বয়স। কেই বা তার খোঁজ করে। দু-একজন নাট্যামোদী তার সঙ্গে দেখা করতে যায় এই পর্যন্ত। কোনো থিয়েটার থেকে কেউ আসে না। তার গোপাল নিয়ে সে থাকে, তবু এক একদিন গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়। মনে হয়—কে যেন ডাকছে। বুঝি ডাকছে কৃষ্ণভামিনী। বলছে—মা, যাবে না থিয়েটার দেখতে? কিন্তু কে নিয়ে যাবে? ১৯৪১ সালের শেষ দিকে (কেউ কেউ বলেন ১৯৪২ এর ফেব্রুয়ারিতে) বিনোদিনীর ঘটলো নীরব মহাপ্রস্থান। কোনো শোকসভা হলো না, কোনো কাগজেও বেরুলো না এ সংবাদ।

১৯৪২এ মিনার্ভায় শচীন সেনগুপ্তের 'কাঁটা ও কমল' খোলা হলো। যোগ দিলেন সেই নীরদাসুন্দরী, যোগ দিলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা প্রভৃতি। কিন্তু কিছুদিন পরে অসুস্থ হয়ে পড়েন দুর্গাদাসবাবু। 'কাঁটা ও কমল'ই তাঁর শেষ মঞ্চাভিনয়। ১৯৪৩ সালের ২২শে জুন তাঁর মৃত্যু হয়। মঞ্চ-নায়ক (Stage-Hero) হিসাবে জনচিত্তে তাঁর বিশেষ স্থান ছিল।

ষ্টারে ১৯৪০-এ হলো সতী তুলসী। নামভূমিকায় সরযূবালা, ত্রিজটা—গায়িকা দুর্গারাণী। মহেন্দ্র গুপ্তের উত্তরাও এখানে অভিনীত হয়। জীবন গাঙ্গুলীর অভিনয় খুব ভালো হয়েছিল। তিনি 'রণজিৎ সিংহ'তেও ভালো অভিনয় করেছিলেন। 'রণদাপ্রসাদ'এ অমল বন্দ্যোপাধ্যায় সু-অভিনয় করেন। তারপরে মহেন্দ্র গুপ্তের 'মহারাজ নন্দকুমার', 'টিপু সুলতান' মহাসমারোহে অভিনীত হতে থাকে। হেমেন্দ্র দাশগুপ্তের মতে 'টিপু সুলতানই শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃতভাবে অভিনীত বলিয়া পরিগণিত হয়।' নন্দকুমার ও টিপু সুলতানের নাম-ভূমিকায় বিপিন গুপ্ত 'বিশেষভাবে রসসঞ্চার' করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রথম নাটকে হায়দার আলি—রবি রায় ও রুনী বেগম—শেফালিকা (পুতুল) অপূর্ব অভিনয় করেন। নাটক দুটিতে ভূমেন রায়ও 'জেমোগ্রন' ও 'মঁসিয়ে লালী' খুব ভালো করেন। জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়েরও

খুব সুখ্যাতি হয়। তারকবালা (লাইট)-ও একটি ভূমিকা খুব ভালো করতেন।

শিশিরবাবু 'শ্রীরঙ্গম' খোলবার আগে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক' এ অধ্যাপক দিগম্বর-এর চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। শ্রীরঙ্গমে 'জীবনরঙ্গ' নিতাই ভট্টাচার্যের 'উড়োচিঠি', মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'দেশবন্ধু' করার পর মায়া আর তারপরে ধরলেন নিতাই ভট্টাচার্য রচিত 'মাইকেল'। 'দেশবন্ধু'র নায়ক ছিলেন কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। যাই হোক, মাইকেল নাটকখানি বর্তমান লেখকের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর মাইকেল একটি অনবদ্য সৃষ্টি। কেন তাঁকে এ-যুগের নাট্যাচার্য ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলা হতো, তা এক এই মাইকেল দেখলেই বোঝা যায়। তাঁর পাশে 'হেনরিয়েটা' যিনি করতেন (বোধ হয় রেবা দেবী), তাঁকেও অভিনন্দন জানাতে হয়। শিশিরবাবুর 'রাম', 'কর্ণ', 'নাদির শা', 'রিজিয়ার' 'ঘাতক', 'জীবানন্দ', 'আলমগীর', 'রঘুবীর', আর 'মাইকেল', আমাদের মতে অতুলনীয়। 'পল্লীসমাজ'এর উল্লেখ করা হয় নি। তাতে ওঁর রমেশ এবং কঙ্কাবতীর 'জ্যেঠাইমা' অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। এতে 'বেণী' রূপী বিশ্বনাথ ভাদুড়ীও অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখেন, যদিও পরে 'শ্রীরঙ্গম'এ ১৯৪৩এ অভিনীত শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস'এ নামভূমিকাটি তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। এই নাটকে মলিনার 'বন্দনা'ও বন্দ্যনীয়। মিহির ভট্টাচার্যের 'দ্বিজদাস'ও উল্লেখ-যোগ্য। এই বিশ্বনাথবাবুও অকালে মারা যান, ১৯৪৫এর ফেব্রুয়ারি মাসে। ১৯৪৪ সালে এখানে শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'র দেবনারায়ণ গুপ্ত কৃত নাট্যরূপ খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়। রঙমহলে দেবনারায়ণবাবুর 'রামের সুমতি' (শরৎচন্দ্র)-র নাট্যরূপও বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল। একটি ছোট গল্পকে যেভাবে দেবনারায়ণবাবু নাট্যরূপায়িত করেছিলেন, তা অভিনন্দনযোগ্য। এতে প্রভাদেবীর অভিনয় আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। 'শ্রীরঙ্গম'-এ এরপরে শিশিরবাবু নিজে এসে করেছিলেন তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান'। শিশিরবাবু ছিলেন প্রয়োগকর্তা, নিজে অভিনয় করেন নি। দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় রচিত এই নাটক তিনি হঠাৎ করলেন কেন ? কারণ, এর অব্যবহিত পূর্বে ঐ মঞ্চেই হয়েছিল এক যুগান্তকারী নাটক, বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন।' বাংলায় মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় জীবন্ত একটি নাটক, যাতে ছিলেন শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, সুধী প্রধান, বিজন ভট্টাচার্য, সবিতাব্রত দত্ত প্রভৃতি আরও অনেক সুদক্ষ

শিল্পী। এদের অবদান শিশিরবাবুকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিষয়-বস্তু, প্রযোজনার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, সম্মিলিত অভিনয়-ধারা, এসবের মধ্যে নাট্যাচার্য সেদিন দেখেছিলেন বিরাট সম্ভাবনা। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পেশাদারী মঞ্চে ধরলেন 'দুঃখীর ইমান।' কিন্তু 'নবান্ন' সৃষ্টি করেছিল আর একটি যুগ। যেখান থেকে উৎসারিত হয়েছিল নবীন এক নাট্যধারা। এ নিয়ে ভবিষ্যতে লেখবার অভিলাষ বর্তমান লেখকের আছে।

যাই হোক, পরিশেষে বক্তব্য, বিনোদিনীর শেষনিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রন্থের সমাপ্তি ঘটাবো, এইরকম ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমাদের নাট্য-ইতিহাসে 'বিনোদিনী' তো একজন নয়, এই ধারা বহুদূর পর্যন্ত চলে এসেছে। একেবারে গিরিশযুগ ছাড়িয়ে প্রায় শিশিরযুগের অন্ত পর্যন্ত। নাট্যক্ষেত্রে এঁদের অবদান অবিস্মরণীয়, কিন্তু ব্যক্তিজীবনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে এঁদের সংগ্রামের দিকটা চোখে পড়ে আগে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তার মূল্য কম নয়। এঁদের জীবনী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অন্তিম জীবনে এঁরা বহুলাংশেই আধ্যাত্মিকতার পথে নিজেদের উত্তরণ ঘটিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালনেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন নি। তাঁদের এই আধ্যাত্মিকতার উপলব্ধির পথ দেখিয়েছেন নটভৈরব গিরিশচন্দ্র। এই প্রসঙ্গে নরীসুন্দরীর কথারই প্রতিধ্বনি করতে হয়ঃ 'আমার মত অভাগিনীর মুখ দিয়াও চৈতন্যলীলার নিতাইয়ের, বিল্বমঙ্গলের পাগলিনীর মধুময় কথা বলাইয়াছিলেন। গিরিশবাবুর কৃপায় আমি হরিনাম গাহিয়াছি, প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সেই পতিতপাবনের নাম গাহিয়াছি।'

সেই ভক্তির যুগে এই আধ্যাত্মিকতার পথই বিনোদিনীদের পক্ষে অনিবার্য ছিল। সেই যুগে ভক্তি ছাড়া আর কোন্ আদর্শের পথ তাঁরা ধরবেন? তাঁদের আমলে রঙ্গমঞ্চ ছিল তাঁদের কাছে মন্দির বিশেষ, পবিত্রতার প্রতীক। কিন্তু এ তো গেল একদিক, অন্যদিকও আছে। সেই অন্যদিক দেখাতে গিয়ে আপাতত আমরা দুটি উদাহরণ দেবো। প্রথমটি হচ্ছে এককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়িকা কুসুমকুমারীর কথা। দেবনারায়ণবাবু তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন—'শেষ জীবনে সুদীর্ঘ পনেরো বৎসরকাল তাঁর অশেষ দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে কেটেছে। নিজের বাসগৃহটিও বিক্রয় হয়ে যায়। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিও হারান।' দেবনারায়ণবাবু আরও লিখেছেন—'১৯৪৫ সালে ছিন্ন মলিন

বেশে একটি কিশোরের কাঁধে হাত দিয়ে রঙমহল থিয়েটারে তাঁকে আসতে দেখেছি। সে সময় রঙমহল থিয়েটারের মালিক ছিলেন অভিনেতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্রের ঘরে রঙমহলের পরবর্তী নাটক সম্পর্কে আলোচনা করছি, এমন সময় তিনি প্রবেশ করলেন। শরৎচন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে, আসুন মা আসুন—বলে সসম্মানে তাঁকে পাশের চেয়ারে বসালেন। তারপর টেবিলের ড্রয়ার খুলে কিছু টাকা তাঁর হাতের মুঠোয় তুলে দিলেন। অস্ফুটে একটিমাত্র কথাই আমার কাণে গেল—বেঁচে থাকো বাবা! ইতিমধ্যে থিয়েটারের চাকরকে ডেকে শরৎচন্দ্র বললেন—মাকে গ্রীনরুমে নিয়ে যা। কিশোর ছেলেটির কাঁধে হাত রেখে চাকরের সঙ্গে ধীরে ধীরে গ্রীনরুমের দিকে চলে গেলেন কুসুমকুমারী, শিল্পীদের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশায়। এঁর দেহান্ত ঘটেছিল ১৯৪৮ সালের ২৯শে নভেম্বর।

দ্বিতীয় উদাহরণটি হচ্ছে নীরদাসুন্দরীর প্রসঙ্গ। দেবনারায়ণবাবু লিখেছেন—'প্রথম জীবন এবং শেষ জীবনে তিনি অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করে গেছেন। প্রথম জীবনে আশ্রয় পেয়েছিলেন অমরবাবুর কাছে, আর শেষ জীবনে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হারিয়ে তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন অভিনেত্রী শান্তি গুপ্তার কাছে। শান্তি গুপ্তা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর থাকা, খাওয়া-পরা ও রোগের চিকিৎসা করার সমস্ত দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।' ইনি গত হন ১৯৭৩ সালে।

বর্তমান লেখকের মহাকরণ-জীবনেও অনুরূপ কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সরকার থেকে শিল্পীদের কিছু মাসিক বৃত্তি বা পেনশন দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাঁরা চিঠি পেয়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছেন তাঁদের Identification এর জন্য। কোনো গেজেটেড অফিসারের সই দরকার। কিন্তু কেউ তাঁদের চিনতে পারছেন না। যেহেতু কেউ কেউ জানতেন, নাট্যমঞ্চের সঙ্গে আমার কিছু সংযোগ ছিল বা আছে, তাই তাঁরা আমার কাছে ওঁদের পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। তাঁরা তাঁদের সময়কার অতি বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। এই সুযোগে আমার তাঁদের সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপও ঘটে গেল। পেনশনের অর্থের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তা-ই তাঁদের কাছে সেদিন অনেক। সে-সব দুঃখকষ্টের কথা শুনে চোখে জল রাখা যায় না।

এইসূত্রে একজন শিল্পীর সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে গিয়েছিল। তিনি মা-দিদিমার কাছে মানুষ ঠিক আমাদের বিনোদিনীর মতো।

শৈশবে যেমন ওঁদের বিয়ে হয়, তেমনি হয়েছিল, কিন্তু সে-বরকে আর দেখা যায় নি। অন্য পথে তাঁকে ঠেলে দেওয়া হয়। নাচ, গান, তারপরে কোনোরকমে ছিট্‌কে এক রঙ্গমঞ্চে। সেখান থেকে আর এক মঞ্চে। এইভাবে শুরু হয় অভিনেত্রী-জীবন। প্রলোভনও আসে। এক অভিনেতার সঙ্গে নিজের জীবনকে বাঁধেন। জঠরে একটি সন্তানও আসে। তাকে নিয়ে পড়েন অকূল পাথারে। অপর এক বড়োমানুষের দৃষ্টি পতিত হয় তাঁর ওপর। আশ্রয় পান। ছেলেটি বড় হতে থাকে। তার জন্য গৃহশিক্ষক প্রয়োজন হয়। আবার প্রলোভন। সুশিক্ষিত শিক্ষকটির সঙ্গে সেই বড়ো মানুষটির গৃহত্যাগ। ঘর বাঁধা। শিল্পীটি কিন্তু অভিনয়ের ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনা করতে শুরু করেন। এইভাবে পরীক্ষায় পাস হতে হতে বি এ পর্যন্ত পড়েছিলেন তিনি। উক্ত শিক্ষকটি ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে গেছেন। রীতিমত প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তিনি হঠাৎ মোহে পড়ে একটি মেয়েকে বিয়ে করে বসেন বা বিয়ে করতে বাধ্য হন। তাঁদের প্রেম-কাহিনী জানতে পেরে শিল্পীই তাঁদের বিয়ে দিয়ে নিজে নেমে আসেন পথে। সন্তানটিকে বুকে করে চলতে থাকে তাঁর জীবন-সংগ্রাম। তখন অভিনয়ই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর একমাত্র উপজীবিকা। মঞ্চে-চিত্রে একসময় তিনি যুগপৎ দেদীপ্যমান ছিলেন। কিন্তু তারপর? পরের কথা তাঁর জানা নেই।